কাঠগড়ার মানুষ

(প্রথম খণ্ড)

রাজশাহী ডিভিশনের অবসরপ্রাপ্ত
স্পেশাল জজ

মোঃ মুমিনুর রহমান

১১৩ সেগুন বাগান, ঢাকা-২

Mamun Academy

প্রকাশক :
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রকাশনী
১১৩, সেগুন বাগান, ঢাকা-২

লেখক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রথম প্রকাশ : আগস্ট ১৯৮২

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা : শাহাদত চৌধুরী

মুদ্রণে :
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
১১৩, সেগুন বাগান, ঢাকা-২

যোগাযোগের ঠিকানা :
সেগুনবাগান প্রকাশনী
১১৩, সেগুন বাগান, ঢাকা-২
দূরালাপনী : ৪০৫৩৩২
জি পি ও বক্স নং ৮৫০

শো-রূম :
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০, বাংলাবাজার
ঢাকা-১

Kathgarar Manush
A collection of important sensational cases.
Collected, edited and translated by
Md. Muminur Rahman, Spl. Judge (Retd.)

Mamun Academy

MD. ASHAK-UN-NABI
BHOJON
3/4-C LALMATIA..

কাঠগড়ার মানুষ

(প্রথম খণ্ড)

মোঃ মুমিনুর রহমান

Mamun Academy

সূচী

ভূমিকা ৭
জয়গুন বিবি ও সামাদ কনট্রাক্টর ১
আকাশে গণহত্যা ২১
কর্ণেল ইউসুফ ও ক্রিস্টা রোমেটি ৪০
দেবদাসী ৭০
অনিলা ওরফে আয়েশার রীট আবেদন ৭৯
বিবাহ বন্ধনে লিপ্তিত ৯০
জুরীর বিচার ১০০
বিদেশিনীর ফরিয়াদ ১০৭
পাখীর সাক্ষ্য ১৩৪
সন্দেহের অবকাশে মুক্তি ১৪২
মীরপুরের জোড়া খুন ১৫৪
মহা উত্তেজনায় খুন ১৬৯
বিচার বিভ্রাট ১৮৩
পিকনিকের জের ১৯৭

Mahua Academy

ভূমিকা

'ক্ষমা যেথা ক্ষীণ দুর্বলতা
হে রুদ্র, নিষ্ঠুর যেন হতে পারি তথা
তোমার আদেশে। যেন রসনায় মম
সত্যবাক্য ঝলি উঠে খর খড়্গ সম
তোমার ইঙ্গিতে। যেন রাখি তব মান
তোমার বিচারাসনে লয়ে নিজ স্থান।
অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে
তব ঘৃণা যেন তারে তৃণ সম দহে।'

—রবীন্দ্রনাথ

Mamun Academy

গল্পের চাইতেও সত্য অনেক বেশি বিস্ময়কর। বাস্তব কল্পনার চেয়ে অনেক বেশি চমকপ্রদ। এই দুদিনের দুনিয়ার খেলা ঘরে নর-নারী মেতে থাকে সেই সব চিরন্তন খেলায়: প্রেম, বিরহ সুখ-দুঃখ, ভাঙা-গড়া, খুন, ডাকাতি, পাশবিকতা। আরও কত কি! মানুষের এই সব দুর্জ্ঞেয় মনোবৃত্তির জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় প্রতিদিন দেশ-বিদেশের শত শত আইন আদালতগুলোতে। সে-সব কাহিনী কল্পনা বা উপন্যাসের চাইতেও অনেক বেশি চমকপ্রদ ও উত্তেজনাকর, আবার সেগুলো সবই বাস্তব ও প্রাণবন্ত।

এসব মামলার ইতিহাস চোখে আঙুল দিয়ে সবাইকে দেখিয়ে দেয় যে অন্যায়কারী সে যত প্রতাপশালীই হোক না কেন, কৃত অপকর্মের জন্যে তাকে কেবল পরকালই নয়, ইহকালেও জবাবদিহি করতে হয় দেশের বিচারালয়ের সামনে। কারণ আইনের চোখে ধনী-দরিদ্র, রাজা-প্রজা সবাই সমান।

দেশ-বিদেশের ১৬টি বিখ্যাত বিচার কাহিনী এই পুস্তকে সহজ ভাষায় পরিবেশন করা হয়েছে। দেশ-বিদেশের শত শত 'ল জার্নাল' ঘেঁটে আমি এ কাহিনীগুলো সংগ্রহ করেছি। এর প্রতিটি ঘটনা সত্য।

বইটি যদি আমার দেশের পাঠক-পাঠিকাদের আইনের শাসনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও সেই সঙ্গে নাগরিক কর্তব্য বোধ ও সাধারণ আইন সম্বন্ধে সচেতন করে তুলতে সাহায্য করে তবেই আমার শ্রম সার্থক বলে মনে করব। সবার কাছে আদৃত হলে এর দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশেরও আশা রইল।

এই পুস্তক রচনায় যাঁরা আমাকে সাহায্য করেছেন তাঁদের মধ্যে মরহুম মিসেস জাহানারা বেগম এম, এ-র নাম কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করি।

মোঃ মুমিনুর রহমান

১৯ | ৭ | ৮২

Mamun Academy

জয়গুন বিবি ও সামাদ কনট্রাক্টর

ঢাকার তৎকালীন বিখ্যাত ধনী আব্দুস সামাদ কনট্রাকটরের হত্যাকাণ্ড ঢাকা তথা বাংলাদেশে এক অভাবনীয় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিল। ঘটনার বৈচিত্র্যে ও নৃশংসতায় এই হত্যাকাণ্ড মানুষের মনে চিরদিন দাগ রেখে যাবে।

ঢাকার একজন 'এ' ক্লাস কনট্রাকটর ছিলেন আব্দুস সামাদ, বয়স ৪০ বৎসর। টাকা, বাড়ি, গাড়ি কোন কিছুরই অভাব ছিল না তাঁর। কিন্তু কেবলমাত্র অর্থ ও সম্পদই মানুষকে প্রকৃত সুখ দিতে পারে না। এত প্রাচুর্যের মধ্যেও একটি দুরন্ত ব্যথা তাঁর বুকে সব সময় শেলের মত বিঁধত, দাম্পত্য জীবনে মোটেই সুখী ছিলেন না তিনি।

একে একে চারটি বিয়ে করেন তিনি। কিন্তু তবুও সুখ হল না তাঁর জীবনে। অর্থ, সম্পদ না চাইতেই পেয়েছেন প্রচুর। কিন্তু যা তিনি সারা জীবন একান্তভাবে কামনা করেছেন তা পাননি। সময় সময় তাঁর মনে হত এর চেয়ে যদি গরীবানা হালে একটি ছোট ঘরে তিনি একটি সুখী পরিবার গড়ে তুলতে পারতেন তবেই বোধ-হয় তাঁর জীবন পুরোপুরি সার্থক হত।

এই ঘটনার প্রধান নায়িকা জয়গুন বিবি ছিল আব্দুস সামাদের চতুর্থ পক্ষের স্ত্রী। সামাদের প্রথম স্ত্রীর গর্ভে ছিল তাঁর তিনটি

Mamun Academy

ছেলে ও একটি মেয়ে। সেই স্ত্রী অনেক আগেই মারা যান। প্রথমা স্ত্রী থাকতেই সামাদ দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণ করেন। কিন্তু পরে তাকে তালাক দেন। দ্বিতীয় পক্ষে তাঁর কোন সন্তান ছিল না। আবার তিনি বিয়ে করেন। এই তৃতীয় স্ত্রীর গর্ভে তাঁর জন্মে দুটি ছেলে ও একটি মেয়ে। সবাই তখন ছোট। তৃতীয় স্ত্রীর জীবদ্দশায় তিনি চতুর্থ বিয়ে করেন জয়গুন বিবিকে। ১৯৫৭ সালের এপ্রিল মাসে।

যদিও জয়গুন বিবি তখনও ছিল যুবতী তবুও এর আগে তার আরও দুবার বিয়ে হয়েছিল। তার প্রথম স্বামী ছিল এক রিকসা-ওয়ালা আর দ্বিতীয় স্বামী ছিল একজন দোকানদার। উভয় স্বামীই বিয়ের কিছুদিন পরে তাকে তালাক দিয়ে দেয়। তারপর সামাদের সঙ্গে তার বিয়ে হয়। জয়গুন বিবির গর্ভে সামাদের দুটি সন্তান হয়।

জয়গুন বিবিকে বিয়ে করার পর সামাদ সেগুন বাগিচায় এক আধুনিক দ্বিতল অট্টালিকা তৈরি করেন তাঁদের বসবাসের জন্য। এর নাম দেন "গুল-ভিলা"। ১৯৫৮ সালের জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী মাসে সামাদ তাঁর পরিবারবর্গ নিয়ে গুল-ভিলায় চলে আসেন। কিন্তু তাঁর অফিস ওসমান গনি রোডে তাঁর আগের বাসস্থানেই থেকে যায়।

গুল-ভিলাতে আবদুল মজিদ নামে ২২ বৎসরের একজন যুবককে সামাদ তাঁর গৃহ ভৃত্য রূপে নিযুক্ত করেন। এর আগে মজিদ গুল-ভিলা তৈরির সময়ে রাজমিস্ত্রির যোগানদারের কাজ করত। গুল-ভিলায় আসার পরই জয়গুনের সতীন (সামাদের তৃতীয় স্ত্রী) হোসনা বানুর সঙ্গে তার মনোমালিন্য হয়, ফলে সতীনের উপর রাগ করে হোসনা বানু তাঁর বাচ্চাদের নিয়ে তাঁর বাপের বাড়ি চলে যান।

গুল-ভিলার নিচ তলায় পর পর তিনটি কামরা, উত্তর ও দক্ষিণে

Mamun Academy

বারান্দা—বারান্দা নায়লনের জাল দিয়ে ঘেরা। এই নিচ তলাতেই থাকতেন সামাদ ও তাঁর পরিবার। জয়নব নামে জয়গুন বিবির এক বোনও সেই সময়ে থাকত জয়গুনের সঙ্গে। বাড়ির চারদিক উঁচু দেয়াল দিয়ে ঘেরা ছিল। সামাদ থাকতেন পুব দিকের কামরায়। মাঝের কামরায় থাকত জয়গুন বিবি। পশ্চিম দিকের কামরায় থাকত পরিবারের অন্যান্যরা। জোহরা খাতুনও থাকত ঐ পশ্চিমের কামরায়। ঘটনার দিন দশেক আগে জয়গুন বিবির পরিচারিকা হিসাবে তাকে নিযুক্ত করা হয়।

সবার অলক্ষ্যে প্রভুপত্নী জয়গুন বিবি ও ভৃত্য আব্দুল মজিদের মধ্যে গোপন অন্তরঙ্গতা গড়ে ওঠে। মজিদ জয়গুনকে ভাবী-ভাবী বলে ডাকত। ক্রমে তাদের হাবভাব ও চালচলন পরিবারের অন্যান্যদের কাছে দৃষ্টিকটু মনে হতে লাগল। ভৃত্য মজিদের খাওয়া দাওয়া ও কাপড়-চোপড় সম্বন্ধে গৃহকর্তী জয়গুন বিবির মাত্রাতীত নজর অনেকেরই চোখে বাধত। ক্রমে দেখা গেল যে জয়গুন বিবি ও মজিদের সম্পর্ক কর্ত্রী-ভৃত্য সম্পর্ক থেকে প্রেমিক-প্রেমিকার সম্পর্কে পরিণত হয়েছে।

সামাদের প্রথম পক্ষের ছেলে মান্নান ও মেয়ে হাসিনা বানু তাদের বিমাতার এই অশোভন আচরণ দুঃখের সঙ্গে লক্ষ্য করতে লাগল। পরিচারিকা জোহরাও ছোট বেগমের এই অবনতি দেখে শংকিত হল। কিন্তু জয়গুন বিবি তখন প্রেমে অন্ধ, এ সম্বন্ধে তাকে কিছু বলারও উপায় ছিল না।

আব্দুস সামাদ তাঁর কাজ নিয়েই প্রায় সারা দিনরাত ব্যস্ত থাকতেন। ঘরে কি হচ্ছে না হচ্ছে তা দেখবার সময় তাঁর কমই ছিল। কিন্তু ক্রমে জয়গুন ও মজিদের এই অবৈধ অন্তরঙ্গতার প্রতি

Mamun Academy

তাঁর দৃষ্টি পড়ল।

কিন্তু মজিদকে কিছু বললেই জয়গুন বাধা হয়ে দাঁড়ায়। ঘটনার কয়েকদিন পূর্বে এই নিয়ে স্বামী সামাদ ও স্ত্রী জয়গুনের মধ্যে খুব এক-চোট বচসা হয়ে যায়। এরপর সামাদ মজিদকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করে তাকে বাড়ি থেকে বের করে দেন এবং শাসিয়ে দেন যেন গুল-ভিলার ত্রি-সীমার মধ্যেও তাকে আর না দেখা যায়।

কিন্তু অবৈধ প্রেমে যে একবার মজেছে সে কি আর সহজে সেই পিচ্ছিল পথ থেকে সরে আসতে পারে? গুল-ভিলার বাইরের কপাট মজিদের কাছে বন্ধ হলেও ভিতরের দুয়ার তার জন্যে খোলাই রইল। চাকরি থেকে বরখাস্ত হবার পরও মজিদের গোপন যাতায়াত চলতে থাকল গুল-ভিলায়। চলতে লাগল জয়গুন ও মজিদের গোপন অভিসার।

পরবর্তী সময়ে সাক্ষ্য থেকে জানা যায় যে জয়গুন বিবি মজিদকে আদরের সঙ্গে অভ্যর্থনা জানাত, তাকে বিশেষ আগ্রহের সঙ্গে কাছে বসিয়ে ভাল ভাল খাবার খাওয়াত। এমনকি মজিদের মুখের চিবানো পানও জয়গুন বিবি মহানন্দে নিজ মুখে পুরে খেত। জয়গুনের শোবার ঘরেও ছিল মজিদের গোপন যাতায়াত। প্রায়ই তাদের মধ্যে গোপন আলোচনা চলতে দেখা যেত।

তারপর এল ১৯৫৯ সালের ৪ঠা সেপ্টেম্বরের সেই ভয়াবহ রাত। এদিনই মজিদকে মোট তিনবার জয়গুনের কাছে যাতায়াত করতে দেখা যায়। প্রথমে বিকাল সাড়ে চারটায়। তারপর সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় ও আবার রাত দশটা বা এগারটার সময়ে। প্রতিবারেই দেখা যায় যে জয়গুন ও মজিদ পশ্চিমের কামরায় কি গোপন আলোচনায় ব্যস্ত।

Mamun Academy

এই সময়ে সামাদ ছিলেন খুবই কর্মব্যস্ত। প্রায় মাস খানেক আগে ঢাকা এয়ারপোর্ট নির্মাণের জন্যে ৯ লক্ষ টাকার একটি কন্ট্রাক্ট তিনি পেয়েছিলেন। এ ছাড়া ঘটনার দিনই, অর্থাৎ ৪ঠা সেপ্টেম্বর তিনি আমেরিকান লাইফ ইন্সিওরেন্স কোম্পানির এক বিরাট ইমারত গড়ার জন্যে ১৩ লক্ষ টাকার এক কন্ট্রাক্ট পান। ঐ দিন(শুক্রবার) গভীর রাত পর্যন্ত সামাদকে তাঁর অফিসে কর্মব্যস্ত থাকতে হয়।

রাত্র ১১ টার পর হঠাৎ গুল-ভিলার সমস্ত ইলেকট্রিক লাইট নিভে যায়। তখন জয়গুনের নির্দেশমত তিনটি হারিকেন জ্বালানো হয়। একটি হারিকেন রাখা হয় পুবের কামরায়, একটি পশ্চিমের কামরায় ও অন্যটি রাখা হয় উত্তরের বারান্দায়।

রাত্র ১২ টার পরে কর্মক্লান্ত সামাদ ফিরলেন তাঁর গুল-ভিলায়। জয়গুনের বোন জয়নব দরজা খুলে দিল তাঁকে। সামাদ তাঁর পুবের কামরায় ঢুকে স্ত্রী জয়গুন বিবিকে ডাকলেন তাঁর কামরায়। কিন্তু জয়গুন নিজে সেখানে না গিয়ে তার বোন জয়নবকে পাঠাল। জয়নবই সামাদকে রাত্রের খাবার এগিয়ে দিয়ে খাওয়াল। খাবার পরে সামাদ আবার স্ত্রীকে ডাকলেন, কিন্তু এবারও জয়গুন না এসে তার বোনকে বলল, 'আমার শরীরটা আজ ভাল নেই, তুই বরং আজ গিয়ে তোর দুলাভাই-এর হাত-পা টিপে তাকে ঘুম পাড়িয়ে দিয়ে আয়।'

জয়নব সামাদের ঘরে গিয়ে দেখল সামাদ খাবার টেবিলের পাশে মেঝেতে পাটি পেতে শুয়ে রয়েছেন। জয়নব সামাদের শরীর টিপে দিতে লাগল। ক্রমে সামাদ ঘুমিয়ে পড়লেন। তখন জয়নব জয়গুনের ঘরে ফিরে এল। জয়গুন তখনও ঘুমায়নি। তার পরিচারিকা জোহরা খাতুনও তখন জেগে আছে। জয়গুনের প্রশ্নের উত্তরে জয়নব জানাল যে সামাদ নিচে পাটিতে ঘুমিয়ে পড়েছেন, তাই সে চলে এসেছে। 'চল

Mamun Academy

ত দেখি সত্যিই ঘুমিয়েছে কিনা,' এই বলে জয়গুন জয়নবকে নিয়ে সামাদের ঘরে এসে দেখল যে সামাদ এরই মধ্যে নাক ডাকাতে শুরু করেছে। পরিচারিকা জোহরাও ততক্ষণে ঘুমিয়ে পড়েছে। জোহরা জয়নবের পশ্চিমের রুমে তার খাটের পাশেই ঘুমাত।

জোহরা কতক্ষণ ঘুমিয়েছিল তা তার মনে নেই। ভারী ধপ্‌ ধপ্‌ পায়ের শব্দে হঠাৎ তার ঘুম ভেঙে গেল। মনে হল কেউ যেন তাড়াতাড়ি দৌড়ে পালাচ্ছে। ওই পায়ের শব্দ আসছিল উত্তরের বারান্দা থেকে। তারপরই সে শুনতে পেল একটা ভারী জিনিস যেন ধপ করে নিচে পড়ে গেল। এর পরপরই সে দেখল যে জয়গুন বিবি মহা ব্যস্ততার সঙ্গে এসে ঘরে ঢুকল ও ঢুকেই সঙ্গে সঙ্গে দরজা বন্ধ করে দিল। জয়গুন জোহরাকে শোয়া থেকে টেনে বসিয়ে বলল, 'শিগগির আমাকে বাতাস কর।' সেই সময় সে একটি আর্ত চিৎকার শুনতে পেল 'মা-গো!' জয়গুনকে বাতাস করতে করতে জিজ্ঞেস করল, 'ও কিসের শব্দ? কে যেন চিৎকার করল 'মা-গো' বলে!' সঙ্গে সঙ্গে জয়গুন বিবি জোহরাকে শাসিয়ে বলল, 'খবরদার এ সম্বন্ধে কোন কথা মুখে আনবি না। একদম চুপ থাক।' শুনে জোহরা একেবারে 'থ' বনে গেল, কিন্তু সেই সঙ্গে তার মন আরও অনুসন্ধিৎসু হয়ে উঠল।

কিছুক্ষণ জয়গুনকে বাতাস করার পর জোহরা বলল যে, সে প্রস্রাব করার জন্যে বাইরে যাবে। এই বলে পাখা রেখে সে উত্তরের বারান্দার দরজার দিকে এগোতে গেল। কিন্তু জয়গুন তাকে বাধা দিয়ে বলল, 'খবরদার ওদিকে যেতে পারবি না। দক্ষিণের বারান্দায় যা।' অতঃপর জোহরা দক্ষিণের বারান্দায় এসে মাঝের রুমে ঢুকে পড়ল। সেই রুমের মধ্য দিয়ে সে উত্তরের বারান্দায় চলে এল।

Mamun Academy

উদ্দেশ্য, উত্তর দিকের চাকরদের বাথরুমে যাবে।

কিন্তু উত্তরের বারান্দায় এসেই তার চক্ষুস্থির। এক বীভৎস দৃশ্য দেখে সে চমকে উঠল। দেখল একজন লোক বারান্দায় চিৎ হয়ে পড়ে আছে। তার মাথার অংশ মধ্যের রুমের ভিতরে, শরীরের অপর অংশ উত্তরের বারান্দায়। আরও কাছে গিয়ে সে আঁতকে উঠল, দেখল তার সাহেব অর্থাৎ সামাদেরই মৃতদেহ এটা। তাঁর গলা কাটা, তাজা রক্তের মধ্যে ডুবে আছে সমস্ত মাথা ও শরীরের অংশ। দেহে প্রাণ নেই বলেই মনে হল।

ঠিক তখনি সে বারান্দার উত্তরদিকে শব্দ শুনে তাকিয়ে দেখল যে জয়গুন বিবি মজিদকে উত্তরের বারান্দা পার হয়ে বাইরে বেরিয়ে যেতে সাহায্য করছে। মজিদকে জয়গুন সেই সময়ে কোথা থেকে বের করে আনল তা সে ঠিক বুঝতে পারল না, মজিদ দ্রুত পায়ে উধাও হয়ে গেল। এর পরেই জয়গুন তার ঘরে এসে চিৎকার ও কান্না শুরু করে দিল, শুনে সবাই সেখানে ছুটে এল। ঘটনা দেখে সকলে শোক ও হা-হুতাশ করতে লাগল। পরদিন সকালে (৫ই সেপ্টেম্বর) পুলিশ এসে ঘটনার তদন্ত শুরু করে।

অনেক খোঁজ খবরের পর ৬ই সেপ্টেম্বর পুলিশ আসামী মজিদকে গ্রেপ্তার করল তার সৎবোন রতন বিবির বাসা থেকে। সেই বাসা থেকেই মজিদের একটি নীল রঙের রক্তমাখা শার্ট উদ্ধার করা হল। মজিদের স্বীকারোক্তি মত অন্য একটি চৌকির তলা থেকে একটি রক্তমাখা লুঙ্গিও পাওয়া গেল। মজিদের কথামত তাকে সামাদের বাড়িতে নিয়ে আসা হল, সেখানে গুল-ভিলার মধ্যের কামরার একটি আলমারীর উপর থেকে একটি ক্ষুরের খাপ দেখিয়ে মজিদ পুলিশকে জানাল যে জয়গুনই সেই খাপ থেকে ক্ষুর বের করে তাকে দিয়েছিল

সামাদকে গলা কেটে হত্যা করার জন্যে।

এরপর আসামী মজিদ ঢাকার প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট মি, কে, এম, রহমানের নিকট স্বেচ্ছায় নিজের দোষ স্বীকার করে এক স্বীকারোক্তি(Confession)করে। উক্ত স্বীকারোক্তিতে সে জানায় যে সামাদের বাড়িতে ভৃত্য রূপে থাকাকালে গৃহকর্ত্রী জয়গুন বিবির সঙ্গে তার অবৈধ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। ঘটনার আট দিন আগে যখন সে জয়গুন বিবির সঙ্গে তার বেডরুমে বসে গোপনে কথা বলছিল তখন সামাদ তাকে দেখে ফেলে। তা নিয়ে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে প্রবল বচসা হয়, আর তার জের হিসাবে সামাদ তাকে বরখাস্ত করে বাড়ি থেকে বের করে দেন। কিন্তু তবুও জয়গুন বিবির একান্ত ইচ্ছা অনুযায়ী মজিদ গোপনে গুল-ভিলায় যাতায়াত করতে থাকে, মজিদের প্রতি জয়গুন বিবির আকর্ষণ শুধু যে অব্যাহতই রইল তা নয়, তা বরং দিন দিন বেড়েই চলতে লাগল। বাড়ির অন্যান্যদের কাপড়-চোপড়ের সঙ্গে সে মজিদের কাপড়ও লণ্ড্রিতে ধুতে পাঠাত। মজিদকে সে ভাল ভাল খাবারও খেতে দিত।

ঘটনার দিন অর্থাৎ ৪ঠা সেপ্টেম্বর (১৯৫৯) শুক্রবার নটা বা সাড়ে নটার সময় মজিদ একবার গুল-ভিলায় আসে তার একটি পাজামা নিয়ে যাবার জন্যে যা আগেই জয়গুন বিবি লণ্ড্রি থেকে ধুইয়ে এনে রেখেছিল। জয়গুন বিবি তাকে বিশেষ দরকারে আর একবার বিকালে আসতে বলে দেয়। বিকাল চার টার সময় মজিদ গুল-ভিলায় আসে। সে সময় জয়গুন বিবি চুপি চুপি তাকে গুল-ভিলার ভেতরে নিয়ে যায় ও সেখানকার আলমারীর উপরে রাখা ক্ষুরের বাক্স খুলে তা থেকে একটি ক্ষুর তাকে দিয়ে ওটা ভাল করে ধার দিয়ে রাত্রে আবার গুল-ভিলায় আসতে বলে। মজিদ বাজার

থেকে দু'আনা দিয়ে সেই ক্ষুর ধার করিয়ে আবার রাত এগারটার দিকে গুল-ভিলায় আসে ও ক্ষুরটি জয়গুনকে দেয়।

সামাদ তখনও বাড়িতে ফেরেনি। জয়গুন বিবির নির্দেশ মত মজিদ উত্তরের কামরায় রাখা একটি ড্রামের পেছনে লুকিয়ে থাকে। তার আগে জয়গুন বিবির নির্দেশ মত সে তার জুতা জোড়াও বাইরে রেখে আসে। তারপর জয়গুনেরই নির্দেশে সে বাড়ির মেইন সুইচ অফ করে দেয়। ফলে গুল-ভিলার সমস্ত বাতি নিভে অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়ে যায়। জয়গুনের আদেশে তাড়াতাড়ি হারিকেন ধরানো হয় (পরে তদন্তে মেইন সুইচ বন্ধ পাওয়া যায়।)

সামাদ বাড়িতে এলে জয়নব তাকে খাবার খাওয়ায়। সামাদের ঘুম না আসা পর্যন্ত তার শালী জয়নব তার শরীর টিপে দিতে থাকে। অল্পক্ষণের মধ্যেই পরিশ্রান্ত সামাদ ঘুমিয়ে পড়েন। জয়নব পশ্চিমের ঘরে এসে শুয়ে পড়ে। মজিদ ড্রামের পিছনে লুকিয়ে থেকে এই সব দেখতে পায়। পা টিপে টিপে জয়গুন মজিদের কাছে এসে বলে, "সামাদ এখনও ঘুমায়নি। আরও কিছুক্ষণ দেরি করতে হবে। ততক্ষণ এই ভাবে চুপচাপ বসে থাক।" এমন সময় সামাদের বড় ছেলে মান্নান ও আর একজন চাকর বোধহয় সিনেমা দেখে বাসায় ফিরে আসে। তারা সোজা গুল-ভিলার দোতালায় উঠে যায়।

আরও কিছুক্ষণ পরে জয়গুন বিবি হাতে একটি পুরানো ক্ষুর নিয়ে এসে মজিদকে সেটা দিয়ে বলল, 'এটা দিয়ে বারান্দার দরজায় যে নায়লনের নেট দেওয়া আছে সেটা কেটে দাও, যাতে মনে হয় যে বাইরে থেকে কোন লোক এই পথে ঢুকে সামাদকে খুন করেছে।' কিন্তু সেই নেট কাটার শব্দে সামাদের ঘুম ভেঙে যাবার আশঙ্কায় মজিদ এ কাজে হাত দিতে ইতস্ততঃ করতে লাগল। তখন জয়গুন

বিবি নিজে ক্ষুর হাতে নিয়ে এক পোঁচে দরজার নায়লন-নেট চিরে ফেলে, (পরে দেখা যায় যে দরজার নায়লনের নেট লম্বালম্বিভাবে কাটা, আর তার ভেতর দিয়ে যে কোন লোক প্রবেশ করেনি তা বেশ বোঝা যায়)।

রাত তখন গভীর। বাড়ির সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। চারদিক নিঝুম। সামাদ মাটিতে পাটির উপর অঘোরে ঘুমাচ্ছে। মজিদ ও জয়গুন সন্তর্পণে পা পা করে সামাদের ঘরে এসে ঢুকল। মজিদের হাতে ধারাল ক্ষুর। তারা উভয়ে এসে সামাদের মাথার কাছে বসল। চিৎ হয়ে শুয়ে আছে সামাদ। জয়গুনের ইঙ্গিতে মজিদ তার ক্ষুর খুলে সজোরে বসিয়ে দিল সামাদের গলায়। ঘুমন্ত সামাদের গলায় গভীরভাবে বসে গেল ক্ষুর।

"আঃ! আঃ!" বলে সামাদ চেঁচিয়ে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে মজিদ আধা কাটা গলায় আরও এক পোঁচ বসিয়ে দিল। আরও গভীর ক্ষত হল সামাদের গলায়। ফিনকি দিয়েরক্ত ছুটল। আধা কাটা গলা নিজ হাতেই চেপে ধরে প্রাণপণে সামাদ একবার মাটি থেকে উঠে দাঁড়াল। তা দেখে জয়গুন বিবি ভয়ে দৌড়ে তার ঘরের দিকে পালাতে লাগল। সামাদও তার গলার ক্ষত চেপে ধরে জয়গুনের পিছু পিছু তার ঘরে যেতে চেষ্টা করলেন। জয়গুন ঘরের দরজার কাছে এসে দেখল সামাদ অর্ধকাটা গলা নিয়েই মাতালের মত টলতে টলতে তাকে ধাওয়া করেছেন। জয়গুন দেখল মহা বিপদ, আহত সামাদ তার ঘরের মধ্যে ঢুকতে চেষ্টা করছে। তখন সে মরিয়া হয়ে আহত সামাদকে তার ঘরে ঢুকতে বাধা দিয়ে সজোরে এক ধাক্কা মারল। সামাদ জয়গুনের পশ্চিমের ঘরের দরজার কাছে বারান্দায় সশব্দে পড়ে গেলেন ও চিৎকার করে উঠলেন "মা-গো!"

Mamun Academy

তারপরই শেষ, মাটিতে পড়েই তিনি প্রাণ ত্যাগ করলেন।

তাজা রক্তে সব ভেসে গেল। এতক্ষণ মজিদ 'থ' মেরে দেখছিল আহত সামাদকে। এবার সে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল। সে বাথরুমে ঢুকে তার রক্তাক্ত হাত ধুয়ে ফেলল ও ক্ষুরটি বাথরুমের জানালা দিয়ে বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দিল। (পরে বাথরুমে রক্তের দাগ ও বাইরে সেই ক্ষুর পাওয়া যায়)

পরদিন সকালে সে মির্জাপুর চলে যায়। একদিন পরে সেখান থেকে ফিরে তার বোন রতনবাই এর বাড়িতে এসে আত্মগোপন করে থাকে। সেখান থেকেই পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করে।

মজিদ পরবর্তীকালে তার এই স্বীকারোক্তি অস্বীকার করে ও বলে যে ঐ স্বীকারোক্তি সে পুলিশের চাপে পড়েই করেছিল।

কিন্তু মাননীয় বিচারপতি জাস্টিস্ ইস্পাহানী তাঁর দীর্ঘ রায়ে সমস্ত সাক্ষ্য প্রমাণ বিশদভাবে আলোচনা করে দেখেন যে মজিদের সেই স্বীকারোক্তি অধিকাংশই নির্ভুল। অন্যান্য সাক্ষী, প্রমাণ ও ঘটনা পরম্পরা বিচার করলে দেখা যায় যে তার উপরোক্ত বিবরণ ভাল ভাবেই প্রমাণিত হয়েছে। মজিদ স্বেচ্ছায় সত্য স্বীকারোক্তি করেছে। পরে সে অন্যের পরামর্শে বাঁচবার জন্যেই পূর্বের স্বীকারোক্তি অস্বীকার করে।

ডাক্তারী রিপোর্টে দেখা যায় যে সামাদের গলায় ৮" লম্বা ও ১½" গভীর ক্ষতের সৃষ্টি হয়েছিল। এবং সেই ক্ষতেই তাঁর মৃত্যু হয়। ধারাল কোন ক্ষুর বা সে জাতীয় অস্ত্র দ্বারা জোরে চাপ দিয়ে ওরকম কাটা সম্ভব। ডাক্তারের মতে ক্ষত এত মারাত্মক ছিল যে আক্রমণের মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই বোধহয় সামাদের মৃত্যু হয়।

সাক্ষী প্রমাণে এবং ঘটনার আগে ও পরে জয়গুনের হাবভাব

ও ব্যবহারে এটাও প্রমাণিত হয় যে জয়গুন ও মজিদ উভয়েই গোপন ষড়যন্ত্র করে তাঁকে নির্মমভাবে হত্যা করেছে। মাননীয় বিচারপতি তাঁর রায়ে আরও বলেন যে, মজিদ ও জয়গুন-এর অবৈধ প্রেমই এই হত্যার জন্যে দায়ী। তারা জয়গুনের স্বামী সামাদকে তাদের অবৈধ সম্পর্কের মাঝে প্রধান বাধা হিসাবে মনে করত। তাঁকে পৃথিবী থেকে সরাতে পারলে তাদের দুই দিকেই লাভ হত: তাদের মিলনের বাধা দূর হত এবং সামাদের স্ত্রী হিসাবে জয়গুন বেশ কিছু মোটা অর্থ ও সম্পত্তি পেয়ে যেত। জয়গুনের সাহায্য ও সক্রিয়তা ছাড়া মজিদের পক্ষে কিছুতেই গুল-ভিলার ভেতরে ঢুকে এরকম নৃশংস হত্যাকাণ্ড করা সম্ভব হত না। মজিদ ও জয়গুন বিবি উভয়েই এই নৃশংস, ঘৃণ্য ও জঘন্য হত্যাকাণ্ডের জন্যে সমানভাবে দায়ী বলে কোর্ট রায় দেয়।

আসামী মজিদকে হত্যার দায়ে প্রাণদণ্ড দেয়া হয়।

জয়গুন বিবি হত্যাকাণ্ডের সময়ে অন্তঃস্বত্তা ছিল ও সে হাজতে থাকা কালীন সময়ে একটি সন্তান প্রসব করে। এছাড়া জয়গুনের বয়স তখন মাত্র ২০ বৎসর, দু'টি বাচ্চার মা। এই সব অবস্থা বিবেচনা করেই আদালত দয়া পরবশ হয়ে তাকে মৃত্যুদণ্ড না দিয়ে যাবৎজীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করে।

উপরোক্ত দণ্ডাজ্ঞা সুপ্রীম কোর্টেও বহাল থাকে।

আকাশে গণহত্যা

কানাডার এই চাঞ্চল্যকর মামলার রায় দিতে গিয়ে কুইবেকের প্রধান বিচারপতি জাস্টিস আলবার্ট সেভেগনি মন্তব্য করেন :

"পৃথিবীর নরহত্যার ইতিহাসে এটি হল জঘন্যতম—তুলনাহীন, আসামী 'গয়ট' ভেবেছিল যে যাত্রীবাহী প্লেনটি ধ্বংসের সঙ্গেসঙ্গে এই ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রের সমস্ত সাক্ষ্য-প্রমাণও চিরতরে লুপ্ত হবে, কিন্তু সে ভুলে গিয়েছিল যে ঈশ্বরের মহা বিচারের হাত থেকে কোন শয়তানেরই রেহাই নেই।"

১৯৫৯ সালের ৯ই সেপ্টেম্বর।

সেদিন ছিল চমৎকার রৌদ্রোজ্জ্বল এক শুক্রবার। ক্যানাডিয়ান প্যাসিফিক এয়ার লাইন্সের ১০৮ নং ফ্লাইটের যাত্রীবাহী ডি. সি. ৩ বিমানটি সকাল ১০টায় যথাসময়ে মন্ট্রিল থেকে কুইবেক বিমান বন্দরে এসে অবতরণ করল। সুন্দর আবহাওয়া আর সুনিপুণ পাইলটদের পরিচালনায় ওই বিমান ভ্রমণটি খুবই উপভোগ্য হয়েছিল সেদিন যাত্রীদের কাছে।

কুইবেক বিমান বন্দরে ৪৫ মিনিট থেমে বিমানটি আবার রওনা হবে উত্তর দিকে ২৭০ মাইল দূরে অবস্থিত বাইওকেমিও নদী-বন্দরের দিকে।

এই বিমানের অন্যতম যাত্রী ছিল 'টেরেন্স এফ ফ্লাইট,' মন্ট্রিল

Manik Academy

থেকে সে যাচ্ছিল বাইওকেমিও। তার স্ত্রী তখন কার্যোপলক্ষ্যে থাকত কুইবেক। তার স্ত্রী মিসেস ফ্রন্টেন্স টেরেন্স কুইবেক বিমান বন্দরে এসে তাকে অভ্যর্থনা জানাল প্লেন কুইবেকে নামার সঙ্গে সঙ্গেই। সেখানে স্ত্রীর একান্ত অনুরোধে টেরেন্স শেষ পর্যন্ত ঠিক করল যে যাত্রাভঙ্গ করে সে কুইবেকে স্ত্রীর সঙ্গে উইক এণ্ড কাটিয়ে সোমবারে বাইওকেমিওর উদ্দেশে আবার রওনা হবে—যদিও তার টিকেট সেদিন বাইওকেমিও পর্যন্তই কেনা ছিল। এই সিদ্ধান্তের পর প্লেনের অন্যান্য বন্ধু যাত্রীদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে টেরেন্স তার হর্ষোৎফুল্ল স্ত্রীর সঙ্গে বিমান বন্দরের বাইরে এসে দাঁড়াল তার মালপত্র নিয়ে। কিন্তু তখন কি সে জানত যে স্ত্রীর ভালবাসা সেদিন তাকে টেনে বের করে নিয়ে এসেছে এক নিশ্চিত মৃত্যুর গহ্বর থেকে?

কুইবেকে টেরেন্স সহ মোট ৮ জন যাত্রী সেই বিমান থেকে নামল। আর উঠল মোট ৭ জন যাত্রী। তাদের মধ্যে একজন যাত্রীর নাম ছিল রীটা মোরেল গয়ট। ২৮ বৎসর বয়স্কা মোটা সোটা এই মহিলা ছিল কুইবেকের অধিবাসী। বিবাহিতা ও সন্তানের জননী। পরে জানা যায় যে মিসেস রীটার স্বামী ছিল একজন জুয়েলারী ব্যবসায়ী। বহুদিন যাবত তাদের বিবাহিত জীবন মোটেই সুখের ছিল না; প্রায়ই কলহ ও ঝগড়া-বিবাদ লেগে থাকত।

কিন্তু আশ্চর্যজনকভাবে গত তিন দিন যাবত তাদের মধ্যে হঠাৎ খুব মিল হয়ে গেছে দেখা গেল। সেদিন থেকে তার স্বামী যেন আবার নুতন করে তাকে ভালবাসতে শুরু করল। তিনদিন আগেই তার স্বামী কুইবেক থেকে বাইওকেমিও যাতায়াতের জন্যে ওই ১০৮ এর ফ্লাইটে একটি রিটার্ন টিকেট কিনে রেখেছিল। বাইওকেমিও থেকে তার ব্যবসার জন্যে দুই স্যুটকেস ভর্তি স্বর্ণালঙ্কার নিয়ে

পরের ফ্লাইটেই রীটা কুইবেক ফিরে আসবে বলে তার স্বামী জানিয়েছিল। এসব বহুমূল্যবান জিনিস আনবার জন্য স্ত্রীকেই সে একমাত্র নির্ভরযোগ্য লোক মনে করে বলে জানিয়েছিল তার স্ত্রী রীটাকে। ওই প্লেনের টিকেটের সঙ্গে স্বামী বেশ কিছু আগাম টাকা দিয়ে করে রেখেছিল রীটার নামে একটি দশ হাজার ডলারের জীবন বীমা। আর স্বামীকেই করা হয়েছিল সেই বীমার অর্থের একমাত্র উত্তরাধিকারী। এই বিমান পলিসিটি স্বামী গয়ট সাবধানে নিজের কাছে রেখে ছিল। তারপর স্বামী দুদিন ধরে রীটাকে নিয়ে কয়েকটি ব্যয়বহুল ডিনার ও থিয়েটার উপভোগ করল। মিসেস রীটা গয়ট ত স্বামীর এই হঠাৎ পরিবর্তনে খুশীতে গদ গদ।

এরপর শুক্রবার (৯ই সেপ্টেম্বর) ঐ ১০৮নং ফ্লাইটে রীটা এসে উঠল প্লেনে বাইওকেমিওর পথে। বিশেষ কোন কারণে গয়ট এয়ারপোর্টে স্ত্রীকে উঠিয়ে দিতে আসতে পারল না। তবে তাকে কথা দিল যে পরদিন অবশ্যই সে ঐ একই বিমান বন্দরে তার স্ত্রীকে ফিরতি প্লেন থেকে রিসিভ করে আনবে। প্লেনে উঠে রীটার মনও আজ প্রফুল্ল। কতদিন পর আবার সে সত্যিই তার স্বামীর ভালবাসা পেয়েছে, সে চিন্তাতেই তার মন আনন্দে ভরপুর।

ঠিক ১০-৪৫ মিনিটের সময় ১৯ জন যাত্রী নিয়ে প্লেনটি আবার কুইবেক থেকে আকাশে উড়ল বাইওকেমিওর পথে।

প্লেন আকাশ থেকে কুইবেকের গ্রাউণ্ড কণ্ট্রোলে জানাল যে সুন্দর আবহাওয়ায় নিখুঁতভাবে এগিয়ে যাচ্ছে তারা। উত্তরে কণ্ট্রোল থেকে জানান হল, "শুভযাত্রা"।

কিন্তু এর কয়েক মিনিট পরেই প্লেনটি যখন একটি নদীর উপর দিয়ে যাচ্ছিল তখন নদীতে চলমান স্টীমার "সেণ্ট লরেন্স" এর

ডেক থেকে যাত্রীরা অবাক বিস্ময়ে দেখতে পেল প্লেনটির বামপাশ দিয়ে ধোঁয়ার কুণ্ডলী বেরিয়ে আসছে, আর সেটি যেন সামনে এগুতে এগুতে নিচের দিকেও নেমে আসছে। দেখতে না দেখতে প্লেনটি তাদের দৃষ্টিসীমার বাইরে চলে গেল। এই সময় গ্রাউণ্ড কণ্ট্রোলও হঠাৎ করে বিমানটির সঙ্গে সমস্ত বেতার যোগাযোগ হারিয়ে ফেলল।

কিছু দূরে ক্যানাডিয়ান রেলওয়ের ডবল লাইনের উপরে কাজ করছিল দু'জন শ্রমিক। হঠাৎ মাথার উপরে অদ্ভুত শব্দ শুনতে পেয়ে তারা আকাশে তাকিয়ে দেখতে পেল যে, কালো ধোঁয়া উদ্গীরণ করতে করতে একটি প্লেন এঁকেবেঁকে টলতে টলতে নিচে নামছে ও সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে মাতালের মত। কুইবেক থেকে সেখানে রেলপথের দূরত্ব ছিল ৪০ মাইল। রেললাইনে কর্মরত ঐ শ্রমিক দু'জন সঙ্গে সঙ্গে টেলিফোনে কুইবেকে খবর পাঠাল প্লেনের সেই অবস্থার সংবাদ জানিয়ে। তাদের পাঠানো সেই সংবাদ পরে ঐ প্লেনের ধ্বংসাবশেষ সত্বর খুঁজে বের করতে খুবই সহায়ক হয়েছিল।

এদিকে সেই সময় কুইবেকের একটি আরামপ্রদ হোটেলের কামরায় নিরাপদে বসে টেরেন্স দম্পতি দুপুরের আহার একত্রে সেরে রেডিও খুলে দিয়ে বসে বেবল কফির পেয়ালায় চুমুক দিতে শুরু করেছে, এমন সময় রেডিওতে শোনা গেল এক জরুরী ঘোষণা :-

"আমরা দুঃখের সাথে ঘোষণা করছি যে ক্যানাডিয়ান প্যাসিফিক এয়ার লাইনের ১০৮ নং ফ্লাইট কুইবেক থেকে বাইওকেমিওতে পৌঁছুবার সময় অনেক আগেই পেরিয়ে গেছে। কিন্তু এখনও প্লেন গন্তব্যস্থলে পৌঁছেনি। আশঙ্কা করা হচ্ছে যে প্লেনটি সেণ্ট আনের আশেপাশে কোথাও বিধ্বস্ত হয়েছে। শিগগিরই অনুসন্ধান চালান হচ্ছে।"

এই ঘোষণা শুনেই চমকে লাফিয়ে উঠল দুজনে। নিমেষে তাদের

Mamun Academy

মুখ ফ্যাকাশে হয়ে উঠল। এই মরণমুখী প্লেন থেকেই ভাগ্যবান টেরেন্সকে শেষ মুহূর্তে নামিয়ে নিয়ে এসেছে তার পুণ্যময়ী স্ত্রী। প্লেন থেকে অপ্রত্যাশিত ভাবে নেমে না এলে এখন তাদের কি অবস্থা হত তা ভাবতেই শিউরে উঠল দু'জন।

প্লেনে টেরেন্সের কয়েকজন বন্ধু-বান্ধবও ছিল। তাদের অবস্থা কি হয়েছে তা জানবার জন্যে স্বভাবতই সে অস্থির হয়ে উঠল। দেরি না করে টেরেন্স ছুটে এল এয়ার লাইন্সের অফিসে।

তখন বিকাল প্রায় ৪টা। এয়ার লাইন্স অফিসে পৌঁছুতে দেখা গেল সেখানে এর মধ্যেই শুরু হয়ে গেছে এক এলাহী কারবার। বহু লোক এসে ভীড় করেছে সেখানে, আর সবাই ব্যস্তভাবে জানতে চাচ্ছে প্লেনের শেষ সংবাদের কথা। সকলের মুখেই উৎকণ্ঠা ও আতঙ্কের চিহ্ন। এরা সবাই ওই প্লেনের যাত্রী নিজ নিজ আত্মীয়-স্বজনের সংবাদ জানার জন্যে ভয়ানক ব্যগ্র। কিন্তু এয়ার পোর্ট অফিস শেষ সংবাদ দিতে পারছিল না। দুপুরের আগেই ওই প্লেনের সঙ্গে সব গ্রাউণ্ড যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। তারপর থেকে প্লেনের আর কোন সংবাদই পাওয়া যায়নি।

এখন এদের কাছে এক একটি মিনিট যেন এক একটি ঘণ্টা হয়ে দাঁড়াল। যতই সময় যেতে লাগল ততই প্লেনের নিরাপত্তার আশা ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হয়ে চলল। আশেপাশের কোথাও যে প্লেনটি ভূমি স্পর্শ করছে সেরকম কোন খবর পাওয়া যায়নি। আর প্লেন বিধ্বস্ত হলে সাধারণতঃ যাত্রীদের যে কি দশা হয় সেকথা ত সকলেরই জানা আছে। তাই যতই সময় যেতে লাগল ততই সবাই নিরাশ হয়ে পড়ল। ক্রমে চাপা কান্নার শব্দও শোনা যেতে লাগল এয়ার অফিসে জড়ো হওয়া লোকদের মধ্যে থেকে। ভীড়ও সেখানে ক্রমেই বেড়ে চলল।

বোধ হয় সবচেয়ে করুণ দৃশ্যের অবতারণা করেছিল একজন ফরাসী ভাষাভাষী ক্যানাডীয় তরুণ পিতা। তার হাতধরেছিল সুন্দর সবল ফুটফুটে একটি চার বৎসরের মেয়ে, তাদের একমাত্র সন্তান। তার স্ত্রী অর্থাৎ মেয়েটার মা ওই হতভাগ্য ১০৮ নং ফ্লাইটের যাত্রী ছিল। পাগলের মত যুবকটি বারে বারে কাউন্টারের ক্লার্ককে বলছিল,—"দয়া করে দেখুন না আবার প্লেনটির কোন খবর পাওয়া গেল কিনা। সত্যিই কি প্লেনটির কোন খোঁজই নেই?"

মুখ নিচু করে এয়ার লাইন্সের ক্লার্ক নিঃশব্দে মাথা নেড়ে জানাল —"না কোন খোঁজ নেই।"

এই জবাব শোনার পরই স্বামী দু'হাতে মুখ ঢেকে চেয়ারে ধপ করে এলিয়ে পড়ল। দেখা গেল সে জ্ঞান হারিয়েছে। তার ছোট মেয়েটি তখনও তার অজ্ঞান পিতার বাহুর মধ্যে মুখ লুকিয়ে করুণ ভাবে উচ্চস্বরে কাঁদছিল। সমস্ত অফিস ঘরটির মধ্যে সেই ছিল একমাত্র বাচ্চা। তাই স্বভাবতই সবারই দৃষ্টি গিয়ে পড়ল এই করুণ, হৃদয়-বিদারক দৃশ্যের উপরে। দৃশ্যটি এতই অসহনীয় ছিল যে তৎক্ষণাৎ কর্তৃপক্ষ এদের শুশ্রূষার জন্যে পাশের একটি কামরা ছেড়ে দিল। আর বিমান কোম্পানী তাড়াতাড়ি একজন ধর্মযাজক এনে হাজির করল তাদের প্রবোধ দেবার জন্যে।

বিকাল ৪টার পর একটি সন্ধানী বিমান খবর নিয়ে ফিরে এল যে ২৫০০ ফুট উঁচু পাহাড় 'ক্যালটোর মেন্টির' ঠিক নিচে একটি স্বল্প পরিসর জায়গায় কিছু উজ্জ্বল ধাতব জিনিস দেখা গেছে। খুব সম্ভবত ওটাই হতভাগ্য প্লেনটির ধ্বংসাবশেষ।

সঙ্গে সঙ্গে একটি সন্ধানী দল সেই স্থানের উদ্দেশ্যে রওনা হতে প্রস্তুত হল। মিঃ টেরেন্সের সম্মতিক্রমে তাকেও দলের অন্তর্ভুক্ত করা

Mamun Academy

হল—এই কারণে যে মল্লিক পর্যন্ত টেরেন্স প্লেনের যাত্রী ছিল তাই হতভাগ্য অন্যান্য যাত্রীদের সনাক্ত করা তার পক্ষেই সহজ হবে। টেরেন্স সহ মোট ছয় জনকে নিয়ে এই সন্ধানী দল গঠন করা হল যার মধ্যে পুলিশ এবং বিমান কর্মচারীরাও ছিল।

প্রথমে কুড়ি মাইল এরা জীপে করে এগোল। তারপর রেল লাইনের কাছে পৌঁছে জীপ ছেড়ে দিয়ে তারা রেলের একটি ট্রলিতে ঠাসাঠাসি করে বসে রেল লাইন ধরে এগিয়ে যেতে লাগল। ট্রলিতে অতি কষ্টে তারা ৪০নং মাইল পোস্টের নিকটে পৌঁছল, যেখানে রেল লাইনে কর্মরত দুজন মজুর শেষ বারের মত প্লেনটিকে দেখতে পেয়েছিল।

এখান থেকে হাঁটা ছাড়া আর কোন উপায় নেই। দুর্গম পথ ধরে হেঁটে পাহাড়ের উপরে উঠতে হবে এখন। ঘন জঙ্গলাকীর্ণ বন্ধুর পথ সামনে। এদিকে সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে, সেই সঙ্গে অন্ধকার দ্রুত ছেয়ে যাচ্ছে চারদিকে।

অতিকষ্টে মাত্র ৪০০ গজের মত এগিয়েছে তারা, এমন সময় দলের একজন অত্যধিক পরিশ্রমে অসুস্থ হয়ে পড়ল। তাই তাকে নিচে ফেরৎ পাঠাতে হল। এরপর দলের আরও দুজনের অবস্থা সঙ্গীন হয়ে পড়ল। তারাও আর এগোতে পারল না।

অতঃপর দলের বাকী তিন জনই এগিয়ে চলল তাদের যাত্রাপথে, কারণ দেরি করার কোন উপায় ছিল না তখন। শিগগির অকুস্থলে পৌঁছতে পারলে হয় ত বা এখনও কয়েকটি অমূল্য প্রাণ রক্ষা করা যেতে পারে।

জঙ্গল এখানে এত ঘন ছিল যে ৫০ ফুট দূরেও কি আছে তা বুঝবার উপায় ছিল না। অতিকষ্টে টর্চ জ্বেলে এগিয়ে চলছিল ঐ তিনজন অবশিষ্ট দুঃসাহসী সন্ধানী যাত্রী।

Mamun Academy

সুখের বিষয় অল্পক্ষণ পরেই পরিষ্কার আকাশ আলোকিত করে সেপ্টেম্বরের পূর্ণ চাঁদ ভেসে উঠল। অভিযাত্রীদের কষ্ট অনেকটা লাঘব হল, তাদের মনোবলও ফিরে এল। চাঁদের আলো যে মানুষের এত উপকারে আসতে পারে এর আগে এরা তা কখনও বুঝতে পারেনি।

রাত্র ১১ টার সময় সামনের জন হেঁকে উঠল—দাঁড়াও, সামনে যেন কি দেখা যাচ্ছে!

হ্যাঁ, এবার সত্যিই পাওয়া গেল হতভাগ্য প্লেনটির ধ্বংসাবশেষ। উজ্জ্বল চন্দ্রালোকে চক্‌চক্‌ করছিল ওর রূপালী রঙের অবয়ব। দেখা গেল ডি, সি-৩ ওই প্লেনের পিছনের অংশ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে বাকী অংশ থেকে; আর পিছনের সেই বিচ্ছিন্ন অংশ খাড়া ভাবে গেঁথে গেছে মাটির মধ্যে। সাদা রঙের প্লেনের লেজের উপরে চাঁদের আলো প্রতিফলিত হয়ে মনে হচ্ছিল বুঝি কোন এক অদৃশ্য শক্তি জমিনের উপরে বিরাট এক ক্রশ চিহ্ন খাড়া করে রেখেছে। প্লেনের মূল শরীর ও ইঞ্জিনটি দূরে ছিটকে পড়েছিল, আর তার চকচকে এলুমিনিয়ামের অবয়বের উপরে চাঁদের আলো পড়ে ঝলমল করছিল।

সন্ধানী দলের সবাই থমকে দাঁড়িয়ে গেল ওখানে। কান পেতে নিঃশব্দে শুনবার চেষ্টা করল আশেপাশে কোথাও জীবনের কোন সাড়া পাওয়া যায় কিনা। আর্তের একটু চিৎকার বা মুমূর্ষুর কাতরানী। হয়ত আহত যাত্রীদের কেউ কেউ এখনও বেঁচে থাকতে পারে। তা হলে অন্তত তাদের গোঙানীর শব্দ পাওয়া যাবে। কিন্তু বৃথা হল সে আশা। আশেপাশে কোন প্রাণীরই সাড়া পাওয়া গেল না।

আবার সামনে এগোতে লাগল তারা।

হঠাৎ মাটিতে কাত হয়ে পড়ে থাকা একটি ছোট গাছে পা

Mamun Academy

আটকে টেরেন্স উপুড় হয়ে মুখ থুবড়ে নিচে একটি নরম জিনিসের উপরে এসে পড়ল। নিজেকে সামলে নিয়ে আশ্চর্য হয়ে দেখল তার নিচে রয়েছে একটি হতভাগ্য ছেলের মৃতদেহ, নিশ্চয়ই প্লেনের একজন যাত্রী। ছেলেটির গায়ে একটি ফার কোট। তার সেই কোট রাতের শিশিরে ভিজে ঠাণ্ডা হয়ে ছিল, সেই জমা শিশিরে টেরেন্সের শরীরও ভিজে গেল। রুমাল দিয়ে নিজের শরীরের শিশির মুছতে মুছতে সে লক্ষ্য করল যে একরকম মিষ্টি মিষ্টি পোড়া গন্ধে স্থানটি ভরপুর। জ্বলন্ত উনুনের উপরে কড়াইতে চিনি পোড়ালে যে রকম গন্ধ বের হয়, অনেকটা সেই রকম মিষ্টি গন্ধ আশেপাশে ছড়িয়ে আছে সর্বত্র। ওই গন্ধ টেরেন্সের কাছে পরিচিত বলে মনে হল; গত বিশ্ব যুদ্ধেরসময় যখন টেরেন্স স্থল বাহিনীতে কাজ করত তখন কামান দাগার পরে আশে পাশে ওই রকম গন্ধে ভরে যেত, এটা তার মনে পড়ল। মৃত ছেলেটির ফারের কোটের ভিতর থেকেও সেই মিষ্টি পোড়া গন্ধ ভেসে আসছিল। এই মিষ্টি গন্ধের অভিজ্ঞতা পরে সঠিক তদন্তের জন্য যে কত মূল্যবান তথ্যে পরিণত হয়েছিল তা তখন টেরেন্স চিন্তাও করতে পারেনি।

ঘটনাস্থলে প্রাথমিক তদন্ত সেরে সন্ধান পার্টি যখন কুইবেকে ফিরে এল তখন রাত ২টা, ভয়ানক ভাবে পরিশ্রান্ত তখন তারা সবাই।

পরদিন কানাডার বিখ্যাত ডিটেকটিভ 'মিঃ জুলে পেরাল্ট' ও 'মিঃ জি. বেলেঙ্গারে' টেরেন্সের সঙ্গে দেখা করতে এলেন ঘটনাস্থলে তার অভিজ্ঞতার বিষয়ে জানবার জন্যে। এই বিমান অ্যাক্সিডেন্টের বিষয় তদন্ত করার ভার পড়েছিল এই দুজনের উপর। আলোচনা কালে মিঃ টেরেন্স এঁদের কাছে ঘটনাস্থলে মিষ্টি চিনি পোড়া গন্ধ পাবার কথা

Mamun Academy

বলতেই পেরাল্টের মুখ গম্ভীর হয়ে উঠল। তিনি কান খাড়া করে বিস্তারিতভাবে ঐ মিষ্টি গন্ধের বিবরণ সংগ্রহ করলেন। ভুরু কুঁচকে তিনি প্রশ্নের পর প্রশ্ন করলেন টেরেন্সকে সে সম্বন্ধে। বোঝা গেল মিঃ পেরাল্ট ওই গন্ধের সূত্র ধরেই কোন গভীর ষড়যন্ত্রের কথা চিন্তা করছেন। পরে অবশ্য পরিষ্কার বোঝা গিয়েছিল যে মিঃ টেরেন্সের ঐ মিষ্টি গন্ধের অভিজ্ঞতা এবং এ ব্যাপারে ডিটেকটিভদের সঠিক সন্দেহ এই দুর্ঘটনার সঙ্গে জড়িত প্রকৃত দোষী ব্যক্তিকে খুঁজে পেতে কত বেশি সাহায্য করেছিল।

এরপর প্লেনের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে বিশেষ ভাবে তদন্ত করে জানা গেল যে ঐ ডি. সি. ৩ প্লেনের যন্ত্রপাতিতে কোন গোলযোগই ছিল না। প্লেনটি ধ্বংস হবার আগ পর্যন্ত এর সমস্ত ইঞ্জিন নিখুঁত-ভাবে কাজ করে চলছিল। এর তেলের ট্যাঙ্কটিও ছিল পূর্ণ। ঘটনার আগে বা পরে আগুন ধরেনি কোথাও। এর কন্ট্রোল ইঞ্জিন সঠিক-ভাবে কাজ করে চলছিল। এর অগ্নি নির্বাপন যন্ত্র, ব্যাটারী, রেডিও ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি সবই ঠিক ছিল, তাই বিশেষজ্ঞদের মতে অ্যাক্সি-ডেন্টের কারণ মনে হল, বাইরের কোন দ্রব্য প্লেনের ভিতরে সম্ভবতঃ হঠাৎ এক প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ঘটিয়েছিল।

গভীর তদন্তের ফলে দেখা গেল যে পাইলটের কেবিনের সংলগ্ন পিছনে ১নং মাল রাখবার ঘরে কোন অজ্ঞাত কারণে হঠাৎ এক বিস্ফো-রণ ঘটে প্লেনটিকে একেবারে অচল করে দেয়। এই সিদ্ধান্তে পৌছ-বার পরেই ক্যানাডীয় বিমান কোম্পানীর তদন্তকারীরা আরও তৎ-পর হয়ে উঠল। এবার সেই ফ্লাইটের মাল ও যাত্রী সম্বন্ধে বিশদ তদন্ত শুরু হল।

তদন্তে প্রকাশ পেল যে প্লেনটি যখন কুইবেক বিমান বন্দরে

পৌঁছে, তখন ১নং মাল ঘর একেবারে খালি করা হয়েছিল, কারণ এর সমস্ত মালই কুইবেকে নামানো হয়। তদন্তকারীরা বিমানের অন্যান্য সমস্ত মালেরই সন্ধান দুর্ঘটনার স্থানে খুঁজে পেল, পেল না কেবল ২৮ পাউণ্ড ওজনের একটি প্যাকেটের সন্ধান যা কুইবেক থেকে বুক্ করা হয়েছিল বাইওকেমিওর অধিবাসী অ্যাড্রিস পুলফ্ নামক এক ব্যক্তির বরাবর। সেই প্যাকেটের উপরে একটি লেবেলও আঁটা ছিল তাতে লেখা ছিল 'Fragile'(ভঙ্গুর)।

এখন প্রশ্ন হল কে পাঠাল ওই রহস্যজনক প্যাকেট? আর তা গেলই বা কোথায়?

বিমান কোম্পানীর মাল বুকিং ক্লার্ককে এ সম্বন্ধে প্রশ্ন করে জানা গেল যে তার ক্ষীণভাবে মনে পড়ছে যে প্লেনটি ছাড়বার কিছুক্ষণ আগে বেঁটে, স্বাস্থ্যবতী ও কালো পোষাক পরিহিতা এক মহিলা একটি ট্যাক্সিতে করে এসে ওই ২৮ পাউণ্ডের মালটি তাড়াতাড়ি বুক করে দিয়ে আবার সেই গাড়িতেই ফিরে যায়। আরও খোঁজ নিয়ে জানা গেল যে যার বরাবর প্যাকেটটি বুক করা হয়েছিল সেই এড্রিস পুলফ্ নামে আসলে কোন ব্যক্তি সমগ্র বাইওকেমিওতে নেই। ফলে সন্দেহ আরও ঘনীভূত হল। কিন্তু কেবল মাত্র সন্দেহের উপরে নির্ভর করেই ত কিছু করা যায় না।

প্লেন দুর্ঘটনার তদন্ত শেষ করে ১৫ই সেপ্টেম্বর করোনার ঘোষণা করল যে দুর্ঘটনায় প্লেনের সকল যাত্রীরই মৃত্যু হয়েছে ঘটনাস্থলে, তারা আরও ঘোষণা করে যে দুর্ঘটনা ঘটে প্লেনের ভিতরে এক রহস্যজনক বিস্ফোরণের কারণে। তবে প্লেনের নিজস্ব কোন অংশ থেকে ঐ বিস্ফোরণের উৎপত্তি হয়নি, ওটা হয়েছে কোন এক অজ্ঞাত বস্তু থেকে।

Mamun Academy

এই ঘোষণার দিনরাত্রেই ডিটেকটিভ পেরাল্ট এসে মিঃ টেরেন্সের সঙ্গে আবার সাক্ষাৎ করলেন। তাঁকে গোপনে এক পার্শ্বে ডেকে নিয়ে করোনারের রিপোর্ট সম্বন্ধে উল্লেখ করে বললেন, 'তাহলে দেখা যাচ্ছে ঘটনাস্থলে আপনার পাওয়া ঐ তীব্র মিষ্টি গন্ধ এখন প্লেন দুর্ঘটনার কারণ সম্বন্ধে আরও একটি গভীর গন্ধ বয়ে নিয়ে আসছে।'

অনেক খোঁজ করার পর সেই কালো পোশাক পরিহিতা মহিলার ট্যাক্সি চালকের খোঁজ পাওয়া গেল। এই ড্রাইভারই পার্সেলের সেই প্যাকেট সহ মহিলাকে নিয়ে এসেছিল সেদিন এয়ার পোর্টে। ড্রাইভার জানাল যে মেয়েলোকটিকে দেখলে এখনও সে চিনতে পারবে তাকে। কিন্তু কোথায় খোঁজ পাওয়া যায় এখন সেই রহস্যাবৃতা মহিলার?

এরপর কয়েকদিন চুপচাপ।

হয়ত অন্যান্য প্লেন দুর্ঘটনার মত এটাও আস্তে আস্তে লোকচক্ষুর অন্তরালে তলিয়ে যেত— যদি না সেদিন মন্ট্রিলের এক বিখ্যাত সংবাদ পত্রে একটি চাঞ্চল্যকর শিরোনামায় এই খবরটি বেরুত; "কে সেই কালো পোশাকধারী রহস্যজনক মহিলা?" সেই সঙ্গে কাগজে আরও বেরুল সেই ট্যাক্সি ড্রাইভারের সঙ্গে সংবাদ পত্রের রিপোর্টারের সাক্ষাৎকারের কাহিনী। এর পরই আবার জনসাধারণের তরফ থেকে দৃঢ় কণ্ঠে দাবী উঠল, এই রহস্যের সন্ধান যেন অবশ্যই করা হয়। দেশের পুলিশ যদি একাজটুকুও না পারে, তবে জনসাধারণের টাকার অপব্যবহার করছে মাত্র দেশের বিরাট পুলিশ বাহিনী।

আবার তৎপর হয়ে উঠল পুলিশ ও ডিটেকটিভ বাহিনী। সেই তারিখের ১০৮ নং ফ্লাইটের প্যাসেঞ্জারদের তালিকা বিশ্লেষণ করে

Mamun Academy

দেখা গেল যে 'রীটা মরেল গয়ট' নামক একজন মহিলা কুইবেক থেকে ওই প্লেনে উঠেছিল। (এ সম্বন্ধে আগেই উল্লেখ করা হয়েছে)। তার সম্বন্ধে আরও খোঁজ নিয়ে জানা গেল যে এই মহিলার দাম্পত্য জীবন প্রথমে সুখের ছিল না। তার স্বামী আলবার্ট গয়ট তাকে ফেলে ১৯ বৎসর বয়স্কা তন্বী যুবতী মেরীর প্রতি আকৃষ্ট হয়। কুইবেক শহরে আলাদা একটি ঘর ভাড়া করে আলবার্ট সেই মেয়েটিকে সেখানে রেখে গোপনে তার কাছে রাত্রি কাটাত।

স্ত্রী রীটা গয়ট তার স্বামীর এই অধঃপতনের সংবাদ শুনে এক-চোট ঝগড়া করল তার সঙ্গে। কিন্তু স্বামীকে সে সৎপথে আনতে পারল না। তাই একদিন রীটা রাগে তার তল্পিতল্পা গুটিয়ে বাচ্চা সহ তার মায়ের বাড়িতে গিয়ে হাজির হল। এদিকে আলবার্টের নতুন প্রেমিকা মেরীও তার সঙ্গে ঝগড়া করে একদিন তার মায়ের বাড়িতে চলে গেল। এতে আলবার্ট খুব রেগে গিয়ে মেরীর খোঁজে যে রেস্টুরেন্টে সে কাজ করত সেখানে গিয়ে হাজির হল। সেখানে মেরীকে তার ঘরে ফিরে আসতে অনুরোধ করল বার বার। কিন্তু মেরী সেসব অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করল। তখন রেগে গিয়ে আলবার্ট পিস্তল বের করে তাড়া করল মেরীকে খুন করতে। এই কারণে পুলিশ আলবার্টকে গ্রেফতার করে কয়েকদিন হাজতে আটকে রাখে। পরে অবশ্য মেরীর সঙ্গে আলবার্টের মিটমাট হয়ে যায়।

পুলিশ খোঁজ নিয়ে আরও জানল যে কালো পোশাক পরিহিতা ঐ রহস্যজনক মেয়েলোকটির নাম মার্গারেট পিটার। সে ছিল আলবার্টের প্রতিবেশী ও তার বিশিষ্ট বান্ধবী। অতঃপর মার্গারেটকে সঠিকভাবে সনাক্ত করার জন্যে ট্যাক্সি ড্রাইভারকে গোপনে মার্গারেটের বাসার সামনে এনে রাখা হল। কিন্তু দুঃখের বিষয় সে যাত্রা সারা-

দিনেও মার্গারেট তার বাসার বাইরে এল না। পুলিশ আলবার্ট গয়ট-এর বাসার উপরও কড়া নজর রাখল।

আলবার্ট কিন্তু প্রথমে পুলিশ ও ডিটেকটিভদের এই সব গোপন তৎপরতার বিষয় কিছুই টের পায়নি। দুর্ঘটনার পরের রবিবারে সে তার বান্ধবী মেরীর সঙ্গে ফুর্তিতে সারারাত হোটেল ও থিয়েটারে কাটিয়ে সেদিনই তাকে বলে যে আগামী কয়েকদিনের মধ্যেই সে বহু টাকার মালিক হতে যাচ্ছে এবং তখনই সে মেরীকে বিবাহ করবে। এরই মধ্যে আলবার্ট ওই প্লেন দুর্ঘটনায় নিহত তার স্ত্রী রীটার ইন্সিওরেন্সের দশ হাজার ডলার পাবার প্রায় সমস্ত ব্যবস্থাও পাকা করে ফেলছিল।

কিন্তু সোমবারেই আলবার্ট জানতে পারল যে পুলিশ কালো পোশাক পরিহিতা মার্গারেট পিটারের খোঁজ করছে ও এ ব্যাপারে তারা অনেকদূর এগিয়েও গেছে। আলবার্ট এতে প্রমাদ গুণল। সে বুঝল মার্গারেটকে ধরতে পারলে সবকিছু ফাঁস হয়ে যাবে, তখন আর তার রক্ষা থাকবে না। সঙ্গে সঙ্গে আলবার্ট এক শিশি তীব্র ঘুমের ঔষধ নিয়ে মার্গারেটের কাছে এসে হাজির হল। তাকে গোপনে ডেকে নিয়ে ভালভাবে বুঝিয়ে বলল যে সে জানতে পেরেছে পুলিশ প্লেন দুর্ঘটনার জন্য একমাত্র মার্গারেটকেই দায়ী করেছে। আর তারা এ সম্বন্ধে বহু সাক্ষ্য-প্রমাণও সংগ্রহ করে ফেলেছে।

শিগগিরই পুলিশ মার্গারেটকে গ্রেফতার করে তার উপর অমানুষিক অত্যাচার চালাবে। এক্ষেত্রে মার্গারেটের বরং শান্তিতে আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়াই শ্রেয়, কারণ এমনিতেও ফাঁসীর হাত থেকে তার কোনক্রমেই নিস্তার নেই।

আলবার্টের প্রবল যুক্তির কাছে মার্গারেট হার মানল। শেষ পর্যন্ত সে স্লিপিং পিল খেয়ে আত্মহত্যা করতে রাজি হল। আলবার্ট খুশি হয়ে এবার আর একটি চাল চালল। সে মার্গারেটকে আরও রাজি করাল যে সে পিল খাবার আগে নিজ হাতে একটি চিঠি লিখে রেখে যাবে, যাতে লেখা থাকবে যে তার ইচ্ছা ছিল ওই প্লেনে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে তার শত্রু 'আলবার্ট গয়টকেই' হত্যা করা। কিন্তু এখন সে জানতে পারল যে তার চক্রান্ত ব্যর্থ হয়েছে আর তার শত্রু আলবার্ট মরেনি বরং মরেছে তার নির্দোষ স্ত্রী এবং আরও বহু যাত্রী। তাই বিবেকের অনুশোচনায় আজ সে স্বেচ্ছায় এই আত্মহত্যা করছে।

আলবার্টের অনুরোধে মার্গারেট মন্ত্রমুগ্ধের মত ওভাবে একটি চিঠি লিখে তাতেও সই করল। যথাস্থানে এগুলো রেখে মার্গারেটের হাতে পিলের খোলা প্যাকেটটি তুলে দিয়ে আলবার্ট তার কাছ থেকে শেষ বিদায় নিয়ে দ্রুত উধাও হল।

এরপর মাত্র কয়েকটি পিল খাবার পরই মার্গারেটের এক বন্ধু সেখানে এসে হাজির। তার অনুরোধে মার্গারেট তাকে তার কাহিনী বলতে লাগল। এদিকে পিলের ক্রিয়া শুরু হল। মার্গারেটের অবস্থাও ক্রমে সঙ্গীন হয়ে পড়ল। সে জ্ঞান হারাল। তার বন্ধু তখনই ফোনে পুলিশ ও ডাক্তারকে দ্রুত খবর পাঠাল। পিলের শিশিও তার হাত থেকে কেড়ে নিল। সঙ্গে সঙ্গে মার্গারেটকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হল। সে যাত্রা অবশ্য মার্গারেট বেঁচে গেল, তবে বেশ ক'দিন লেগে গেল তার সম্পূর্ণ সুস্থ হতে।

সুস্থ হয়ে উঠে মার্গারেট সমস্ত ঘটনা ডিটেকটিভদের বলে দিল। সে জানাল যে সে নিজেই সেই ২৮ পাউণ্ডের প্যাকেটটি আলবার্টের অনুরোধে এয়ারপোর্টে পৌঁছে দিয়েছিল। সে এর আগে

ঘুণাক্ষরেও জানত না যে ওটার ভিতরে কি আছে। বরং আলবার্ট তাকে বলেছিল যে ওতে আছে একটি সুন্দর দামী চীনামাটির মূর্তি।

দুর্ঘটনার ঠিক দুই সপ্তাহ পরে শুক্রবারে আলবার্ট গয়ট তার নতুন শাশুড়ির (মেরীর মা) বাসায় বসে যখন আনন্দে সময় কাটাচ্ছিল তখন হঠাৎ সে রেডিওতে শুনতে পেল যে পুলিশ সেই রহস্যজনক কালো পোশাকধারী মেয়েটিকে খুঁজে পেয়েছে; শিগগিরই দুর্ঘটনা সম্বন্ধে আরও চমকপ্রদ রহস্য উদ্ঘাটিত হবে।

রেডিওতে এই সংবাদ শুনেই আলবার্ট ক্রোধে ফেটে পড়ল। রাগে টেবিল চাপড়ে সে বলে উঠল, "কি সব পাগলদের পাল্লায় পড়েছি!" এই বলেই সে দরজা খুলে দৌড়ে বাইরে বেরিয়ে এল পালাবার উদ্দেশ্যে। কিন্তু পুলিশ এটা আঁচ করে সেখানে আগে থেকেই প্রস্তুত ছিল। ঘর থেকে বেরুবার সঙ্গে সঙ্গেই পুলিশ আলবার্টকে গ্রেফতার করল। অবশেষে এক গভীর পানির মাছ জালে আটকা পড়ল। কিন্তু তখনও পুলিশের আরও অনেক কাজ বাকি ছিল: প্লেন দুর্ঘটনা সম্বন্ধে আলবার্টের বিরুদ্ধে সন্দেহাতীত প্রমাণ এখনও পাওয়া যায়নি। আর তা না পাওয়া পর্যন্ত কোর্টে তার শাস্তি হওয়াও সম্ভব নয়।

অতঃপর আলবার্টকে জেলের একটি সেলে এনে বন্দী করে রাখা হল, আর সেই সেলে তার একজন সঙ্গীও দেয়া হল। সেই সঙ্গী আলবার্টকে জানাল যে সে-ও এক খুনী আসামী। এখন সে সেলে বসে বসে মৃত্যুর দিন গুণছে। আলবার্টকে সে তার নৃশংস খুনের কাহিনী শুনাল যার নাকি সে নায়ক। প্রথমে কিন্তু ধূর্ত আলবার্ট এর প্রতি সন্দেহপ্রবণ ছিল ও তার কাছে কোন কথা প্রকাশ করেনি। কিন্তু ক্রমে ক্রমে আলবার্টের সেই সন্দেহ দূর হল

Marium Academy

ও কথাচ্ছলে নির্জন জীবনের এই একমাত্র সঙ্গীকে তার মনের সব কথা প্রকাশ করতে শুরু করল। আর এই সঙ্গীটিও গভীর সহানুভূতি দেখিয়ে বিস্তারিতভাবে সবকিছু শুনে নিল আলবার্টের মুখ থেকে।

আসলে কিন্তু সে লোকটি ছিল কানাডার গোয়েন্দা বিভাগেরই একজন কর্মচারী, আলবার্টের মনের কথা বের করার উদ্দেশ্যেই তাকে খুনীর ছদ্মবেশে আলবার্টের সঙ্গী করে ওই একই সেলে রাখা হয়েছিল। এত নিখুঁতভাবে গোয়েন্দা তার উপরে অর্পিত কাজ সমাধা করেছিল যে চতুর আলবার্ট এই চালাকি মোটেই টের পায়নি।

এর কাছেই আলবার্ট তার মনের দুয়ার খুলে দিয়ে জানাল যে তার এক পুরানো বন্ধু ঘড়িমেরামতকারী জেনারাস রুসেট-এর কাছ থেকে সে অর্ডার দিয়ে একটি "টাইম যন্ত্র" তৈরি করে নিয়েছিল। এই যন্ত্র একটি ড্রাই ব্যাটারীর সঙ্গে তার দিয়ে যোগ করে দিলে সময় মত আপনা থেকেই সক্রিয় হয়ে উঠত। রুসেটের সঙ্গে আলবার্টের প্রথম পরিচয় হয় গত মহাযুদ্ধের সময়, যখন তারা দুজনেই কুইবেকের এক অস্ত্র ফ্যাক্টরীতে একসঙ্গে কাজ করত। যুদ্ধ শেষে রুসেট কুইবেকে একটি ঘড়ি ও জুয়েলারী মেরামতের দোকান খুলে বসে, আর আলবার্ট সেখানে ছিল তার নিয়মিত খদ্দের।

পুলিশ রুসেটকে এ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করে জানতে পারল যে আলবার্টের অনুরোধে সে তাকে একটি "টাইম যন্ত্র" তৈরি করে দিয়েছিল, কারণ আলবার্ট তাকে জানিয়েছিল যে ওটা দ্বারা সে তার গ্রামের বাড়ির একটি ভাঙা পুরানো কালভার্ট সহজে ধ্বংস করে দিয়ে সেখানে নতুন ভাবে একটি পুল তৈরি করবে। পুলিশ কিন্তু অনুসন্ধান করে জানতে পারল যে কালভার্ট ভাঙা ত দূরের কথা আসলে আলবার্টের কোন গ্রামের বাড়িই ছিল না।

Mahua Academy

এর পরেও কিন্তু পুলিশ ও ডিটেকটিভদের অনেক কাজ বাকি রইল। অতঃপর লাভেল ইউনিভার্সিটির কেমিস্ট্রির প্রফেসার ডাঃ গ্রাভালের সাহায্য নেয়া হল এ ব্যাপারে। তিনি রুসেটকে দিয়ে অনুরূপ আর একটি "টাইম যন্ত্র" তৈরি করে তার সঙ্গে ব্যাটারী দিয়ে ডিনামাইটের একটি প্যাকেটের যোগসাধন করে ও এই সব দিয়ে মোট ২৮ পাউণ্ডের একটি প্যাকেট তৈরি করে তাতে ঠিক আধ-ঘণ্টা পরে সময় মত আপনাআপনি এক বিস্ফোরণ ঘটিয়ে কোর্টে সুস্পষ্ট ভাবে প্রমাণ করলেন যে কত ধূর্ততার সঙ্গে আলবার্ট ২৮ পাউণ্ডের ঐ প্যাকেটে টাইম বোমা রেখে আধঘণ্টা পরে ঐ প্লেন আকাশে থাকাকালীন হঠাৎ ঐ বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে।

এদিকে প্লেনের ধ্বংসস্তূপ থেকে প্রতিটি জিনিস অতি সাবধানে সরাতে সরাতে নিচে এক জায়গায় পাওয়া গেল দুইটি ড্রাই ব্যাটারী সহ একটি ডিনামাইটের অংশ। এর সঙ্গে সংযোজিত ছিল কিছু ইলেকট্রিক তার যার কিছু অংশ পুড়ে গেছে। অথচ প্লেনের নিজস্ব কোন অংশে অনুরূপ কোন তার বা ব্যাটারী ব্যবহৃত হয়নি।

রাসায়নিক পরীক্ষায় আরও প্রমাণিত হল যে সেই ব্যাটারীর সঙ্গে সংযুক্ত ডিনামাইট দ্বারাই প্লেনে টাইম বোমার সাহায্যে বিস্ফোরণ ঘটানো হয়েছে। আর সেই টাইম বোমার একমাত্র উৎস ছিল ২৮ পাউণ্ডের 'ভঙ্গুর' লেবেল দেয়া প্যাকেটটি। প্লেনের যন্ত্রপাতিগুলো যে ঠিক ঠিক কাজ করছিল সে সম্বন্ধে টেরেন্সও কোর্টে মূল্যবান সাক্ষ্য দেন।

আলবার্টের নতুন প্রেমিকা মেরীর সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা ও এই নিয়ে তার স্ত্রীর সাথে রাগারাগি, আবার ঘটনার আগে তাদের মধ্যে আশ্চর্য-জনক ভাব, স্ত্রীর জন্যে আলবার্টের রিটার্ন প্লেনের টিকিট কেনা ও সেই সঙ্গে ১০,০০০ ডলারের একটি প্লেন জীবন বীমা ক্রয়, আর স্ত্রীর

মৃত্যুর পর পরই সেই টাকা উঠাবার জন্যে ব্যস্ত হওয়া ও তাড়াতাড়ি মেরীর সাথে তার বিয়ের তারিখ ধার্য করা—এই সব ঘটনার যোগাযোগ আলবার্টের অপরাধ সঠিকভাবে কোর্টে প্রমাণ করতে খুবই সাহায্য করল। এখন স্পষ্ট প্রমাণিত হল যে আলবার্ট এক ঢিলে দুইটি পাখী মারতে চেয়েছিল। বিমান দুর্ঘটনা ঘটিয়ে সে তার নতুন প্রেমের বাধা সৃষ্টিকারী স্ত্রী রীটাকে চিরতরে সরিয়ে নিষ্কণ্টক হতে চেয়েছিল, আবার তার মৃত্যুর কারণে বীমা কোম্পানীর কাছ থেকেও সে দশ হাজার ডলার লাভ করতে চেয়েছিল। কিন্তু তার বিবেকে একটুও ভাবনা জাগেনি যে এর সঙ্গে আরও বহু মূল্যবান জীবনও অকালে ঝরে পড়বে তার সেই হীন বীভৎস হত্যাকাণ্ডে। কিন্তু ঈশ্বরের অদৃশ্য ইঙ্গিতে এই গভীর ষড়যন্ত্রও শেষ পর্যন্ত ফাঁস হয়ে গিয়ে প্রকৃত পাপী ধরা পড়ল।

কোর্টে দীর্ঘ তেরো দিন ধরে একটানা শুনানীর পর এই চাঞ্চল্যকর মামলায় জুরীরা মাত্র ১৭ মিনিট কাল রুদ্ধ কক্ষে আলোচনা করেই একমত হয়ে বেরিয়ে এসে সমস্বরে ঘোষণা করল,—"আসামী আলবার্ট গয়ট ইচ্ছাকৃতভাবে নরহত্যার দোষে দোষী।"

কানাডার বিচারের ইতিহাসে নরহত্যার আসামীর বিরুদ্ধে এর আগে কখনও এত অল্প সময়ে জুরীরা একমত হয়ে আসামীকে দোষী সাব্যস্ত করতে পারেনি।

বিচারপতি আলবার্ট সেভ্যোলি জুরীদের সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত হয়ে আসামীকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করে বলেন: "যে সব পাপীরা মনে করে যে তারা তাদের চালাকি দ্বারা বিচারের হাত থেকে রেহাই পাবে, তারা এই অমোঘ সত্য ভুলে যায় যে স্রষ্টার অদৃশ্য হাত সব সময় সত্যের দিকেই থাকে। আর তাঁর বিচার থেকে শেষ পর্যন্ত কোন পাপীরই নিস্তার নেই।"

কর্ণেল ইউসুফ ও ক্রিস্টা রেনেটি

Mamun Academy

লাহোর
১/৬২

"রেনেটি,

লোকে বলে বিপদ একা আসে না।

বাচ্চা পপি কাল গোসলখানায় পা পিছলে পড়ে গিয়ে অনেক খানি কেটে ফেলেছে, প্রায় কুড়ি মিনিট সে অজ্ঞান হয়ে পড়ে ছিল, আমার ভয় হয়েছিল, হয়ত এ ধাক্কা সে সামলাতে পারবে না। কিন্তু অবস্থা সে পর্যায়ে পৌঁছেনি। এখন সে বিছানায় ঘুমাচ্ছে।

সব বাচ্চারা সারারাত আমাকে জড়িয়ে ধরে থাকে। বোধহয় তাদের ভয় হয় যে তোমার মত আমিও এবার তাদের ছেড়ে দূরে পালিয়ে যাব। এখনও আমি বাচ্চাদের সমস্ত ঘটনা বলিনি। আমি তাদের কেবল বলেছি যে, তুমি শিগগিরই ফিরে আসবে। কিন্তু পপি সব বুঝতে পেরেছে। তাই সে-ই মুষড়ে পড়েছে বেশি। আর আমি-নেরা ছজনে আমাকে অনেক সাহায্য করেছে। তুমি যা করেছ, আর যেভাবে তা করেছ তা তারা স্পষ্ট ভাবে বুঝতে পেরেছে।

রেনেটি, আমার বাচ্চারা তাদের মায়ের স্নেহ থেকে চির তরে

বঞ্চিত হবে আর আমি সেই অমানুষিক কাজে কোন প্রকার সহায়তা করব, একথা তুমি চিন্তা করে থাকলে আমার প্রতি ভয়ানক অন্যায় করবে। আমি 'রাজা'কে এ সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করেছিলাম। সে যদিও সবকিছুই স্বীকার করে তবুও বিশ্বাস করে যে এটি তোমার ক্ষণিকের ভুল।

যাই হোক না কেন, রেনেটি, আমি নিজে তোমার শুভ কামনাই করি। যদিও আমি বিশ্বাস করি যে, তোমার নিজ সন্তানদের দুর্গতি ও তাদের চোখের জলের উপরে তুমি আর একটি সুখী জীবন কখনই গড়ে তুলতে পারবে না। রেনেটি, যদি তুমি কখনও একজন প্রকৃত বন্ধুর বা কোন সাহায্যের প্রয়োজন বোধ কর তবে আমাকে তুমি সর্বদাই পাবে।

আমি তোমাকে সত্যিই অনেক ভালবাসি। তুমি আমাকে অবশ্যই ক্ষমা করবে, আমি বাচ্চাদের তোমার কাছে পাঠাইনি বা তাদের তোমাকে দেখতে দিইনি। এর কারণ নিশ্চয়ই তুমি বুঝতে পেরেছ। কিন্তু আমি অবশ্যই তোমার সঙ্গে শিগগির একবার শেষ আলোচনা করতে চাই। আর জানতে চাই যে এই রেনেটি কি সেই একই রেনেটি যে আমার সেই চির পরিচিত মেয়ে, না সে এখন এক পথ-ভ্রষ্টা, বিপথগামী মহিলা? আমি জানি না আমার এই চিঠি তোমার হাতে পৌঁছবে কিনা, অথবা এর উপরে কোন বাধা-নিষেধ আরোপিত আছে কিনা। প্রিয় রেনেটি আমার—কত শীঘ্র আমি তোমার সাক্ষাৎ পাব? আমি পপি সম্বন্ধে জানাতে তোমাকে টেলি-ফোনে যোগাযোগ করতে চেষ্টা করেছিলাম।

রেনেটি, তোমার সম্বন্ধে যে যাই বলুক না কেন আমি কিন্তু তোমাকে দোষ দিচ্ছি না। আমি আমিনকেও গতকাল বলেছি যে এস

Mamun Academy

সত্ত্বেও তোমার উপর আমার কোনও প্রতিহিংসার মনোভাব নেই।

আমি তোমার নিকট থেকে বিশদ উত্তরের অপেক্ষায় আছি।

মাঝে মাঝে লিখো, শিগগির কোন করো। এটা কি সম্ভব হবে যে আমরা আবার একত্রে জীবন যাপন করতে পারব?

আমাদের সকলের কাছ থেকে ভালবাসা নেবে।

নওয়াজ।"

উপরের করুণ হৃদয়-বিদারক চিঠিটি লিখেছিল লাহোরের সৈয়দ আলী নওয়াজ গারদেজী তার জার্মান স্ত্রী ক্রিস্টা রেনেটিকে উদ্দেশ্য করে। এর মাত্র কয়েকদিন আগে রেনেটি তার স্বামীকে ত্যাগ করে কোয়েটার তৎকালীন ডিভিশনাল কমিশনার কর্ণেল মোঃ ইউসুফ, সি. এস. পি-র সঙ্গে চলে গিয়েছিল কোয়েটাতে।

আরও দশ বছর আগেকার কথা। ১৯৫১ সালে সৈয়দ আলী নওয়াজ গারদেজী ইংলণ্ডে থাকাকালীন সেখানে সুন্দরী জার্মান তরুণী ক্রিস্টা রেনেটির সঙ্গে প্রথম পরিচিত হয়। ক্রমে সেই আলাপ প্রেমে পরিণত হয়। শেষে দুজনে ১৯৫১ সালের ২১শে জানুয়ারী বিলেতে 'রেজিস্ট্রার অফ ম্যারেজ' এর অফিসে গিয়ে শুভ পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হয়। পাকিস্তানী নাগরিক সৈয়দ গারদেজীশিয়া মুসলমান ছিলেন। কিন্তু ক্রিস্টা রেনেটি বিশেষভাবে তার মায়ের একান্ত অনুরোধে বিয়ের পরও স্বামীর ধর্ম গ্রহণ না করে খ্রীস্টানই থেকে যায়। ক্রিস্টা তার মায়ের একান্ত অনুরক্ত ছিল। গারদেজীও রেনেটির এই ইচ্ছায় সম্মতি দেয় বিয়ের আগেই।

বিয়ের পর উভয়ে কিছুদিন কপোত-কপোতীর মত ঘুরে বেড়াল বিদেশে। তারপর ১৯৫৩ সালে তারা পশ্চিম পাকিস্তানে চলে

Mamun Academy

এল। সেখানে লাহোরে বিখ্যাত জার্মান ফার্ম 'সীমেন্স ইঞ্জিনিয়ারিং কোঃ লিঃ' এর আঞ্চলিক ম্যানেজার নিযুক্ত হয়ে মিঃ নওয়াজ লাহোরেই বসবাস শুরু করল সপরিবারে।

ক্রমে ক্রমে তাদের তিনটি সন্তান জন্মগ্রহণ করল। বাপ-মার অতি আদরের এই সন্তানদের প্রথম দুটি ছিল পুত্র আর তৃতীয়টি কন্যা। ছেলে দুটির সুশিক্ষার জন্যে গোড়াতেই তাদের ভর্তি করে দেয়া হল মারীর বিখ্যাত আবাসিক লরেন্স কলেজের শিশু শাখায়। মাঝে মাঝে তারা উভয়েই মারীতে যেত ছেলেদের দেখতে।

আবার রেনেটির উপর তার নিজের মায়ের টানও ছিল খুব প্রবল। তাই সে সুযোগমত তার মাকে দেখতে যেত ইউরোপে। কখনও যেত একলা নিজে আবার কখনও স্বামীর সঙ্গে। মোট কথা পুত্র-কন্যা নিয়ে সচ্ছল সুখী পরিবার হিসেবেই নওয়াজ-রেনেটি পরিচিত ছিল লাহোরের সবার কাছে।

১৯৬১ সালের আগস্ট মাসে এরা দুজনে ইউরোপে যায়। রেনেটি তার মার কাছে বেশ কিছুদিন আনন্দে কাটাল সেখানে। আর নওয়াজও তার ফার্মের কিছু কাজকর্ম সেরে নিল। ফেরার পথে তারা ঠিক করল যে ইউরোপ থেকে কোয়েটা আসবে। সেখানে বেড়িয়ে তবে তারা লাহোর ফিরবে।

১৯৬১ সালের ১৩ই আগস্ট তারিখে তারা প্লেনে সোজা কোয়েটা এসে নামল। কোয়েটার মনোরম সাকিট হাউজে দুজনে একদিন কাটাল। ঠিক সেই দিনই সাকিট হাউজের অপর অংশে অবস্থান করছিল কোয়েটা বিভাগের তৎকালীন ডিভিশনাল কমিশনার লেঃ কর্ণেল মোহাম্মদ ইউসুফ, সি. এস. পি। ওই সাকিট হাউজেই কর্ণেল ইউসুফের সঙ্গে মিসেস রেনেটির প্রথম পরিচয় হয়। প্রথম

Mamun Academy

দর্শনেই কর্ণেল রেনেটিকে দেখে মুগ্ধ হল। ইউসুফের কাছে রেনেটিকে মনে হল সৌন্দর্যের রানী জোলেখা বুঝি তারই জন্যে বেহেশ্‌ত থেকে নেমে এসেছে কোয়েটাতে। কর্ণেল ইউসুফই আগ্রহ করে পরিচিত হল রেনেটি ও গারদেজীর সঙ্গে। মুগ্ধ হয়ে কর্ণেল রেনেটির কাছ থেকে শুনল তাদের সদ্য ইউরোপ ভ্রমণের কাহিনী মিঃ ইউসুফের অমায়িক ব্যবহার, সুন্দর চেহারা, তার উচ্চ সরকারী পদ এবং ক্ষমতা তার প্রতি আকৃষ্ট করল রেনেটিকেও। উভয়েরই উভয়ের সঙ্গ ভাল লাগল। একজন ডিভিশনাল কমিশনারের এতনৈকট্য লাভ করে মিঃ গারদেজীও যেন খুব গৌরব বোধ করল সেদিন।

রাত্রে ডাইনিং হলে ডিনারের পর আলাপ চলছিল কর্ণেল ইউসুফ ও গারদেজী দম্পতির মধ্যে।

'তা হলে কালই চলে যাচ্ছেন আপনারা কোয়েটা ছেড়ে?' প্রশ্ন করল মিঃ ইউসুফ রেনেটিকে।

'হ্যাঁ, কাল সকালেই আমরা মারী যাচ্ছি। সেখানে বাচ্চাদের দেখে তারপর লাহোর রওনা হব।'

একটু ভেবে মিঃ ইউসুফ বলল, 'হ্যাঁ, আমাকেও ত মারীর দিকেই অনেকদূর যেতে হবে কালই। ঠিক আছে আপনারা বরং আমার সঙ্গেই চলুন। আমার গাড়িই আপনাদের মারী পৌঁছে দিয়ে আসবে। আমি পথে নেমে কাজ সেরে নেব।'

শুনে আনন্দে হাততালি দিয়ে উঠল রেনেটি। কৃতজ্ঞতা জানিয়ে সে বলল, 'তা হলে ত খুবই ভাল হয়। বাসের ঝড়ঝড়ানী থেকেও বাঁচা যাবে আর ভ্রমণটাও খুব আরামদায়ক হবে।' কর্ণেলের এই প্রস্তাব গ্রহণ করে রেনেটি ও গারদেজী দুজনেই তাকে ধন্যবাদ জানাল।

Marfat Academy

পরের দিন কর্ণেল ইউসুফ মিঃ গারদেজী ও রেনেটিকে নিয়ে তার গাড়িতে করে ছুটল কোয়েটা ছেড়ে মারীর দিকে। সুন্দর পীচ ঢালা নির্জন রাস্তা দিয়ে ছুটে চলতে চলতে সারাপথ কর্ণেল ইউসুফ তার পাশে বসা রেনেটির কাছে শুনল অনেক কথা।

মারীর কাছাকাছি এসে কর্ণেলের বিদায় নেবার সময়ে দেখা গেল তার ও রেনেটির উভয়েরই চোখের কোণায় অশ্রু বিন্দু। এরই মধ্যে মন দেয়া নেয়ার কাজে নিজেদের অজান্তে উভয়েই অনেক এগিয়ে গেছে। বিদায়ের পূর্বক্ষণে আন্তরিকতার সংগে কর্ণেল ইউসুফ ওদের আমন্ত্রণ করল আবার কোয়েটায় বেড়াতে আসার জন্যে। রেনেটি-নওয়াজও কর্ণেল ইউসুফকে লাহোরে এসে তাদের বাড়িতে আতিথ্য গ্রহণ করতে অনুরোধ করল। আনন্দের সাথেই কর্ণেল ইউসুফ তা গ্রহণ করল ও কথা দিল যে অতি শিগগিরই সে লাহোরে আসবে।

এর মাসখানেকের মধ্যেই কর্ণেল ইউসুফ দু-দুবার লাহোরে এসে গারদেজীর বাসায়ই অবস্থান করে। রেনেটিও তাকে পেয়ে অতিথিবৎসলতার পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে মিঃ ইউসুফকে মুগ্ধ করে।

এইসব সাক্ষাৎকার ও আলাপের মাধ্যমে কর্ণেল ইউসুফ ও মিসেস রেনেটির বন্ধুত্ব গাঢ় হয় ও ক্রমে তা গভীর প্রেমে পরিণত হয়। উভয়েই উভয়ের সঙ্গ কামনায় ব্যস্ত হয়ে পড়ে। এর পর থেকে তাদের মধ্যে ঘন ঘন প্রেম-পত্র আদান প্রদান শুরু হয়। ফোনেও কথাবার্তা চলতে থাকে তাদের মধ্যে প্রায়ই।

কর্ণেল ইউসুফ একবার লাহোরে এসে তার সাথে জিয়ারত বেড়াতে যাবার প্রস্তাব করল রেনেটি ও গারদেজীর নিকট। এই প্রস্তাবে দু'জনেই সানন্দে রাজি হল।

Mamun Academy

ইউসুফের গাড়িতে করে যথাসময় তারা লাহোর থেকে জিয়ারত পৌছাল। কোয়েটার ডি, আই, জি-ও সেদিন জিয়ারতের রেস্ট হাউজে উপস্থিত ছিল।

অভিজ্ঞ ডি, আই, জি মনে হয় রেনেটি ও কর্ণেলের হাবভাবে অচিরেই টের পেয়ে গেল তাদের উভয়ের প্রতি উভয়ের ভাবাবেগের বিষয়। সে আরও লক্ষ্য করল যে মিঃ নওয়াজ-এর উপস্থিতি যেন এদের মধ্যে কিছুটা বাধার সৃষ্টি করছে। ওদের নিভৃতে আলাপ করার সুযোগ দেয়ার উদ্দেশ্যে ডি, আই, জি, মিঃ নওয়াজকে "ভদকা" (রাশিয়ার এক প্রকার মদ) পান করাবার অজুহাতে তাকে একটু দূরে ডেকে নিয়ে যায় ও সেখানে তাকে নিয়ে পানাহারে ও গল্প-গুজবে মত্ত থাকে।

এদিকে কর্ণেল ইউসুফ ও রেনেটি নির্জন ঘরের এক কোণায় দুটো চেয়ার পেতে মধুর আলাপে নিমগ্ন হল। বুদ্ধি করে কর্ণেল পাশে রাখা রেকর্ড প্লেয়ারটিও সেই সময় চালিয়ে দিল জোরে, যাতে তাদের কথোপকথন আর কারও কানে না যায়। যদিও রেকর্ডের প্রতি তখন ওদের কারুরই মন ছিল না। কপোত-কপোতীর মত উভয়েই উভয়ের প্রেমে মশগুল—তাদের নিজেদের মনের গোপন কথা একে অপরকে ব্যক্ত করতে ব্যস্ত তখন। জিয়ারতের মনোরম আবহাওয়ায় আর সেই সঙ্গে মনের মত সাথী পেয়ে কি আনন্দেই যে সময়টা তাদের কাটছিল তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। উভয়েই স্বীকার করল যে এই সময়টুকু তাদের উভয়ের জীবনে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

তবে সেই সঙ্গে ওরা দু'জনে এ-ও বুঝল যে যদিও তাদের মধ্যে প্রকৃত প্রেম বেশ দানা বেঁধে উঠেছে, কিন্তু তারা উভয়েই বিবাহিত

Mamun Academy

এবং তাদের স্বামী, স্ত্রী, সন্তান বিদ্যমান, তাই এ ক্ষেত্রে তাদের আর বেশিদূর অগ্রসর হবার অবকাশ খুব অল্পই আছে। কিন্তু তাতে কি? তারা দুজনে বন্ধু হয়েই থাকবে, মিলন নাই বা হল।

জিয়ারতে দু'দিন কাটিয়ে আবার সবাই যে যার ঘরে ফিরে গেল। কেবল মনে রইল তাদের দুজনের সেই অমর স্মৃতি।

ঘরে ফিরেও কর্ণেল বা রেনেটি কারও মনেই শান্তি নেই। ক্ষণিকের জন্যও কেউ ভুলতে পারে না পরস্পরকে। দিন দিন যেন উভয়ে উভয়ের প্রতি আরও গভীরভাবে আকৃষ্ট হতে লাগল। চলতে লাগল উভয়ের মধ্যে ঘন ঘন চিঠি-পত্র আদান প্রদান ও প্রায় প্রতিদিনই ফোনে দীর্ঘ প্রেমালাপ এবং গুঞ্জন। কোর্টে এই মামলার বিচারের সময় টেলিফোন রেকর্ড থেকে দেখা যায় যে ২২শে আগস্ট থেকে ৪ঠা ডিসেম্বর পর্যন্ত এই ১০৪ দিনে মোট ১৯২ বার কর্ণেল ইউসুফ ট্রাঙ্ককল মারফত লাহোরে রেনেটির সঙ্গে কথা বলেছে। অনেকদিন একাধিক বারও তাদের মধ্যে আলাপ হয়। আবার কখনও কখনও ট্রাঙ্ককল দীর্ঘ নয় মিনিট কাল পর্যন্ত স্থায়ী হয়েছে।

নিরাপত্তার জন্যে অর্থাৎ নওয়াজ শারদেজীর কাছ থেকে এ সব গোপন রাখার জন্যে চিঠিতে রেনেটি ছদ্মনাম 'রউফ' ব্যবহার করতে শুরু করল। আর কর্ণেল রেনেটির বরাবর তার লেখা সব চিঠি-পত্র রেনেটির এক বন্ধুবীর ঠিকানায় পাঠাত। সেখান থেকেই রেনেটি গিয়ে রোজ সেসব চিঠি-পত্র নিয়ে আসত। আর কর্ণেল রেনেটির কাছে টেলিফোন কলও করত দুপুরের দিকে যখন তার স্বামী অফিসে বা অন্যত্র ব্যস্ত থাকত। মোটের উপর এরা দুজনে এত দূরে থেকেও তাদের গোপন প্রণয় নিয়মিতভাবে চালিয়ে যেতে লাগল টেলিফোন ও চিঠি-পত্রের মারফত—মিঃ নওয়াজের সম্পূর্ণ অগোচরে।

Mamun Academy

এত সতর্কতা সত্ত্বেও স্ত্রীর হাবভাব, চালচলন ও অন্যমনস্কতার ক্রমে নওয়াজের মন সন্দেহযুক্ত হয়ে উঠল। তার বাড়িতে ঘন ঘন মিঃ ইউসুফের টেলিফোন কল ও চিঠি পত্রের কথাও তার কানে এসে পৌঁছাতে লাগল। যদিও সে প্রথমে চিন্তাও করতে পারেনি যে তার স্ত্রী বিয়ের এতবছর পরে, তার তিনটি সন্তানের মা হয়েও নওয়াজের চেয়ে অধিক বয়স্ক কর্ণেল ইউসুফের সঙ্গে এমন নতুন করে প্রেমে পড়ে যেতে পারে, না তাকে বিয়ে করতে চাইতে পারে, বিশেষভাবে যখন কর্ণেল ইউসুফেরও স্ত্রী বর্তমান রয়েছে।

এখানে বলে রাখা দরকার যে সে সময়ে রেনেটির বয়স ছিল আটাশ, কর্ণেল ইউসুফের বয়স আটচল্লিশ আর আলী নওয়াজ পারদেশীর বয়স চৌত্রিশ।

কিন্তু হলে কি হবে? প্রেম যে কোন বাধা মানে না। স্রোতস্বিনীর মত নিজেই তার পথ তৈরি করে নেয়। আর বয়স সবসময় প্রেমের বিচিত্র গতিতে বাধা সৃষ্টি করে না।

১৯৬১ সালের নভেম্বর মাসের মাঝামাঝি একদিন হঠাৎ মিঃ পারদেশীর হাতে একটি চিঠি এসে পড়ল। আশ্চর্য হয়ে গেল সে চিঠিটি পড়ে। রেনেটি-ইউসুফের অশোভন প্রেম কি গতিতে কতদূর যে অগ্রসর হয়েছে তা সে সর্বপ্রথমে পরিষ্কার ভাবে টের পেল সেই চিঠি থেকে। পত্রটি লিখেছিল কর্ণেল ইউসুফ রেনেটির বরাবর। নিচে তার অনুবাদ দেয়া গেল:

কমিশনার বাংলো
কোয়েটা
৯ই নভেম্বর (১৯৬১)

"আমার একান্ত প্রিয়া,

মঙ্গলবার সকালে ও রাত্রে লেখা তোমার চিঠি আমাকে মোহিত

Mamun Academy

করেছে। কিন্তু বিকালে ও রাত্রে তার (কর্ণেলের স্ত্রী) সঙ্গে আমার যে কথাবার্তা হয়েছে তাতে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করেছি। তবে এতে শেষ পর্যন্ত আমি সফলকাম হয়েছি। আমি অবশেষে তাকে বোঝাতে সক্ষম হয়েছি যে তুমি ও আমি (রেনেটি ও ইউসুফ) সত্যিই একে অপরকে গভীরভাবে ভালবেসে ফেলেছি। এবং আমি এক্ষেত্রে যে কোন উপায়েই হোক তোমাকে অবশ্যই পেতে চাই, আর সেজন্য প্রয়োজন হলে তাকে ত্যাগ করতে বাধ্য হব। এরপর সে আমার কথায় কেবল যে রাজিই হয়েছে তাই নয় এমন কি সে আমাদের প্রতি তার দোয়াও জানিয়ে অনুরোধ করেছে যাতে এই কেলেঙ্কারী আর বেশিদূর না গড়ায়। আমাদের মিলনে সাহায্য করতেও সে অতঃপর প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। কাল সকালে আমি তোমাকে এ সম্বন্ধে আরও বিস্তারিত জানাতে পারব। সুতরাং আমার দিক থেকে ব্যাপারটির একটি সুরাহা হয়ে গেছে বলে মনে করি। এখন তোমার দিক থেকে এর ফয়সালা হয়ে গেলে আমি তোমাকে গ্রহণ করবার জন্যে প্রস্তুত হয়ে আছি। দেখা যাচ্ছে যে আত্মবিশ্বাসের জয় শেষ পর্যন্ত হবেই।

আমার ভালবাসা নেবে। তোমাকে পাবার ইচ্ছা আমার সীমাহীন। আমার প্রতিটি শ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে তোমার প্রতি আমার ভালবাসাও যেন প্রতিক্ষণে আরও বেড়ে যাচ্ছে। ক্রমেই মনে হচ্ছে —এরকম উৎকণ্ঠা বুঝি আমি আর সহ্য করতে পারছি না। কিন্তু আমাদের ধৈর্য হারালে চলবে না। সাবধানে কাজে এগোতে হবে। হ্যাঁ, এই সঙ্গে পাঠানো স্বীকারোক্তিটিতে তার (নওয়াজের) সই নিতে আর দেরি করো না কিন্তু, লক্ষ্মী।

শত কাজের মধ্যে থেকেও তোমাকে লেখবার জন্যে কয়েক মুহূর্ত

কেড়ে নিয়েছি। এখন আবার আমাকে কাজে নামতে হবে। আমি কিন্তু এখনও তোমার পরিচয় গোপন রেখেছি। এ কথাও লোককে জানতে দিইনি যে তোমাকে আমি টেলিফোন করি বা চিঠি লিখি।

বিদায় আমার প্রিয়া, আমি তোমাকে সত্যিই ভালবাসি, আর তাই একান্ত ভাবেই আমি তোমাকে চাই।

তোমারই ইউসুফ।"

রেনেটিও ইউসুফকে বহু চিঠি লেখে। নিচে তার একটির অনুবাদ দেয়া গেল :

সোমবার।

"আমার একান্ত প্রিয়,

ছেলের সঙ্গে দুই দিন মারীতে কাটিয়ে গত রাতে আমরা এখানে ফিরে এসেছি। তুমি কি জান যে এখন আমি সত্যিই বুঝতে পেরেছি যে 'ভাববার অবকাশ' বলতে কি বুঝায়। আমি তোমাকে আশ্বাস দিচ্ছি যে এ হেন অবকাশ আর আমি দ্বিতীয়টি চাই না।

আমরা ব্রাংল্যাণ্ডে ছিলাম, সিসিলির ঠিক বিপরীত দিকে, আর সেখান থেকে আমরা ঐতিহাসিক দর্শনীয় স্থানগুলোর দৃশ্য সুন্দর ভাবে দেখতে পেয়েছিলাম। বৃহস্পতিবার এয়ারপোর্টে তোমার বিদায়ের পর আমার খুব খারাপ লাগছিল আর নিজেকে খুবই নিঃসঙ্গ মনে হচ্ছিল।

এখানে ফিরে চাকরের কাছে জানলাম যে তুমি গত শনিবার এখানে এসেছিলে। শুনে মনে খুব-খুব আনন্দ পেলাম, আমি সত্যিই দুঃখিত হতাম যদি তুমি আগুপিছু না ভেবে ভাবাবেগের বশে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলে যদি তাই আঁকড়ে ধরে থাকতে। যাই হোক এখন আর সেকথা রাখার প্রয়োজন নেই। আমি 'ন' (নওয়াজ)কে

বলে দিয়েছে যে এখন আর আমার মন স্থির করার জন্যে তিন মাসের প্রয়োজন হবে না। বরং আমি ওকে এ-ও বলেছি যে তোমাকে আমি সত্যিই প্রাণ দিয়ে ভালবাসি এবং তোমাকে ছাড়া আমি বাঁচতে পারব না, যদিও ছেলেদের মুখ চেয়ে তাদের কারণে আমি আগামী মার্চ মাস পর্যন্ত ওর সঙ্গে থাকব কিন্তু এ-ও আমি জানিয়েছি যে এই সময়ের মধ্যে কেবল যে আমি তোমাকে পত্রই দিব তাই নয়, বরং তুমিও এসময়ে আমার কাছে চিঠি দিবে ও ফোন করবে। মনে হয় আমাকে চিঠি লেখার চাইতে তুমি আমাকে ফোন করাতেই তার বেশি আপত্তি।

এখন ও (নওয়াজ) একটি প্রস্তাব দিয়েছে। তার মতে একমাত্র এই পথই এখন খোলা আছে। আমিও এতে রাজি হতে পারি। কিন্তু তুমি কি এতে রাজি হবে ? আমার কিন্তু ভয় হয়।

যাক এখন আর এ সম্বন্ধে বিস্তারিত বলবার প্রয়োজন নেই। কেবল তোমাকে সাবধান করে দিতে চাই যে এখন তুমি আমার সঙ্গে বেশি জড়িয়ে পড়বে না। আর আমার কাছ থেকে না শুনে কোন প্রতিশ্রুতিও দেবে না —বিশেষ ভাবে পরবর্তী প্ল্যান না জানা পর্যন্ত।

অতিথিরা এখনই আসতে শুরু করবে। তাই বিদায় নিচ্ছি। তোমাকে এখন অনেক বেশি মানবধর্মী বলে মনে হচ্ছে, আমি কিন্তু তোমাকে প্রতিদিন আরও বেশি করে ভালবাসছি। আমি জানি যে তোমার সাথে আমার বিয়ের পথ কুসুমাস্তীর্ণ নয়, কিন্তু আমি ওই কুসুমাস্তীর্ণ পথ এখন ঘৃণা করি।

তোমারই একান্ত—'ম্ন'।"

রেনেটিকে লেখা কর্ণেল ইউসুফের আর একটি চিঠি য মিঃ গারনেজীর হাতে পড়েছিল তার অনুবাদ এরূপ।

Mamun Academy

৬ই নভেম্বর
(সকাল)

"আমার একান্ত প্রিয়া,

আজ সকালের আলাপে আমি অসীম আনন্দ লাভ করেছি। আমি এই সঙ্গে একটি ঘোষণা পত্রের খসড়া পাঠাচ্ছি, ছাপানো ফরম পাওয়া গেল না।

এই ঘোষণা ওকে (নওয়াজেস) নিজ হাতে লিখতে হবে ও সই করতে হবে। যদি এটা টাইপ করা হয় তবে দুজন বিশ্বাসী সাক্ষীকে সই করতে হবে। কিন্তু তা ঠিক হবে না। তাই আমার মতে সে এটা নিজ হাতে লিখে স্বাক্ষর করলেই ভাল হয়।

আমার রেনেট, প্রিয়া আমার। আর দেরি না করে এই কাজটি করে ফেলো। আর আমার নিজের ঘোষণা সম্বন্ধে জানাচ্ছি যে তা এরকম হবে ; তুমি যখনই চাইবে তখনই আমি তা নিজে লিখে ও স্বাক্ষর করে পাঠাব।

'আমি সম্পূর্ণ সজ্ঞানে ও বিশদভাবে চিন্তা করার পর স্বেচ্ছায় এই ঘোষণা করছি যে আমি আমার স্ত্রী·····পিতা·····কে তালাক দেব। যদি আমার সঙ্গে তার বিয়ের এক বৎসর পরে সে আমাকে ছেড়ে যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করে সেক্ষেত্রে আমি তাকে মুক্তি দেব এবং অতঃপর সে যাকে খুশি বিয়ে করতে পারবে। এরপর সেই স্ত্রী বা পুরুষের বিরুদ্ধে আমার কোন কিছু বলবার অধিকার থাকবে না বা আমি কোন মামলা করতে পারব না।

স্বাক্ষর·····'

এখন বিদায় আমার প্রিয়া। আজ রাতের চিঠিতে তোমাকে আরও জানাব। এ চিঠি আমি এখনই ডাকে ফেলব—কারণ আজকের

Mamun Academy

ডাকই ধরাতে চাই যে।

হে আমার প্রিয়া—তোমাকে দিচ্ছি আমার সবটুকু প্রেম।

তোমারই ইউসুফ।"

১৯৬১ সালের নভেম্বর মাসের শেষের দিকে মিঃ নওয়াজ রাওয়ালপিণ্ডি ও পেশোয়ারে ট্যুরে যায়। ২৯শে নভেম্বর বিকালে ফিরে আসে লাহোরে।

বাড়িতে পৌঁছে সে বিস্মিত হয়ে দেখতে পায় যে তার ঘর শূন্য। তার স্ত্রী তাকে না জানিয়েই এর মধ্যে চলে গেছে কোয়েটাতে। এই দেখে লজ্জায়, দুশ্চিন্তায় ও রাগে নওয়াজ অস্থির হয়ে পড়ল। তৎক্ষণাৎ সে কোয়েটায় কর্ণেল ইউসুফের নিকট ফোন বুক করল। ফোনে সে জানতে পারল যে রেনেটিকে সঙ্গে নিয়ে কর্ণেল লোরালাই চলে গেছে।

গারদেজী তখনই লোরালাই এ আবার ফোন বুক করল। সেখানে তার স্ত্রী রেনেটির সঙ্গে যোগাযোগ করতে সক্ষম হল। ফোনেই সে স্ত্রীকে মৃদু ভর্ৎসনা করে শিগগির লাহোরে ফিরে আসতে অনুরোধ করল।

১লা ডিসেম্বর তারিখে নওয়াজ কর্ণেলের কাছ থেকে এক টেলিগ্রাম পেল। তাতে জানান হল যে রেনেটিকে 'বোলান মেল' ট্রেনে তুলে দেয়া হয়েছে। সে ২রা ডিসেম্বর ট্রেনে লাহোর স্টেশনে পৌঁছবে।

এরপর রেনেটি লাহোর পৌঁছলে স্বামী নওয়াজ তাকে খুব ভর্ৎসনা করে ওভাবে তার অনুপস্থিতিতে বাড়ি ছেড়ে কর্ণেলের কাছে চলে যাবার কারণে। এ সময় তাদের মধ্যে বেশ কথা কাটাকাটি হয় ও এক সময় নওয়াজ রাগ করে রেনেটিকে প্রহারও করে বসে।

Mamun Academy

লরেন্স কলেজে পাঠরত তাদের দুই ছেলে শীতকালীন বন্ধে সেই ডিসেম্বরে তাদের বাপ-মার কাছে লাহোরে চলে এল। সেখানে ছুটি কাটাবে।

১৪ই ডিসেম্বর তারিখে নওয়াজ তার স্ত্রী রেনেটির জন্মদিবস পালন উপলক্ষে এক জাঁক-জমকপূর্ণ পার্টির আয়োজন করল। সে আশা করেছিল যে এরপর বোধ হয় তার স্ত্রী রেনেটি নিজের ভুল বুঝতে পারবে ও অতঃপর নতুন প্রেমিককে ভুলে যাবে—অন্তত তার ছেলেমেয়েদের মুখের দিকে তাকিয়ে।

প্রধানত রেনেটিকে সুখী করার উদ্দেশ্যেই নওয়াজ ২৩শে ডিসেম্বর লাহোরে তার বাড়িতে একটি ক্রিস্টমাস পার্টি দিল। আর তাতে নিমন্ত্রণ করল তার অফিসের কর্মচারীদের। এই পার্টিতে রেনেটিই হোস্টেস-এর দায়িত্ব পালন করল।

এই সবের ভিতর দিয়ে নওয়াজ ভাবল যে খনিকের মোহে বিপথগামী রেনেটি বোধহয় এরপর ভুলে যাবে তার জীবনের কলঙ্কময় অধ্যায়টুকু।

কিন্তু সব আশার ছাই দিয়ে ২১শে ডিসেম্বর ডিনারের পরেই রেনেটি তার হাতব্যাগ থেকে দুটি কাগজ বের করে নওয়াজের সামনে রেখে বলল যে ওতে তাকে সই করতে হবে। সে এ ব্যাপারে তাকে চাপ দিতে লাগল। নওয়াজ কাগজটি পড়ল,—তাতে লেখা ছিল—

"আমি সম্পূর্ণ সজ্ঞানে এবং বিষয়টি ভালভাবে বিবেচনা করে আমি···পিতা···আমার স্ত্রী···পিতা··· ···কে এতদ্বারা স্বেচ্ছায় তালাক দিলাম ও তাকে মুক্তি দিলাম। অতঃপর সে যাকে ইচ্ছা বিয়ে করতে পারে এবং তাতে আমার কোনও আপত্তি থাকবে না বা তাদের বিরুদ্ধে আমি কোন কোর্টেও নালিশ করব না।"

এই কাগজ পড়ে ত নওয়াজের চক্ষু চড়কগাছ! তাহলে তার স্ত্রীর মনোভাব এখনও এতটুকু বদলায়নি! সে সেই কাগজ সই করার প্রস্তাব ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করল।

পরদিন ২০শে ডিসেম্বর অফিস থেকে ফিরে এসে নওয়াজ আশ্চর্য হয়ে দেখল যে তার বাড়ি শূন্য। সেদিনই দুপুরে তার স্ত্রী তার নিজস্ব জিনিসপত্র নিয়ে কোথায় চলে গেছে।

খবর নিয়ে নওয়াজ জানল যে কর্ণেল ইউসুফ তখন লাহোরে তার বন্ধু লেঃ জেনারেল বখতিয়ার রানা সাহেবের বাড়িতে অবস্থান করছে। জেনারেল বখতিয়ার রানা তখন ছিলেন পশ্চিম পাকিস্তানের মার্শাল ল্যা এডমিনিস্ট্রেটর। নওয়াজ আরও জানতে পারল যে কর্ণেল ইউসুফ ৩রা ডিসেম্বর সন্ধ্যার মেল ট্রেনে লাহোর থেকে কোয়েটা পর্যন্ত একটি প্রথম শ্রেণীর এয়ার কণ্ডিশনড্ ডাবল বেড কামরা রিজার্ভ করে রাখেছে।

নওয়াজ ধারণা করল যে এহেন অবস্থায় তার স্ত্রীকে অবশ্যই কর্ণেল ইউসুফের কাছেই পাওয়া যাবে। তাই সে অবিলম্বে সোজা জেনারেল বখতিয়ারের বাড়িতে গিয়ে হাজির হল রেনেটির খোঁজে।

দেখল তার ধারণা সত্যি। জেনারেলের বাসার একটি কামরায় কর্ণেল ইউসুফ ও রেনেটি তখন অবস্থান করছিল।

প্রথমে নওয়াজকে ওখানে দেখে কর্ণেল খেপে গেল ও তার সঙ্গে ভয়ানক অসদ্ব্যবহার করল। তখনই তাকে সেই বাড়ি ত্যাগ করতে বলল। নওয়াজও মরিয়া হয়ে দৃঢ় কণ্ঠে জানাল, 'আমার স্ত্রীর খোঁজেই এখানে আসতে আমি বাধ্য হয়েছি। আপনিই তাকে অন্যায়ভাবে ফুসলিয়ে নিয়ে এসেছেন। আর সে এখানে না থাকলে নিশ্চয়ই আপনার বিশ্রামে ব্যাঘাত ঘটাতে আজ আমি এখানে আস-

Mamun Academy

তাম না।'

'আপনার স্ত্রী যদি স্বেচ্ছায় কোথাও যায় তবে আমার তাতে কি করার আছে?' উত্তর দিল কর্ণেল রেগে।

'দেখুন আমাকে কচি খোকা মনে করবেন না। আমারই বিবাহিত স্ত্রীকে আটকে রেখে আপনি তার স্বামীর উপর চোখ রাঙাচ্ছেন। কিন্তু তাতে আমি ভয় পাব না, স্ত্রীকে পেলেই আর একমুহূর্ত দেরি না করে এখান থেকে চলে যাব। তবে এটা মনে রাখবেন, যে-ব্যক্তি আমার সাজানো সুখের সংসার ভাঙছে, সে যেই হোক না কেন তাকে আমি সহজে ছেড়ে দেব না। দেশে এখনও আইন আদালত আছে।'

এবার কর্ণেল একটু নরম হল। নওয়াজের কঠিন মনোভাব দেখে সে-ও একটু ঘাবড়ে গেল। শান্ত কণ্ঠেই বলল, 'দেখুন, এ ব্যাপারে আমার কি দোষ? আপনার স্ত্রী ত কচি মেয়ে নয়। সে যদি স্বেচ্ছায় আমার কাছে এসে হাজির হয় তবে আমি কি করতে পারি?'

'কিন্তু আপনার উস্কানীতেই সে এই ব্যবহার করছে। আপনিই ত তাকে বিপথগামী করছেন।'

'মানুষের মন কি কেউ আটকে রাখতে পারে? রেনেটি একজন শিক্ষিতা, বুদ্ধিমতী, বিদেশী মহিলা। আপনি পারেন ত তাকে বুঝিয়ে নিয়ে যান, আমার কোন আপত্তি নেই।'

'দেখুন রেনেটি আমার স্ত্রী, আমারই অধিকার আছে তার উপরে। আপনি তাকে আপনার ঘর থেকে এখন বের করে নিয়ে আসুন, তারপর আমিই বোঝাপড়া করব তার সঙ্গে।'

এবার কর্ণেল নওয়াজের হাত ধরে বারান্দার একটি চেয়ারে তাকে বসিয়ে শান্ত কণ্ঠে বলল:

'দেখুন, সত্যি বলতে কি, রেনেটির মনের অবস্থা আমার জানা

আছে। সে এখন আমাকে বিয়ে করার জন্যে পাগল হয়ে গেছে। এটা দুঃখজনক হলেও এই পৃথিবীতে এরকম অঘটন অহরহই ঘটছে আর প্রয়োজনবোধে তা সহ্যও করতে হয়। তাই আমি আপনাকে অনুরোধ করছি যে কেলেঙ্কারী আর না বাড়িয়ে বরং আপনি এখন রেনেটিকে মুক্তি দিয়ে দিন।'

'আর সেই সুযোগে আপনি নিশ্চিন্তে তাকে নিয়ে ফূর্তি করুন। ধিক আপনার প্রস্তাবে। আপনার হীনমনোভাবের পরিচয় পেয়ে সত্যিই আমি আশ্চর্য হয়েছি।' রেগে গিয়ে উত্তর দেয় নওয়াজ।

আবার শান্ত ভাবে বলল কর্ণেল, 'মিঃ নওয়াজ, আমিও যে অজান্তে এই সমস্যার সঙ্গে জড়িয়ে পড়িনি তা নয়। তবে আমি চাইছিলাম কি এই মানবিক সমস্যার একটা সুষ্ঠু সমাধান করতে। রেনেটির মন যদি না চায় তবে আপনিও কি তাকে নিয়ে আর সুখী হবেন?'

'এর জন্য আপনিই দায়ী। আপনিই তাকে বিপথগামী করেছেন। মনে রাখবেন এই সঙ্গে কেবল আমার নিজের নয় আমার ভবিষ্যৎ বংশধর সন্তানদের ও সমগ্র গারদেজী পরিবারের মর্যাদা ও সুনামের প্রশ্ন জড়িত। আমার স্থির বিশ্বাস যে আপনার রাহু মুক্ত হলে রেনেটি আবার ঠিক হয়ে যাবে। তাকে আমি দীর্ঘ দশ বৎসর ধরে চিনি। আর আপনি ত তার মাত্র কয়েক মাসের তথাকথিত বন্ধু। দয়া করে তাকে আসতে দিন আমার সামনে।'

'বেশ আমি এনে দিচ্ছি তাকে আপনার সামনে—আপনিই বুঝান।'

এই বলে কর্ণেল গট্ গট্ করে তার রুমের ভিতরে চলে গেল। সেখানে মিনিট দশেক তাদের মধ্যে কি কথা হল নওয়াজ জানে না।

Mamun Academy

তারপর রেনেটিকে নিয়ে কর্ণেল বেরিয়ে এল।

পাশের একটি ঘরে গিয়ে তারা বসল। সেখানে গারদেজী অনেক বুঝাল রেনেটিকে। বলল তার এই অবৈধ প্রণয়ের ফলে কিভাবে তাদের এতদিনের সুখের সংসার পুড়ে ছারখার হতে চলেছে। আর এখন কেবল তাদের দু'জনের জীবনই এর সঙ্গে জড়িত নয়—তাদের প্রিয় তিনটি সন্তানের সমগ্র ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে বাপ- মায়ের উপরে। এখন এই অবস্থায় কেলেঙ্কারী আরও গড়ালে কিভাবে তাদের সন্তানেরা মুখ দেখাবে সমাজে? পৃথিবীতে উন্নত শির নিয়ে চলবার অধিকার আর তাদের থাকবে না। রেনেটির হাত ধরে নওয়াজ বলল, 'চল, রেনেটি, ঘরে ফিরে চল। আমি তোমার ওপরে একটুও রাগ করব না। মনে করব একটা দুঃস্বপ্ন দেখছিলাম মাত্র।'

কিন্তু রেনেটি অনড়। সে কেবল মুখে রুমাল দিয়ে নীরবে কাঁদতে লাগল।

'চল রেনেটি, মনে রেখো তোমার হ্যাঁ বা না-এর ওপরে নির্ভর করছে আমাদের ছেলেদের ভবিষ্যৎ। তাদের মুখ চেয়েই চল ঘরে ফিরে যাই।' মিনতি জানাল গারদেজী তার কাঁধে হাত দিয়ে।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত কিছুতেই কিছু হল না। নতুন প্রেমে যে একবার মজেছে সেই মরেছে। সহজে কি আর সে ওই পথ ছেড়ে আসতে পারে?

অবশেষে ব্যর্থ হয়ে ভাঙা মন নিয়ে নওয়াজ ফিরে এল সেখান থেকে নিজ বাড়িতে একাকী।

এদিকে ৩১শে ডিসেম্বর রাত্রেই কর্ণেলের রিজার্ভ করা এয়ার

Mamun Academy

কণ্ডিশান্ড রেলের সেই কামরায় রওনা হল কর্ণেল ও রেনেটি লাহোর থেকে কোয়েটার দীর্ঘ পথে। সেই সঙ্গে লাহোরে চিরতরে ফেলে রেখে গেল রেনেটি তার দীর্ঘ দশ বৎসরের সুখের সংসার—তার স্বামী ও সুন্দর নিষ্পাপ তিন ছেলেমেয়ে। সবাইকে অশ্রুজলে ভাসিয়ে।

১৯৬২ সালের ২রা জানুয়ারী কোয়েটাতে কর্ণেল ইউসুফ ও রেনেটির মুসলিম আইন মতে এক বিয়ের অনুষ্ঠান হয়। বিয়ের আগে রেনেটি তার খ্রীস্টান ধর্ম ত্যাগ করে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করল। তার মুসলিম নাম হল রোকেয়া।

এই দুঃসংবাদও পৌঁছল নওয়াজের কাছে লাহোরে। হতভাগ্য নওয়াজ আর কোন উপায় না দেখে স্থির করল, অন্যায় সে সইবে না। যে ব্যক্তি তার সুখের সংসার এভাবে পুড়িয়ে ছারখার করে দিচ্ছে তাকে সে সহজে ছেড়ে দেবে না—তা সে যতই ক্ষমতাবান হোক না কেন। তাই শেষ পর্যন্ত ঠিক করল যে কর্ণেলের বিরুদ্ধে সে আইনের আশ্রয় নেবে ও শেষপর্যন্ত লড়বে।

৫ই জানুয়ারী তারিখে নওয়াজ কর্ণেল ইউসুফের বিরুদ্ধে পাকিস্তান দণ্ড বিধির ৪৯৭ ও ৪৯৮ ধারা মতে লাহোরে এক ফৌজদারী মামলা দায়ের করল। উক্ত মামলায় এই অভিযোগ করা হল যে কর্ণেল ইচ্ছাকৃতভাবে নওয়াজের বিবাহিতা স্ত্রী রেনেটির সঙ্গে অবৈধ যৌন সম্পর্ক স্থাপন করেছে (Adultery)। আর একটি অভিযোগ করা হল যে রেনেটিকে নওয়াজের বৈধ স্ত্রী জেনেও কর্ণেল ইউসুফ তাকে ফুসলিয়ে বের করে নিয়ে গিয়েছে, তার সঙ্গে অবৈধ সংসর্গের কু-উদ্দেশ্যে।

পরদিন ৬ই সেপ্টেম্বর নওয়াজ খবরের কাগজে প্রকাশিত একটি সংক্ষিপ্ত প্রেস রিপোর্ট মারফত জানতে পারল যে এরই মধ্যে কর্ণেল

ইউসুফ ও রেনেটির বিয়ে হয়ে গেছে। এই খবর পেয়ে নওয়াজ পাকিস্তান দণ্ডবিধির ৪৯৪ ধারা মতে কর্ণেলের বিরুদ্ধে আরও একটি মামলা দায়ের করাল; এটিতে অভিযোগ করা হল যে রেনেটি তখনও নওয়াজের বিবাহিতা স্ত্রী এবং তাদের বৈবাহিক সম্পর্ক অক্ষুণ্ণ থাকা সত্ত্বেও ইউসুফ পুনরায় তাকে অবৈধ ভাবে বিয়ে করে আইনতঃ দণ্ডনীয় অপরাধ করেছে।

লাহোর হাই কোর্টের আদেশে অবশ্য প্রথম মামলার বিচার সাপেক্ষে দ্বিতীয় মামলা মুলতবি রাখা হল।

প্রথমে এই মামলার শুনানী লাহোরের এ.ডি.এম(A D.M)এর কোর্টে শুরু হয়। কিন্তু সেই কোর্টে আসামীর উপর মামলার সমন জারীতে অহেতুক বিলম্ব হতে থাকায় মিঃ নওয়াজ হাই কোর্টে এক আবেদন করে বলে যে যেহেতু অসামী কর্ণেল ইউসুফ একজন উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী এবং বিভাগীয় কমিশনার, আর যেহেতু এ, ডি, এম, আসামীর একজন অধীনস্থ কর্মচারী, তাই উক্ত কোর্টে এই প্রভাবশালী আসামীর সুবিচারে বিঘ্ন ঘটাতে পারে। সেকারণে এই মামলার বিচার সরাসরি হাইকোর্টের মাননীয় কোন বিচারপতির এজলাসে হওয়াই যুক্তিযুক্ত।

পশ্চিম পাকিস্তান হাইকোর্ট উভয় পক্ষের শুনানীর পর বাদীর আবেদন যুক্তিপূর্ণ বিবেচনা করে তা মঞ্জুর করেন। এরপর লাহোর হাইকোর্টের সিনিয়র বিচারপতি মাননীয় জাস্টিস সাব্বির আহমেদের এজলাসে এই চাঞ্চল্যকর মামলার শুনানী শুরু হয়।

এই কেসের শুরুতেই আর এক অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটে। এই সময়ে বিচারপতি সাব্বির আহমেদ পরপর কয়েকটি বেনামী চিঠি পান। তাতে বিচারপতিকে ভীতি প্রদর্শন করে তাঁকে সাবধান

Mamun Academy

করে দেয়া হয় যে এই মামলার বিচারে যদি এক বিশেষ পক্ষের অনুকূলে তিনি রায় দিতে ব্যর্থ হন তবে শুধু যে বিচারপতিকেই হত্যা করা হবে তাই না, বরং তাঁর পরবর্তী বংশধরদের সমূলে বিনাশ করা হবে। আর যারা এই চিঠি দিচ্ছে তারা এমন এক এলাকার লোক যারা এসব কাজ করতে কোন দ্বিধা বোধ করে না।

যাই হোক বিচারপতি স্বভাবতঃই এ সব হুমকিতে কর্ণপাত না করে নির্ভীকভাবে তাঁর উপরে আরোপিত বিচারের মহান কাজ সমাধা করে যান।

পরপর নয় দিন ধরে এই মামলার শুনানী চলে। সে সময়েই প্রথমে উল্লেখিত চিঠিপত্রগুলো আদালতে পেশ করা হয়। ক্রিস্টা রেনেটি সহ এতে মোট ৭ জন সাক্ষীর জবানবন্দী উন্মুক্ত আদালতে গ্রহণ করা হয়।

জবাবে আসামী কর্ণেল ইউসুফ নিজেকে নির্দোষ বলে দাবি করে। তার পক্ষ থেকে বলা হয় যে বাদী নওয়াজ স্বেচ্ছায় তার স্ত্রী রেনেটিকে লিখিত ভাবে তালাক দিয়ে দিয়েছে। আর সেই তালাকনামা দেখবার পরেই সে রেনেটিকে মুসলিম আইন অনুযায়ী বিয়ে করেছে। কর্ণেলের তরফ থেকে ওই কথিত তালাকনামা কোর্টে দাখিল করা হয় ও বলা হয় যে, রেনেটি ১৯শে সেপ্টেম্বর তার ছেলেদের দেখে মারী থেকে ফিরে এসে তার স্বামীকে জানায় যে সে কর্ণেলকে গভীরভাবে ভালবেসে ফেলেছে ও তাকে বিয়ে করতে চায়। এখন সে স্বামীর কাছ থেকে তালাক পেলেই কর্ণেল তাকে বিয়ে করতে রাজি আছে। তাই সে স্বামীর কাছে তালাক দাবি করে।

এরপর নওয়াজ ও তার স্ত্রী নিজেদের মধ্যে এই নিয়ে আলাপ-

Mamun Academy

আলোচনা করে। অতঃপর তারা এ ব্যাপারে কর্ণেলের সঠিক মনোভাব জানাবার জন্যে তাকে গোয়েটা থেকে লাহোরে আসতে অনুরোধ করে। সেই অনুসারে কর্ণেল ২৫শে অক্টোবর লাহোর পৌঁছে। সেই দিনই তাদের মধ্যে আলোচনার পর স্থির হয় যে নওয়াজ তার স্ত্রীকে তালাক দিতে রাজি আছে এই শর্তে যে, পরবর্তী তিন মাস যাতে কর্ণেল ও রেনেটির মধ্যে কোন প্রকার দেখা-শোনা, আদান প্রদান ও কথাবার্তা হতে পারবে না। তবে এভাবে তিন মাস থাকার পরও যদি দেখা যায় যে রেনেটি তার মত পরিবর্তন করেনি এবং ইউসুফের প্রতি তার আকর্ষণ আগের মতই অক্ষুণ্ণ আছে, তবে নওয়াজ স্বেচ্ছায় তার স্ত্রীকে তালাক দেবে যাতে সে কর্ণেলকে বিয়ে করে সুখী হতে পারে।

এর পর দিনই রেনেটি নওয়াজের অজ্ঞাতে ইউসুফের হাতে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। এই ধর্মান্তরের কথা নওয়াজ তখন কিছুই জানতে পারেনি। অক্টোবরের শেষে রেনেটি আবার মারী যায় বাচ্চাদের দেখতে। সেখান থেকে ফিরে এসে রেনেটি কর্ণেলের সাথে তিন মাস যোগাযোগ না রাখার পূর্বের সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে। আর সেই সঙ্গে সে তার স্বামী নওয়াজকে পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দেয় যে তার (রেনেটির) মন স্থির করার জন্যে আর তিন মাস সময়ের প্রয়োজন নেই। ইউসুফ ছাড়া তার পক্ষে বাঁচা সম্ভব নয় এটা সে এরই মধ্যে বুঝতে পেরেছে ও সে এখনই তার সঙ্গে যোগাযোগ করতে চায়।

অতঃপর রেনেটি ইউসুফকে তার এই নতুন সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে তার সঙ্গে পুনরায় পত্রালাপ ও ফোনে যোগাযোগ শুরু করে। (এই সময়ে লেখা একটি চিঠির অনুবাদ আগেই দেয়া হয়েছে) এর

Mamun Academy

পর ৫ই নভেম্বর তারিখে এই সব ব্যাপার নিয়ে নওয়াজ ও রেনেটির মধ্যে এক প্রচণ্ড বাক-বিতণ্ডা শুরু হয়। তখন রেনেটি তার স্বামীকে জানায় যে যদি শিগগির তাকে তালাক না দেয়া হয় তবে সে এ বাড়ি ছেড়ে অন্যত্র চলে যাবে। রেগে গিয়ে তখন নওয়াজ রেনেটিকে প্রহার করে। মার খেয়ে রেনেটি জানায় যে সে তখনই ডাক্তারের সার্টিফিকেট নিয়ে নওয়াজের বিরুদ্ধে কোর্টে কেস করবে ও তাকে মারধোরের অভিযোগে কোর্ট থেকে তালাক নেবে। এই কথার পরে নওয়াজের দৃঢ়তা ভেঙে পড়ে ও সে রেনেটিকে তখনই তালাক দিতে রাজি হয়।

খুশি হয়ে রেনেটি পরদিন অর্থাৎ ৬ই নভেম্বর টেলিগ্রাম করে ইউসুফকে সেই খবর জানায় ও তাকে অবিলম্বে তালাকনামার খসড়া পাঠাতে অনুরোধ করে।

এরপর ১৩ই নভেম্বর নওয়াজ নিজ হাতে সেই তালাকনামা লিখে সই করে তা রেনেটিকে দেয়। তবে এ সত্ত্বেও তারা স্থির করে যে, যেহেতু তাদের ছেলেরা মার্চ মাসের শেষ পর্যন্ত দীর্ঘ স্কুল অবকাশ পিতামাতার সঙ্গেই লাহোরে কাটাবে, তাই তাদের কাছ থেকে এই দুঃসংবাদ আপাততঃ গোপন রাখা দরকার। আর সেই কারণেই রেনেটি নওয়াজের বাড়িতেই থেকে যাবে মার্চের শেষ পর্যন্ত। কিন্তু ডিসেম্বরের শেষ নাগাদ রেনেটি জানতে পারে যে নওয়াজ তার ডাক্তার ভাইয়ের সাহায্যে মর্দানের একটি মেয়ের সঙ্গে তার বিয়ে ঠিক করে ফেলেছে। আর ওই বিয়েকরার পরেই নওয়াজ জোর করে রেনেটিকে দেশের বাইরে তাড়িয়ে দেবে। সেই অসহায় অবস্থার কথা চিন্তা করে ও তা থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্যে রেনেটি ৩০শে ডিসেম্বর নওয়াজের বাড়ি ছেড়ে স্বেচ্ছায় কর্ণেল ইউসুফের কাছে

Mamun Academy

এসে আশ্রয় নেয়। সেই সময়ে কর্ণেল কার্যোপলক্ষে লাহোরে এসে জেনারেল খানার বাংলোতে অবস্থান করছিল। এর পরদিই রেনেটির ইচ্ছা অনুযায়ী কর্ণেল তাকে নিয়ে কোয়েটা চলে যায়। ২রা জানুয়ারী তারিখে কোয়েটাতে এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানে কর্ণেল রেনেটিকে বিয়ে করে।

এর আগে নভেম্বর মাসে যখন রেনেটি একবার কোয়েটাতে কর্ণেলের বাসায় যায় তখনও সে নওয়াজের সম্মতি নিয়েই সেখানে গিয়েছিল। সে যাত্রায় রেনেটির উদ্দেশ্য ছিল বিয়ের আগেই নিজে কর্ণেলের প্রথমা স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ করে কর্ণেলের দ্বিতীয় বিয়ে সম্বন্ধে তার সঠিক মনোভাব জেনে নেয়া।

বাদী আলী নওয়াজ গারদেজী কিন্তু আসামী পক্ষের উপরোক্ত জবাবের কাহিনী মিথ্যা বলে দৃঢ়ভাবে অস্বীকার করল। সে তার তথাকথিত তালাকনামাই সম্পূর্ণ জাল ও বানোয়াট বলে অভিহিত করল। নওয়াজ কোর্টকে জানায় যে সে কখনই ওরকম তালাকনামা লেখেনি বা তাতে সহি-স্বাক্ষর করেনি। ২০শে ডিসেম্বরের কথিত চুক্তি ও তার পরদিনই রেনেটির মুসলমান হওয়া ইত্যাদি সবই সে অস্বীকার করল। তার পক্ষ থেকে আইনগত প্রশ্ন তুলে এ-ও বলা হল যে যেহেতু রেনেটি খ্রীস্টান ধর্মাবলম্বী ও নওয়াজ একজন শিয়া মুসলমান, আর যেহেতু ইংলণ্ডে বসে রিজিস্ট্রি করে তাদের বিয়ে হয়, সে কারণে মুসলমান 'সরা' অনুযায়ী তাদের ওই তালাকও বৈধ হতে পারে না। আর তাছাড়া মুসলমান পারিবারিক আইনের বিধান (Muslim Family Laws Ordinance) অনুযায়ী এ রকম হঠাৎ তালাক অবৈধ বলে গণ্য হবে। কারণ উক্ত আইন অনুযায়ী তালাকের পূর্বে অপর পক্ষকেও ইউনিয়ন কাউন্সিলের তিন মাসের নোটিশ প্রদান

করার প্রয়োজন আছে। আবার সেই সঙ্গে দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণ করার পূর্বে কর্ণেলের প্রথমা স্ত্রীর কাছ থেকে লিখিত স্বীকৃতি গ্রহণ ও রেনেটির কথিত তালাকের পরে ইদ্দতকাল পার হবার প্রশ্নও রয়েছে। এগুলোর অভাবে কর্ণেলের সঙ্গে রেনেটির তথাকথিত বিয়ে কখনও বৈধ হতে পারে না।

নওয়াজের দেয়া কথিত তালাকনামা খাঁটি অথবা জাল এ নিয়ে কোর্টে উভয় পক্ষের মধ্যে প্রচুর বাক-বিতণ্ডা শুরু হয়। উক্ত তালাকনামাটি কোর্টের আদেশে পর পর দুজন হস্তাক্ষর বিশেষজ্ঞ (Hand Writing expert)দ্বারা পরীক্ষা করানো হয়। তারা উভয়েই মত প্রকাশ করেন যে তালাকনামা নওয়াজেরই নিজের হাতের লেখা। রেনেটিও এ সম্বন্ধে কোর্টে সাক্ষ্য দিয়ে বলে যে তালাকনামা নওয়াজ তার সামনেই লিখে দিয়েছিল। তবে এটির লেখা নওয়াজের স্বাভাবিক হাতের লেখার চাইতে আলাদা হওয়াতে রেনেটি তখন নওয়াজকে সে সম্বন্ধে প্রশ্ন করেছিল। উত্তরে নওয়াজ রেনেটিকে বলেছিল যে তার যদি সত্যিই তাকে তালাক দেয়ার ইচ্ছা না থাকত তবে সে রেনেটিকে ওই তালাকনামা লিখে দিতেই বা যাবে কেন?

কিন্তু বাদীপক্ষ কোর্টকে দৃঢ়ভাবে জানায় যে সেই তালাকনামা সম্পূর্ণ জাল দলিল। নওয়াজের অফিসের একজন লোক যে নওয়াজের হাতের লেখার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত ছিল সে সাক্ষ্য দিয়ে বলল যে ওটা নওয়াজের হাতের লেখা নয়।

এই সব সাক্ষ্য প্রমাণ বিবেচনা করে ও নওয়াজের স্বাভাবিক হাতের লেখার সঙ্গে তালাকনামার হস্তাক্ষর মিলিয়ে দেখে বিচারক জাস্টিস সাব্বির আহমেদ শেষ পর্যন্ত এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেন যে তালাকনামাটি সম্পূর্ণ জাল ও বাদী নওয়াজ তা লেখেনি বা তাতে

স্বাক্ষর করেনি।

বিচার শেষে মাননীয় বিচারপতি তাঁর সুদীর্ঘ রায়ে বিভাগীয় কমিশনার কর্ণেল মোহাম্মদ ইউসুফকে পাকিস্তান দণ্ডবিধির ৪৯৭ ধারা (পর স্ত্রীর সঙ্গে সহবাস)ও ৪৯৮ ধারা (পর স্ত্রীকে ফুসলিয়ে বের করে নেওয়া) মতে দোষী সাব্যস্ত করেন ও তাকে প্রথমোক্ত অপরাধে ১২,০০০ টাকা জরিমানা এবং দ্বিতীয় অপরাধে ৭,৫০০ টাকা জরিমানা করেন ; অনাদায়ে যথাক্রমে এক বৎসর ও ছয়মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেন। আসামী একজন উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী ও আইনের রক্ষক হয়ে নিজে এ হেন গর্হিত অপরাধে অপরাধী হওয়ায় বিচারক তার বিরুদ্ধে কঠোর ও বিরূপ মন্তব্যও করেন।

কর্ণেল ইউসুফ উপরোক্ত দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে পশ্চিম পাকিস্তান হাইকোর্টের ফুল বেঞ্চে আপীল দায়ের করেন। হাইকোর্টের অপর তিনজন বিচারপতিকে নিয়ে সেই ফুল বেঞ্চ গঠিত হয়।

ফুল বেঞ্চ কিন্তু সেই আপীলের শুনানীর পরে জাস্টিস সাব্বিরের রায়ের সঙ্গে একমত হতে পারেননি। তাঁরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেন যে নওয়াজ স্বেচ্ছায় তার স্ত্রীকে তালাক দিয়েছে ও পরে কর্ণেল রেনেটিকে বৈধ উপায়ে বিয়ে করেছে। তাঁরা তালাকনামাটিও যথার্থ ও বৈধ বলে মত প্রকাশ করেন। অতঃপর ফুল বেঞ্চ জাস্টিস সাব্বির আহমেদের রায় রদ ও রহিত করে কর্ণেল ইউসুফকে বেকসুর খালাস দেন।

বাদী নওয়াজ কিন্তু এ রায় মেনে নিল না। সে অতঃপর ফুল বেঞ্চের এই রায়ের বিরুদ্ধে পাকিস্তানের সর্বোচ্চ আদালত সুপ্রীম কোর্টে আপীল দায়ের করল।

প্রধান বিচারপতি সহ সুপ্রীম কোর্টের পাঁচজন বিচারপতি

Mamun Academy

এই মামলার শেষ আপীল শুনেন। মাননীয় বিচারপতি জাস্টিস এস. এ. রহমান অন্যান্য বিচারপতিগণের সঙ্গে একমত হয়ে তাঁদের চূড়ান্ত রায় প্রদান করেন। উক্ত রায়ে তাঁরা ফুল বেঞ্চের রায় রদ ও রহিত করে দেন এবং বিচারপতি সাব্বির আহমেদের সঙ্গে একমত হয়ে কর্ণেল ইউসুফকে মাত্র ৪৯৮ ধারা মতে দোষী সাব্যস্ত করেন।

সেই বিখ্যাত রায়ের শেষের দিকে মাননীয় বিচারপতি এস. এ. রহমান বলেন : 'তাহলে শেষ পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে যে ক্রিস্টা রেনেটি তার স্বামী আলী নওয়াজের বিবাহিত ও বৈধ স্ত্রী থাকা কালীনই কর্ণেল ইউসুফ তাকে ফুসলিয়ে ভঙ্গ করে নেয়ার অপরাধে অপরাধী। এটা বিচারে সুপ্রমাণিত হয়েছে যে সে (কর্ণেল ইউসুফ) পরিষ্কার জানত যে রেনেটি তখনও নওয়াজের বিবাহিত স্ত্রী। রেনেটিকে বিয়ে করার অদম্য ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও তার (ইউসুফের) জানা উচিত ছিল যে রেনেটির প্রথম স্বামীর সঙ্গে তখনও কোন বৈধ তালাক হয়নি। সুতরাং এতদসত্ত্বেও রেনেটির সংগে আসামী বিয়ের যত অনুষ্ঠানই করুক না কেন, তা দ্বারা ওই সত্যি কখনও মুছে দেয়া যায় না, এটা কর্ণেলের আগেই স্মরণ রাখা উচিত ছিল। এই অবস্থায় কর্ণেল ও রেনেটির মধ্যে পরবর্তী বিয়ের প্রহসন আপাতদৃষ্টিতে তাদের অবৈধ মিলনকে বৈধ বলে লোকচক্ষে প্রচার করার একটি হীন কৌশল ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না, সুতরাং আমাদের মতে ৪৯৮ ধারার অভিযোগ থেকে আসামীকে খালাস দেয়া ফুল বেঞ্চের উচিত হয়নি। তাই আমরা এই আপীল মঞ্জুর করে আসামীকে উক্ত ধারায় দোষী সাব্যস্ত করছি।'

কর্ণেলের বিরুদ্ধে ৪৯৭ ধারার অভিযোগ (পর স্ত্রীর সঙ্গে সহবাস) সম্বন্ধে মাননীয় বিচারপতি এস. এ. রহমান তাঁর রায়ে বলেন : 'যদিও

Mamun Academy

ঘটনাদৃষ্টে ও সাক্ষ্য-প্রমাণে এটা প্রমাণিত হয়েছে যে কর্ণেল ক্রিস্টা রেনেটির সঙ্গে সহবাস করেছে এমন এক সময়ে যখন রেনেটি ছিল আলী নওয়াজের সঙ্গে বৈধ বৈবাহিক সম্বন্ধে আবদ্ধ। কিন্তু তবুও কর্ণেলের বিরুদ্ধে এই ধারার অভিযোগ ব্যর্থ হবে এই কারণে যে, এই ব্যাপারে রেনেটির স্বামীরও নীরব সহযোগিতা ছিল বলে ধরে নেয়া যায়। এ সম্বন্ধে পূর্বের আলোচনায় দেখা গেছে যে তাদের সেই অবৈধ মিলনে রেনেটির স্বামী বাধা না দিয়ে বরং এ ব্যাপারে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেয়াতে ইচ্ছুক এক বশীভূত স্বামীর মত আচরণ করেছে। ৩০শে ডিসেম্বর তারিখে যখন নওয়াজ তার স্ত্রীকে কর্ণেলের সংগে জেনারেল রানার বাড়িতে দেখতে পেল, তখন সে স্বামী হয়েও কেবল তার স্ত্রীকে বুঝিয়ে নিজ বাড়িতে নিয়ে আসার চেষ্টা করে মাত্র। কিন্তু সেই চেষ্টায় ব্যর্থ হওয়ার পরে নওয়াজ চুপ-চাপ বসে ছিল ও তার স্ত্রীকে কর্ণেলের সংগে রাত্রের ট্রেনে (ডবল রিজার্ভ বেডের একই কামরায়) এক সঙ্গে কোয়েটা পর্যন্ত যেতে কোন বাধাই দেয়নি বা সে সম্বন্ধে সঙ্গে সঙ্গে কোন ব্যবস্থা বা অভিযোগ করেনি। বরং এর পরপরই কোয়েটাতে (আসামীর বাসায়) তার স্ত্রীকে লেখা ১/১২ তারিখের চিঠি থেকে (প্রথম পৃষ্ঠায় উল্লিখিত) বোঝা যায় যে রেনেটি ও ইউসুফ কোয়েটাতে অবৈধ সংসর্গে জীবন যাপন করেছে জেনেও স্বামী নওয়াজ তা রোধ করার কোনই সক্রিয় পন্থা অবলম্বন করেনি। সেই চিঠিতে বরং দেখা যায় যে তার স্ত্রী কর্ণেলের সঙ্গে অবৈধ সংসর্গে লিপ্ত আছে জেনেও স্বামী তার স্ত্রীকে তার নতুন জীবনে শুভেচ্ছাও জানিয়েছে। সুতরাং এটা প্রমাণিত হয়নি যে কর্ণেল ইউসুফ সত্যিই ৪৯৭ ধারার অপরাধে অপ-রাধী। আর সেই কারণেই আমরা আসামীকে উক্ত ধারার অপরাধ

Manik Academy

থেকে মুক্তি দিচ্ছি।'

আসামীর শাস্তি সম্বন্ধে মাননীয় বিচারপতি বলেন: 'দেখা যাচ্ছে যে বাদী নওয়াজ তার জ্ঞাতসারেই এবং তার নাকের ডগার উপরেই এই অবৈধ সংসর্গ গড়ে উঠতে দেখেছে। কিন্তু তবুও সে তা প্রতিরোধ করার চেষ্টা করেনি। বা তখনই তার বিপথগামী স্ত্রীকে পথে ফিরিয়ে আনতে উপযুক্ত কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। আসামী কর্ণেল একজন সরকারী কর্মচারী ও সেই কারণেই সরকারী চাকরির কঠিন শৃঙ্খলার আওতাধীন। এই অবস্থার সুযোগ নিয়েও আলী নওয়াজ কর্ণেলকে ওই অবৈধ সংসর্গ থেকে নিবৃত্ত করার কোন চেষ্টা প্রথমে করেনি। আমরা এ-ও জানি যে এখানে আসামীর সাজা হলেই সরকারও তার বিরুদ্ধে চাকরি সম্বন্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করবে। (অর্থাৎ আসামী তার বর্তমান উচ্চ সরকারী চাকরি হারাবে)। এই সব দিক বিবেচনা করে আসামীকে আমরা ৪৯৮ ধারা অনুযায়ী দোষী সাব্যস্ত করে তাকে দুই হাজার টাকা জরিমানা করছি। অনাদায়ে আসামী তিন মাসের সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করবে। আগামী ১৫দিনের মধ্যে এই জরি মানা দিতে হবে।'

দেশের সর্বোচ্চ আদালতের এই রায়ের পরে কর্ণেল ইউসুফ তার লোভনীয় সি. এস. পি. চাকরিটি হারায়।

রেনেটি অতঃপর স্বামী নওয়াজের বিরুদ্ধে দৈহিক অত্যাচারের অভিযোগ এনে কোর্টে এক বিবাহ বিচ্ছেদের মামলা দায়ের করে। এই মামলায় নওয়াজ অবশ্য কোন বাধা দেয়নি। অতঃপর আদালত থেকে রেনেটি বিবাহ বিচ্ছেদের এক তরফা ডিক্রি লাভ করার পর কর্ণেল ইউসুফ রেনেটি ওরফে রোকেয়াকে মুসলিম আইন অনুযায়ী বিয়ে করে।

Mamun Academy

দেবদাসী

বহুদিন আগের কথা।

অপরূপ সুন্দরী চিন্নাম্মল ছিল মাদ্রাজের থিরু ভালানগাছুর অধিবাসী। তার আগে তার পিতামাতার পর পর তিনটি সন্তানের মৃত্যু হয় শৈশবেই। তাই ১৮৯০ সালে চিন্নাম্মলের জন্মের পরেই তার বাপ-মা ঠিক করল যে এই মেয়ে বেঁচে থাকলে তাকে উপহার দেয়া হবে দেবতার কাছে 'দেবদাসী' হিসাবে। অর্থাৎ সে হবে দেবতার ভোগ্যা। দক্ষিণ ভারতে মেয়েকে 'দেবদাসী' করে মন্দিরে সমর্পণ করা বাপ-মা ও কন্যার পক্ষে এক মহা পুণ্যের কাজ বলে বিবেচিত হত। দেবতার পূজা ও মন্দিরের সেবকদের সেবা ও মনোরঞ্জন করে জীবন কাটিয়ে দেয়াটা ছিল দেবদাসীদের কাজ। সাধারণত তারা নাচ-গানেও পারদর্শী হত তাই তাদেরকে 'নৃত্য-বালা' (Dancing girl)বলেও ডাকা হত।

চিন্নাম্মলকেও তার মা বাল্যকাল থেকেই নাচে গানে—বিশেষ করে ভজন গানে পারদর্শী করে তোলে।

যৌবনের প্রথম উন্মেষে মাত্র ১৩ বৎসর বয়সে একদিন চিন্না-ম্মলের বাবা তার হাত ধরে গিয়ে উপস্থিত হল তাদের বাড়ি থেকে কয়েক মাইল দূরে থিরু ভালানগাছুর মন্দিরে। ঐ মন্দিরের প্রধান ধর্মকর্তা মুথিয়া চেট্টী তখন মন্দিরেই ছিল। চিন্নাম্মলের রূপের

Manju Academy

জৌলুষ দেখে সে বিমোহিত হয়ে গেল। আরও মুগ্ধ হল সে তার নাচ দেখে ও গান শুনে। মুথিয়া চেট্টী ও মন্দিরের অন্যান্য সবাই চিন্নাম্মল ও তার বাবাকে ধন্য ধন্য করল এই মহৎ উদ্দেশ্যে মেয়েকে উৎসর্গ করার জন্যে। মুথিয়া অভয় দিল যে সে মেয়েটির প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখবে। কিন্তু চিন্নাম্মল মুথিয়া চেট্টীর হাবভাবে যেন শঙ্কিত হয়ে উঠল। অঝোরে কাঁদতে কাঁদতে চিন্নাম্মল বিদায় নিল সেদিন তার বাপ-মার কাছ থেকে।

মন্দিরের ধর্মকর্তা মুথিয়া কিন্তু সত্যিই চিন্নাম্মলের বসবাসের বিশেষ ব্যবস্থা করল মন্দির সংলগ্ন আশ্রমের একটি সুন্দর ঘরে। একজন বৃদ্ধাকে সব সময় তার সাহায্যের জন্যে রাখা হল যাতে তার কোন অসুবিধা না হয়।

সারাদিন নেচে-গেয়ে মন্দিরের লোকজন ও দর্শকদের মনোরঞ্জন করে চিন্নাম্মলের দিনগুলো ভালই কাটতে লাগল সেখানে।

দেখতে দেখতে চিন্নাম্মলের দেহে রূপ যৌবনের ঢল নামল। মন্দিরের দেবদাসী হিসাবে অনেকেরই নজর পড়ল তার উপরে। কিন্তু ধর্মকর্তা মুথিয়ার ভয়ে কেউ তাকে শয্যাসঙ্গিনী করতে সাহস পেল না, যদিও সেকালে দেবদাসীদের উপরে মন্দিরের সেবক এমনকি দর্শকদেরও অধিকার ছিল। আর দেবদাসীদেরও কর্তব্য ছিল সর্ব প্রকারে ওদের সবার মনোরঞ্জন ও ইচ্ছা পূরণ করা।

১৪ বৎসরে পা দিবার পরপরই একদিন চিন্নাম্মল একটি বিশেষ আয়োজন লক্ষ্য করল সেখানে। ধর্মকর্তা মুথিয়া চেট্টীর ঘরটি সেদিন বিশেষ ভাবে পরিষ্কার করে ফুল দিয়ে সাজানো হল। চিন্নাম্মলকেও তার পরিচারিকা বৃদ্ধা বিশেষভাবে সাজাল। কারণ জিজ্ঞেস করাতে বৃদ্ধা চিন্নাম্মলের কানে কানে বলল, 'আজ যে তোমার ফুল

সজ্জা। ধর্মকর্তা স্বয়ং তোমাকে অঙ্গশায়িনী করবেন, তার ঘরেই ত তোমার আজ রাত্রিযাপন।'

শুনে চমকে উঠল চিন্নাম্মল। বুঝল, এই উদ্দেশ্যেই ধর্মকর্তার এত নজর ছিল তার প্রতি। কিন্তু উপায় নেই, দেবদাসী হিসাবে এটাও তার একটি কর্তব্য বিশেষতঃ মন্দিরের প্রধানই যখন আজ তার জীবনের প্রথম পুরুষ মানুষ হতে যাচ্ছে। এছাড়া মুথিয়ার স্বাস্থ্য এবং যৌবনও ছিল আকর্ষণীয়। তার ধন-সম্পদের কোন হিসাব নেই। বিয়েও সে করেনি জীবনে। মন্দিরের অন্যান্য দেবদাসীরা কিন্তু চিন্নাম্মলের এই সৌভাগ্যে ঈর্ষান্বিত হল। রাতের বাসর ঘরের জন্যে তাকে সাজাতে লেগে গেল অন্যান্য দেবদাসীরা। আর তখন তার প্রতি কাটতে লাগল নানা রকমের টিপ্পনী।

এর পর থেকে কিন্তু মুথিয়া চেট্টী প্রায় রাতই কাটাতে লাগল মন্দির প্রাঙ্গণে তার নিজস্ব ঘরে। আর চিন্নাম্মলই হল তার প্রতি রাতের সঙ্গিনী।

একদিন চিন্নাম্মল অনুরোধ করল মুথিয়াকে যে মন্দীরের পরিবেশ তার আর ভাল লাগছে না। আরও দু'একজন পুরোহিতের লুব্ধ দৃষ্টি পড়েছে তার উপরে। সেদিন সকালে ফুল কুড়াবার সময় এক পুরোহিত একলা পেয়ে হঠাৎ জড়িয়ে ধরেছিল তাকে। রাগে চিন্নাম্মল তার গালে এক চড় বসিয়ে দিয়েছিল। পুরোহিত উত্তরে বলেছিল যে মন্দিরের দেবদাসী সে তাই মন্দিরের সবারই সমান অধিকার আছে চিন্নাম্মলের উপরে। এটাই ধর্মের বিধি। ধর্মকর্তা একাই তাকে ভোগ করার অধিকারী নয়।

ঠিকই বলেছে সেই পুরোহিত। গম্ভীর হয়ে ভাবে মুথিয়া চেট্টী। দেখল চিন্নাম্মলকে আর এখানে রাখা নিরাপদ নয়। কারণ তার

ভাগ সে আর কাউকে দিতে রাজি নয়। চিন্নাম্মলকে ছাড়া সেও বাঁচতে পারবে না। পুরোহিত হলে কি হবে, সে-ও ত রক্ত মাংসের মানুষ! চিন্নাম্মল তার মনপ্রাণ জয় করে নিয়েছে। আর এরই মধ্যে সে গহনা ও নতুন নতুন কাপড়-চোপড় দিয়ে চিন্নাম্মলকে রাজরাণী করে তুলেছে।

থিরু ভালানগার গ্রামটিও এর আগে কিনে ফেলেছিল মুথিয়া চেট্টী। মন্দির থেকে দূরে সেই গ্রামেই গড়ে তুলল একটি সুন্দর বাড়ি। সেখানেই এবার এনে তুলল তার প্রেয়সী চিন্নাম্মলকে। সেখান থেকে মাদ্রাজ শহর ছিল ৩৮ মাইল দূরে। সেখানেও ছিল চেট্টীদের বিরাট ব্যবসা। আবার মন্দিরের দেখাশুনাও করতে হত তাকে, কিন্তু সারাদিন সেখানে যে কাজই করুক না কেন মুথিয়া সন্ধ্যার পরে ঠিক এসে হাজির হত চিন্নাম্মলের কাছে। আর চিন্নাম্মলও সারাদিন অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করত তার জন্যে। এই সময় মুথিয়া সাত আট হাজার টাকার দামী গহনা দিয়ে চিন্নাম্মলের গা ভরে দিল। এছাড়া বহু জমিজমাও কিনে ফেলল তার জন্যে। কিছু দিন ব্যবসা উপলক্ষে চেট্টীকে বোম্বে গিয়ে থাকতে হয়েছিল, সেই সময় প্রতিদিনই আসত চিন্নাম্মলের নামে তার একটি করে প্রেমপত্র। সেই সব চিঠির ভাব ও ভাষা চিন্নাম্মলকে করত মুগ্ধ। ভাবত, ভাগ্যবতী সে। নাহলে দেবদাসী হয়েও সে একজনের এত প্রেম এত ভালবাসা পেল কিভাবে?

ক্রমে ব্যবসায়ে উন্নতি হতে লাগল দিন দিন মুথিয়া চেট্টীর। তার পক্ষে চিন্নাম্মলের গ্রামের বাড়িতে রোজ আসা অসুবিধাজনক হয়ে উঠল। এই সময় একদিন চিন্নাম্মল একটি সুসংবাদ দিল তাকে যে সে অন্তঃসত্ত্বা। তাদের প্রথম বাচ্চা হবে তাই তাকে শহরে রাখাই

Mamun Academy

নিরাপদ।

মুথিয়া মাদ্রাজ শহরের ইয়াঙ্গা চেট্টী স্ট্রীটে একটি সুন্দর দোতালা বাড়ি ভাড়া নিয়ে সেখানেই নিয়ে এল চিন্নাম্মলকে। এই বাড়িতেই ১৯০৮ সালের এপ্রিল মাসে জন্মগ্রহণ করল তাদের প্রথম কন্যা সন্তান।

এরপর মাদ্রাজের ঐ বাসাতেই চিন্নাম্মলের দ্বিতীয় সন্তান (প্রথম পুত্র) জন্মগ্রহণ করে ১৯১৭ সালের ২৭শে ফেব্রুয়ারী। ১৯১৮ সালের ১৬ই সেপ্টেম্বর জন্মে তার তৃতীয় সন্তান (২য় পুত্র)। এই ভাবে সুখী পরিবার হিসাবে ১৯০৪ সাল থেকে ১৯১৯ সাল পর্যন্ত চিন্নাম্মল ও মুথিয়া চেট্টী স্বামী-স্ত্রী রূপেই একত্রে বসবাস করে, যদিও ওদের মধ্যে প্রকৃতপক্ষে কোনদিন বিয়ে বা বিয়ের অনুষ্ঠান হয়নি।

ধনী মুথিয়া চেট্টী প্রেয়সী চিন্নাম্মলকে বহু টাকার গহনাপত্র দান করে। তার ও সন্তানদের সমস্ত খরচ বহন করেও চিন্নাম্মলকে সে মাসিক ৫০ টাকা হিসেবে নিয়মিত হাত খরচা দিত। তার নামে একটি বড় জমিদারীও খরিদ করে ফেলে মুথিয়া চেট্টী।

কিন্তু বিপদ দেখা দিল ১৯১৯ সালে। চিন্নাম্মলের মধুতে বোধ হয় ততদিন আর সে মাদকতা ছিল না। নতুন ফুলের খোঁজে মুথিয়া চেট্টী তখন ব্যস্ত। এই নিয়ে ওদের মধ্যে কয়েকদিন মনোমালিন্য ও বচসা হয়। ১৯১৯ সালের শেষের দিকে মুথিয়া চিন্নাম্মলের কাছে আসা একেবারেই বন্ধ করে দিল। আর সেই থেকে তার ও তার ছেলেমেয়েদের ভরণপোষণের দায়িত্বও সে আর নিতে অস্বীকার করে বসল। অতঃপর অসহায় চিন্নাম্মল তিনটি নাবালক ছেলেমেয়ে নিয়ে বিপদে পড়ে গেল। সে তাদের ভরণপোষণের দাবি করে মুথিয়াকে প্রথমে চিঠিপত্র ও পরে উকিলের নোটিশ দিল। কিন্তু মুথিয়া তবুও তাদের কোন খরচ বহন করতে অস্বীকার করল। তারপর বাধ্য হয়ে

Mamun Academy

চিন্নাম্মল ছেলেমেয়েদের জন্যে মাসিক ৫০০ টাকা হারে মাসোহারা দাবি করে মুথিয়া চেট্টীর বিরুদ্ধে মাদ্রাজ হাইকোর্টে এক মোকদ্দমা দায়ের করল। আর্জিতে সে বলল যে গোড়াতে দেবদাসী হলেও একমাত্র মুথিয়া চেট্টীর সঙ্গেই সে স্বামী-স্ত্রী হিসাবেবসবাস করেছে। আর তার তিনটি সন্তানের পিতাই হল মুথিয়া চেট্টী। তাই বাপ হিসাবে বাচ্চাদের দায়িত্ব ও খরচ তাকেই বহন করতে হবে।

মুথিয়া চেট্টী তার জবাবে বলে যে চিন্নাম্মল একজন দেবদাসী ও নর্তকী। তাকে সে কোনদিনই বিয়ে করেনি। সে যদিও নিজে মন্দিরের ধর্মকর্তা হিসেবে ওই মন্দিরেরই দেবদাসী চিন্নাম্মলের সঙ্গে মাঝে মাঝে সহবাস করেছে, মন্দিরের অন্যান্যরাও তেমনি করেছে। এবং সে ছাড়া অন্যান্য বহু লোকও সেই নর্তকীর সঙ্গে রাত্রিযাপন করেছে। এই তিন সন্তানের পিতৃত্ব সে অস্বীকার করল। মুথিয়া তার সঙ্গে সহবাসের বিনিময়ে তাকে প্রচুর অর্থ আগেই প্রদান করছে। অতএব সে এখন আর কোন মাসোহারার অধিকারী নহে।

দুঃখের বিষয় এই মামলার শুনানী শুরু হবার আগেই অকস্মাৎ মুথিয়া চেট্টীর মৃত্যু হয়। তার কোন বিবাহিত স্ত্রী বা অন্য সন্তানাদি ছিল না। অথচ মৃত্যুকালে মুথিয়া চেট্টী প্রায় ৩০ লাখ টাকার সম্পত্তি রেখে যায়। সেই সমস্ত সম্পত্তি মুথিয়ার চাচা ও ভাইপোরা তাদের একান্নবর্তী পরিবারের সদস্য হিসাবে দখল করে বসে। অতঃপর চিন্নাম্মল মামলায় তাদেরও নামভুক্ত করে নেয়। এরাও এসে বলে যে চিন্নাম্মল কোনদিনই মৃত মুথিয়ার স্ত্রী ছিল না। তার ওই সন্তানেরা মুথিয়ার ঔরসজাতই নয়। চিন্নাম্মল একজন সাধারণ নর্তকী ও দেহপাসারিণী মাত্র।

তৎকালীন মাদ্রাজ হাই কোর্টের বিচারপতি জাস্টিস স্যার কুমার

স্বামী শাস্ত্রীর এজলাসে এই মামলার শুনানী হয় ১৯১৫ সালের জানুয়ারী মাসে।

মামলায় বাদীপক্ষ অর্থাৎ চিন্নাম্মল কোর্টে একটি দলিল দাখিল করে। মুথিয়া চেট্টীর জীবদ্দশায় তার বোন মুথিয়ার বিরুদ্ধে একটি মামলায় এই অভিযোগ আনয়ন করে যে মুথিয়া তার রক্ষিতা চিন্নাম্মলকে ওই বোনের বহুগহনা দান করেছে। সেই মামলায় মুথিয়া ১৯১৭ সালের ২৩শে এপ্রিল কোর্টে সাক্ষ্য দিয়ে জেরার সময় স্বীকার করে যে সে চিন্নাম্মলকে মোট মত আট হাজার টাকার গহনা দান করেছে। মাসিক ১০/৬০ টাকা হারে মাসোহারাও সে তাকে দিত। এছাড়া সে চিন্নাম্মলকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসত। চিন্নাম্মল তার কাছে যখন যা চাইত তখনই সে তা পেত। উভয়ের কাছে উভয়েরই অদেয় কিছুই ছিল না। মুথিয়া চিন্নাম্মলের জন্যে বেনামীতে বহু জমিও খরিদ করে।—মুথিয়ার সব সময় এই ইচ্ছাই ছিল যে চিন্নাম্মল দেবদাসী ও নর্তকী হলেও সে যেন অন্য কোন পুরুষের সংসর্গে না আসে, সে একমাত্র তারই থাকবে।

বাদীপক্ষ ১৯০৬ সাল থেকে পরবর্তী কয়েক বৎসর যাবত চিন্নাম্মলকে লেখা মুথিয়ার কয়েকটি প্রেমপত্র কোর্টে দাখিল করে। এই সব চিঠি পড়ে পরিষ্কার বোঝা যায় যে এগুলো কোন দেহপসারিণীকে বা ক্ষণিকের প্রেমিকাকে লেখা চিঠি হতে পারে না। বরং এতে দেখা যায় যে এই পক্ষদ্বয়ের মধ্যে বহুদিনের গভীর প্রেম ভালবাসা ছিল। এবং পিতা হিসাবেই মুথিয়া বাচ্চাদের সমস্ত দায়িত্ব পালন করে আসছিল ১৯১৮ সাল পর্যন্ত।

চিন্নাম্মল নিজেও কোর্টে সাক্ষ্য দিয়ে প্রকাশ করে যে মুথিয়া সর্বপ্রথম তার কুমারীত্ব হরণ করে। তার সংগেই সে বরাবর বাস করত।

আর যদিও সে প্রথমে ছিল দেবদাসী ও নর্তকী, কিন্তু সে একান্ত ভাবে মুথিয়া চেট্টীরই ছিল। আর তারই ঔরসে তার তিন সন্তানের জন্ম হয়েছে।

বিবাদী পক্ষ কিন্তু বহু সাক্ষী হাজির করে প্রমাণ করার চেষ্টা করল যে অন্যান্য নর্তকীদের মত চিন্নাম্মলও ছিল একজন দেহপসারিণী "দেবদাসী"। মুথিয়া সহ অন্যান্য পুরুষদেরও সংসর্গ দেয়াই ছিল তার পেশা। কিন্তু জেরার সময় তারা মুথিয়া ছাড়া পরিষ্কার ভাবে সেরকম আর কোন পুরুষের নাম করতে পারল না।

বিচারক কিন্তু বিবাদীর এই সব সাক্ষ্য ও যুক্তি অগ্রাহ্য করেন, এই কারণে যে মুথিয়া চেট্টী ছিল খুবই ধনী ও প্রভাবশালী ব্যক্তি। বড় জমিদার হিসাবে তার অগাধ ধনসম্পত্তি ছিল। তার নিজের কোন বিবাহিত স্ত্রী-পুত্র ছিল না। থিরু ভালানগাড়ুর মন্দির এবং আশ্রমেরও সেই ছিল প্রধান। আর সবচেয়ে বড় কথা দীর্ঘ ১৪ বৎসর যাবত সে সত্যিই প্রাণ দিয়ে ভালবেসেছিল চিন্নাম্মলকে। তার সমস্ত ভরণ পোষণ ও অন্যান্য দায়িত্ব সে সময়ে সেই একা পালন করেছে। এ হেন অবস্থায় চিন্নাম্মল দেবদাসী বা নর্তকী হলেও মুথিয়া যে তাকে সাধারণ দেহ পসারিণীর মত অন্য পুরুষের অবাধ্য সংসর্গে আসতে দেবে এটা চিন্তা করাও অস্বাভাবিক। বিশেষ ভাবে যখন দেখা গেছে যে মুথিয়া তার প্রেমিকাকে প্রথম থেকেই সাবধানে অন্যান্য পুরুষদের সংসর্গ থেকে দূরে রাখার চেষ্টা করেছে।

মাননীয় জজ বাহাদুর তাই এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হন যে ঋতুবতী হবার এবং চিন্নাম্মলকে মন্দিরে সমর্পণ করার পরে মুথিয়াই প্রথম তার কুমারীত্ব হরণ করে এবং সেই থেকে তাকে একান্ত নিজস্ব রক্ষিতা হিসাবে রাখে। যদিও তাদের মধ্যে কোনদিন বিয়ের অনু-

Mamun Academy

ষ্ঠান হয়নি, কিন্তু তারা দীর্ঘ তের-চোদ্দ বছর যাবত স্বামী স্ত্রী হিসাবেই বসবাস করে আসছিল। আর সেই কারণে চিন্নাম্মলের তিনজন বাচ্চাই তার ঔরসজাত বলে সহজেই ধরে নেয়া যায়।

তাই এই সন্তানদের ভরণপোষণের দায়িত্ব মুথিয়ার অর্জিত সম্পত্তির আয় থেকেই বহন করতে হবে।

এদের মধ্যে বড় মেয়েটির বয়স তখন (এই মামলার বিচারের সময়ে) ছিল ১৬ বৎসর। তাই জোট এই রায় দিলেন যে, যতদিন পর্যন্ত ওই প্রথম কন্যার বিয়ে না হয় বা তার ১৮ বৎসর পূর্ণ না হয়, ততদিন সে মাসিক ৫০ টাকা হারে মাসোহারা পাবে। এছাড়া অন্য দুইজন নাবালক পুত্র তাদের জীবন ভর প্রত্যেকে মাসিক ১০০ টাকা হারে মাসোহারা পাবে। মামলা শুরুর তারিখ থেকেই তারা এই মাসোহারা পাবে। আর তা মুথিয়া চেট্টীর মাদ্রাজ শহরের একটি বড় বাড়ির আয় থেকে মাসের ১৬ তারিখের মধ্যে প্রদান করতে হবে।

যেহেতু চিন্নাম্মল নর্তকী সম্প্রদায়ভুক্ত, তাই তার প্রথম কন্যার ১৮ বৎসরের মধ্যে বিয়ে না হয় তাহলে সমাজের রীতি অনুসারে ধরে নেয়া হবে যে সে-ও নর্তকীর পেশাই গ্রহণ করবে এবং তখন থেকে সে স্বাবলম্বী হয়ে উঠবে। এই কারণেই ১৮ বৎসর পূর্ণ হয়ার পরে সে আর কোন মাসোহারা পাবে না।

Mamun Academy

অনিলা ওরফে আয়েশার রীট আবেদন

Manush Academy

এই কাহিনীর নায়িকা মিসেস অনিলা চন্দ ছিল কলকাতার বাসিন্দা। সেখানে তার স্বামী ও সন্তানদের নিয়ে সে থাকত শ্যামবাজারস্থ তাদের বাসায়। তখন অনিলার বয়স ছিল ৩০ বৎসরের কাছাকাছি ও সে ৪টি সন্তানের মা ছিল।

বয়স হলেও অনিলার পড়ার দিকে খুব ঝোঁক ছিল। ম্যাট্রিক পরীক্ষার জন্যে প্রস্তুতি নিচ্ছিল সে। কলকাতায় তাকে তখন প্রাইভেট পড়াত পূর্ব বাংলার বাসিন্দা একজন মুসলমান যুবক, নাম হক চৌধুরী। কার্যোপলক্ষে চৌধুরী তখন কলকাতায় থাকত, আর অবসর সময়ে অনিলার প্রাইভেট টিউটর হিসাবে কাজ করে বিদেশে কিছু রোজগার করত। সে-ও ছিল বিবাহিত, তার স্ত্রী তখন থাকত ঢাকায়।

প্রেমের গতি বিচিত্র, দেশ-কাল-পাত্র, জাতিধর্ম কিছুই মানে না। কাকে যে কখন প্রেমের দেবতা তার শর-বিদ্ধ করে তা বুঝতে পারবে কে?

উদারমনা স্বামী তেজেন্দ্র তার চার সন্তানের মা, স্ত্রী অনিলাকে অথবা শিক্ষিত, বিবাহিত লাজুক প্রকৃতির হক চৌধুরীকে সন্দেহ

করার কোন কারণই দেখেনি, বিশেষ করে চৌধুরী যখন একজন বিদেশী ভিন্ন ধর্মাবলম্বী বিবাহিত যুবক।

কিন্তু সব কিছুরই বাঁধ ভেঙে এক অদৃশ্য টানে ক্রমে ক্রমে অনিলা নিজের অজ্ঞাতে ঝুঁকে পড়ল হক চৌধুরীর দিকে। তার মন যে আর বুঝ মানে না। অনুরূপভাবে চৌধুরীও সুন্দরী অনিলার দুর্বার আকর্ষণে পতঙ্গের মত আগুনের গায়ে ছুটে এসে পড়ল। উভয়েই উভয়ের প্রেমে পড়ে গেল অনেকটা নিজেদের অজান্তে।

কিন্তু অনিলা বিবাহিতা হিন্দু রমণী। স্বামী পুত্রদের নিয়ে কলকাতায় বসবাস করে সে। আর চৌধুরী সেখানে এক বিদেশী নাগরিক। তার বাধা অনেক। কিন্তু তবুও প্রেম যে অন্ধ! বাঁধ বেঁধে তাকে আটকানো যায় না। অনিলা যেন চৌধুরীর মধ্যেই এতদিন পর তার জীবনের প্রকৃত পুরুষকে খুঁজে পেল। তাকে ছাড়া তার বাঁচা সম্ভব নয় একথা একদিন সে জানিয়েই ফেলল হক চৌধুরীকে। তার জন্য সে দেশ, ধর্ম, স্বামী, পুত্র সবই চিরতরে ত্যাগ করতে প্রস্তুত বলে জানাল।

এদিকে চৌধুরীর অবস্থাও তথৈবচ। অনিলার সেবা যত্ন ও প্রেমে সে-ও হাবুডুবু খেতে শুরু করল।

স্বামী তেজেন্দ্র প্রায়ই তার নিজের কাজে ব্যস্ত থাকত বাইরে। আর এদিকে তার বাসায়ই বসে প্রাইভেট পড়ার নামে অনিলা ও চৌধুরীর মধ্যে চলতে লাগল প্রেমের লীলা খেলা। অনিলা সারাদিন পরিশ্রম করে গোপনে তৈরি করে রাখত চৌধুরীর জন্যে নানা প্রকার খাবার। তা সে মনপ্রাণ দিয়ে খাওয়াত তার প্রেমিককে যখন সে তাকে পড়াতে আসত প্রতিদিন।

সেদিন ছিল ২রা জানুয়ারী। অনিলা কলকাতায় তার এক

Mamun Academy

আত্মীয় বাড়ি বেড়াতে যাবে বলে তার সর্বকনিষ্ঠা চার বৎসরের মেয়ে শায়লাকে নিয়ে সকালের দিকে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ল।

রাত ১০টা বেজে গেল কিন্তু অনিলার দেখা নেই। এদিকে যথা সময় বাসায় ফিরে স্বামী তেজেন্দ্র অস্থির হয়ে তার অপেক্ষায় বসে রইল। রাত ১০টার মধ্যেও যখন অনিলা ফিরল না তখন ভয়ানক দুশ্চিন্তা নিয়ে তেজেন্দ্র তার সেই আত্মীয় বাড়ি গিয়ে হাজির হল অনিলার খোঁজে। কিন্তু সেখানে গিয়ে সে আশ্চর্য হয়ে শুনল যে অনিলা সেদিন সেখানে একদম আসেইনি। তার কোন সংবাদও তারা জানে না।

অসহায় তেজেন্দ্র ফিরে এল বাড়িতে। মহা এক শঙ্কার মধ্যে সারারাত সে তার তিন সন্তান নিয়ে দুরু দুরু বক্ষে বিনিদ্র রজনী কাটাল। রাত্রে কয়েকবারই ছেলেরা ঘুম থেকে জেগে উঠে 'মা' 'মা' বলে কেঁদে উঠল। তেজেন্দ্র তাদেরসান্ত্বনা দিয়ে বলল, 'ঘুমাও বাছা। তোমার মা বাইরে গেছে, এখনই এসে যাবে।'

ভোর হল। কিন্তু অনিলার দেখা নেই। পরদিনও কাটল সেই অধীর অপেক্ষায়। সেদিন বা তার পরে আর কোনদিনই ফিরে এল না অনিলা সেই বাড়িতে। সেই সঙ্গে তার মাস্টার চক চৌধুরীও উধাও। তারও আসা বন্ধ হয়েছে সেই দিন থেকেই।

অগত্যা শেষ পর্যন্ত তেজেন্দ্র খবর দিতে বাধ্য হল থানায়। সেই সঙ্গে সে কলকাতার সম্ভাব্য সমস্ত স্থানে খুঁজে বেড়াতে লাগল অনিলাকে। পুলিশ প্রতি থানায় অনিলার ফটো পাঠিয়ে দিল। কিন্তু সবই বৃথা হল। কলকাতা বা তার আশেপাশে কোথাও অনিলার হদিস পাওয়া গেল না।

তেজেন্দ্রের গভীর সন্দেহ হল যে অনিলা হয়ত তার মাস্টারের

Mamun Academy

সঙ্গে পূর্ব বাংলায় পালিয়ে গেছে। এই কথা চিন্তা করে সে ঢাকায় তার এক নিকট আত্মীয়কে বিস্তারিত চিঠি লিখে তাকে অনুরোধ করল ঢাকায় অনিলার খোঁজ করতে। ঢাকার সেই আত্মীয় অনিলাকে চিনত, চিঠি পেয়েই সে তার খোঁজে লেগে গেল।

অবশেষে সে একদিন অনিলার সন্ধান সত্যিই পেল। ঢাকার রাস্তায় একদিন অনিলাকে এক অপরিচিত যুবকের সঙ্গে একই রিক্সায় দেখতে পেয়ে সে গোপনে তাদের অনুসরণ করল ও জানতে পারল যে অনিলা ঢাকাতে হক চৌধুরীর বাসায় তার ছোট মেয়ে সহ বসবাস করছে।

এই খোঁজ পেয়ে তেজেন্দ্রের সেই আত্মীয় সঙ্গে সঙ্গে কলকাতায় চিঠি লিখে তেজেন্দ্রকে সব বিষয় জানিয়ে তাড়াতাড়ি তাকে ঢাকায় চলে আসার জন্যে জরুরী বার্তা পাঠাল। সেই সঙ্গে সে চৌধুরীর ঢাকার ঠিকানাও দিয়ে দিল।

চিঠি পেয়েই তেজেন্দ্র কলকাতায় তৎকালীন পাক হাই কমিশনারের অফিসে গিয়ে তার দুইটি নাবালক ছেলে ও একটি নাবালিকা মেয়ে সহ ঢাকায় আসার জরুরী ভিসা করে নিল এবং তাদের নিয়ে অবিলম্বে সে ঢাকায় এসে পৌঁছল। (সেটা ছিল ১৯৬১ সাল, তখন দুই বাংলার মধ্যে যাতায়াত সহজসাধ্য ছিল।)

ঢাকায় নেমেই তেজেন্দ্র চিঠির ঠিকানা মত সোজা হক চৌধুরীর বাসায় গিয়ে হাজির হল। চৌধুরী তখন বাসাতেই ছিল। সে হঠাৎ ছেলেমেয়ে সহ তেজেন্দ্রকে সেখানে দেখে চমকে উঠল।

তেজেন্দ্র তাকে অনিলার কথা জিজ্ঞেসা করায় হক চৌধুরী প্রথমে আমতা আমতা জবাব দিল, কোন সদুত্তর দিতে পারল না। হক চৌধুরীর হাবভাবে তেজেন্দ্রের গভীর সন্দেহ হল যে চৌধুরী

নিশ্চয়ই সত্য গোপন করছে আর অনিলা বোধ হয় সেই বাড়ির ভিতরেই আছে।

দেরি করলে হয়ত অনিলাকে সেখান থেকে সরিয়ে ফেলতে পারে এই সন্দেহ করে তেজেন্দ্র দৃঢ় স্বরে বলল, 'তাহলে আমাকে এই বাড়ির ভিতরেই ঢুকে দেখতে হবে অনিলা সত্যিই এখানে আছে কিনা।' বলে তেজেন্দ্র বাড়ির ভিতরে প্রবেশ করতে উদ্যত হল, কারণ সে বুঝতে পারছিল যেন পর্দার আড়ালে দাঁড়িয়ে কোন মহিলা তাদের কথাবার্তা শুনছে।

'খবরদার তুমি আমার বাড়ির ভিতরে ঢুকতে পারবে না,' বলে তেজেন্দ্রের পথ আগলে দাঁড়াল হক চৌধুরী।

বাধা পেয়ে তেজেন্দ্র বলল, 'বেশ, পুলিশকে ত আমার খবর দেয়াই আছে, তাদের আসার অপেক্ষায়ই তাহলে থাকা যাক। তাছাড়া এতদূরে এসে যখন তোমার খোঁজ একবার পেয়েছি, তখন অনিলার খোঁজও নিশ্চয়ই পাব।' এই বলে গ্যাঁট হয়ে বসল সে।

পুলিশের কথা শুনে হক চৌধুরী ঘাবড়ে গেল। এবার সে ঘরের ভিতরে ঢুকতে চেষ্টা করল। কিন্তু তাতে এবার তেজেন্দ্র বাধা দিল।

এসব কারণে বেশ গোলমাল শুরু হল সেখানে, তেজেন্দ্রের বাচ্চারা কেঁদে উঠল।

এমন সময় ভিতরের ঘরের পর্দা সরিয়ে এক মহিলা বেরিয়ে এল সেই ঘরে। অবশ্য অনিলা নয় সে।

মহিলা তেজেন্দ্রের কাছে নিজ পরিচয় দিয়ে জানাল যে সে হক চৌধুরীর স্ত্রী।

তেজেন্দ্রকে উদ্দেশ্য করে সে বলল, 'আপনিই বোধ হয় অনিলার স্বামী, আর এরা বুঝি তার বাচ্চা?'

Mamun Academy

'আপনার অনুমান সত্যি,' মাথা নেড়ে জানায় তেজেন্দ্র।

'তাহলে আপনাকে জানাচ্ছি যে আপনি ঠিকই ধরেছেন। আপনার স্ত্রী অনিলা এই বাড়িতেই আছে। হক চৌধুরী কলকাতা থেকে ফুস-লিয়ে বের করে নিয়ে এসে তাকে এই বাড়িতেই রেখেছে।'

'সত্যি বলছেন আপনি?' উৎফুল্ল হয়ে জিজ্ঞেস করল তেজেন্দ্র। কারণ এতক্ষণও তার সন্দেহ ছিল সত্যিই সে অনিলার খোঁজ এখানে পাবে কিনা।

'হ্যাঁ, আমি যা বলছি তা সম্পূর্ণ সত্য। নিজে স্ত্রী হয়ে আর এক-জনের স্ত্রীর এরকম অধঃপতন আমারও অসহ্য। আমার ঘোর বিরো-ধিতা সত্ত্বেও এই বাড়িতেই অনিলা ও আমার স্বামী দুজনে অবৈধ সংসর্গে লিপ্ত হয়েছে। এ পাপ সমাজ বা আল্লাহ কেউ সহ্য করবে না।'

'তাহলে অনিলাকে উদ্ধার করতে ও সৎপথে আনতে আমি আপনার সাহায্য আশা করতে পারি?' প্রশ্ন করে তেজেন্দ্র।

'অবশ্যই তা আপনি পারেন।'

তেজেন্দ্র আরও জানতে পারল যে অনিলা কলকাতা থেকে উধাও হবার পরই হক চৌধুরী অনিলাকে নিয়ে বিনা পাসপোর্টে গোপন পথে সীমান্ত পেরিয়ে পূর্ব বাংলায় প্রবেশ করে এবং সোজা ঢাকায় চলে আসে। আর সেই থেকেই তারা স্বামী-স্ত্রীর মত এখানে বস-বাস করছে।

অনিলাকে ডাকা হল সেখানে। অনেক বুঝাল তাকে তেজেন্দ্র ও হক চৌধুরীর স্ত্রী। ঘরে ফিরে যেতে অনুরোধ করল, অন্তত তার চারটি অসহায় ছেলেমেয়ের মুখের দিকে চেয়েও তার ঘরে ফেরা উচিত। তেজেন্দ্র আরও অভয় দিল যে এই ক'দিনের কাহিনীকে সে দুঃস্বপ্ন মনে করে তা সম্পূর্ণ ভুলে যাবার চেষ্টা করবে। হক

Mahua Academy

চৌধুরীর বিরুদ্ধেও সে কোন অভিযোগ আনবে না।

কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। যে একবার অবৈধ প্রেমে মজে পাপের পথে পা বাড়িয়েছে, তাকে সেই পিচ্ছিল পথ থেকে সরিয়ে আনা যে দুরূহ ব্যাপার।

অনিলা সেদিন কিছুতেই রাজি হল না তার স্বামীর সংগে ফিরে আসতে। আর হক চৌধুরীও অনিলাকে তার বাড়ি ছেড়ে তেজেন্দ্রের সংগে আসতে দিল না।

অনিলা আরও জানাল যে সে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছে ও হক চৌধুরীকে বিয়ে করেছে। তেজেন্দ্রের সংগে তার আর কোন সম্পর্ক নেই।

অবশেষে বিফল মনোরথ হয়ে তেজেন্দ্র সেদিন ফিরে এল ওই বাড়ি থেকে।

অতঃপর বন্ধু-বান্ধব ও উকিলের সংগে পরামর্শ করে তেজেন্দ্র ঢাকার সদর এস. ডি. ও-র কোর্টে হক চৌধুরীর বিরুদ্ধে তার বিবাহিতস্ত্রী 'অনিলা'কে ফুসলিয়ে বের করে আনার অভিযোগে এক ফৌজদারী মামলা দায়ের করল। আর সেই সংগে এফিডেভিট করে এ-ও সে প্রার্থনা করল যে একটি তল্লাশি পরওয়ানা জারী করে তার স্ত্রী অনিলাকে হক চৌধুরীর বাসা থেকে উদ্ধার করে কোন এক নিরপেক্ষ স্থানে অন্তত ১৫ দিন রাখা হোক, তাহলেই অনিলা মোহমুক্ত হয়ে সত্যি ঘটনা কোর্টে প্রকাশ করবে। কারণ অনিলাই হল তার মামলার প্রধান সাক্ষী। যতদিন অনিলা আসামী হক চৌধুরীর প্রভাবাধীনে তার বাড়িতে থাকবে ততদিন সে সত্য সাক্ষ্য দেবে না, আর তাদের অবৈধ বসবাসেরও পরিসমাপ্তি হবে না। সে কারণেই বর্তমান অবস্থা ও পরিবেশে অনিলার কাছ থেকে সত্য বিবৃতি আশা করা যায় না।

Mamun Academy

উভয় পক্ষের বক্তব্য শুনে ঢাকার এস. ডি. ও. বাহাদুর তেজেন্দ্রের আবেদনের উপরে এই লিখিত আদেশ দিলেন : 'অনিলাকে হক চৌধুরীর বাসা থেকে উদ্ধার করে তাকে ঢাকা সেন্ট্রাল জেলের নিউ-ট্রাল হোমে (Neutral Home) ১৫ দিন রাখা হোক। ১৫দিন পরে ১৬/৩/৬১ তারিখে তাকে আবার এস. ডি. ও. কোর্টে হাজির করে পুনরায় তার বিবৃতি রেকর্ড করা হবে। তখন হয়ত তার কাছ থেকে প্রকৃত ঘটনার সত্য বিবরণ পাওয়া যাবে।'

পুলিশ ওয়ারেন্ট বলে অনিলাকে হক চৌধুরীর বাসা থেকে উদ্ধার করে এনে তাকে ঢাকা সেন্ট্রাল জেলের নিউট্রাল হোমে রাখল।

এস. ডি. ও-র এই আদেশের বিরুদ্ধে 'অনিলা' ওরফে আয়েশার পক্ষ থেকে ঢাকা হাইকোর্টে একটি রীট আবেদন করে প্রার্থনা জানানো হল যে তার আটক আইনসম্মত না হওয়ায় তাকে যেন জেলখানার হোম থেকে অবিলম্বে মুক্তি দেয়া হয়।

হাইকোর্টে দলিল করা সেই আবেদনে অনিলা জানায় যে তার পূর্ব নাম ছিল অনিলা চন্দ। কিন্তু ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার পর তার বর্তমান নাম হয়েছে আয়শা বেগম। পূর্বে সে ছিল হিন্দু, কিন্তু ১৯৬১ সালের জানুয়ারী মাসে সে দিনাজপুরে বসে স্বেচ্ছায় ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে আয়েশা বেগম নাম ধারণ করেছে। এখন তার বয়স ৩০ বৎসর। সে চারটি সন্তানের জননী। পূর্বে সে কলকাতায় তার হিন্দু স্বামীর বাড়িতে থাকত। কিন্তু গত ১৭ই জানুয়ারী সে সম্পূর্ণ স্বেচ্ছায় তার হিন্দু স্বামীর কলকাতাস্থ বাড়ি ত্যাগ করে ঢাকায় চলে এসেছে। এখানে সে তার বান্ধবী মিসেস হামিদা বেগমের সঙ্গে তার লালবাগস্থ বাসায় কিছুদিন বসবাস করেছে।

এমতাবস্থায় সম্পূর্ণ মিথ্যা অভিযোগে গত ৩রা মার্চ তারিখে পুলিশ

Mamun Academy

তাকে অন্যায়ভাবে গ্রেপ্তার করে এনে ঢাকার এস. ডি. ও. কোর্টে হাজির করে। এস. ডি. ও. সাহেব তার জবানবন্দী গ্রহণ করেন। সেখানে আয়েশা পরিষ্কারভাবে তাঁকে জানায় যে সে এখন মুসলমান। সে তার পূর্বের হিন্দু স্বামীর কাছে আর কখনো ফিরে যাবে না। সে কোন দোষ করেনি। তাই তাকে অবিলম্বে ছেড়ে দেয়া হোক।

কিন্তু তবুও তেজেন্দ্রের মিথ্যা অভিযোগে এস. ডি. ও. আয়েশাকে অন্যায়ভাবে দীর্ঘ ১৫ দিন যাবত ঢাকা জেলের নিউট্রাল হোমে আটক থাকবার আদেশ দিয়ে অন্যায়ভাবে তার স্বাধীনতা হরণ করেছেন। তাই সে সুবিচারের প্রার্থনায় হাইকোর্টের শরণাপন্ন হতে বাধ্য হয়েছে, সে অবিলম্বে মুক্তি চায়।

অপর দিকে তেজেন্দ্র নারায়ণের পক্ষ থেকে বলা হয় যে আসামী হক চৌধুরী তার কলুটোস্থ বাসা থেকে তার বিবাহিতা স্ত্রী অনিলাকে ফুসলিয়ে ঢাকায় নিয়ে এসে সে যে অন্যের বিবাহিতা স্ত্রী একথা জেনেও তার সঙ্গে অবৈধ সংসর্গে লিপ্ত হয়েছে ও অন্যায়ভাবে অনিলাকে তার ঢাকাস্থ নিজ বাড়িতে আটকে রেখেছে। অনিলা যতদিন আসামীর প্রভাবাধীনে থাকবে, ততদিন তার কাছ থেকে কোন সত্য বিবৃতি আশা করা যায় না। তাই তার আবেদন অনুসারেই অনিলাকে মাত্র ১৫ দিনের জন্যে নিউট্রাল হোমে এনে রাখা হয়েছে কেবল সত্য সন্ধানের আশায়।

এই রীট আবেদনের শুনানী কালে মাননীয় জাষ্টিস মোর্শেদ ও জাষ্টিস সালাহ উদ্দিন চৌধুরী প্রকৃত ঘটনা জানবার জন্যে উভয় পক্ষের কৌশুলীদের বক্তব্য শোনা ছাড়াও অনিলা ওরফে আয়েশাকে হাইকোর্টে হাজির করিয়ে তার বক্তব্য পেশ করবার আদেশ দেন।

সেখানে এসেও অনিলা অবিচল ভাবে জানায় যে হাইকোর্টে

ইতিপূর্বে সে যে লিখিত বিবৃতি দাখিল করেছে সেটাই সম্পূর্ণ সত্য। সে আরও জানায় যে সে কোন দোষ করেনি। তার বিরুদ্ধে বাদী-পক্ষ থেকেও কোন অভিযোগ উত্থাপন করা হয়নি। সে আর ঢাকা জেলের নিউট্রাল হোমে থাকতে রাজি নয় এবং এখনই মুক্তি পেতে চায়।

এই কেসে মাননীয় জাস্টিস মোর্শেদ তাঁর রায়ে বলেন যে জেলে আটক অনিলার বিরুদ্ধে তার স্বামী তেজেন্দ্র কোন অভিযোগই আনয়ন করেনি। এমন কি এ কথাও কখনও বলা হয়নি যে আসামী হক চৌধুরী অনিলার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাকে আটক করে রেখেছিল। আবার এ রকম কোন অভিযোগও করা হয়নি যে অনিলার স্বাধীন-ভাবে চলাফেরার অধিকারে হক চৌধুরী কোনরূপ হস্তক্ষেপ করেছে। এ হেন অবস্থায় অনিলাকে গ্রেপ্তার করে এনে তাকে জেলে থাকবার আদেশ প্রদান করে ঢাকার ম্যাজিস্ট্রেট (এস. ডি. ও.) আইন মোতাবেক কাজ করেননি, কারণ হক চৌধুরীর বিরুদ্ধে আনীত তেজেন্দ্রের মামলায় অনিলা হল একজন সাক্ষী মাত্র। আর সাক্ষীকে হাজতে আটকে রাখবার কোন আইন এক্ষেত্রে নেই। প্রয়োজন মনে করলে অবশ্যই অনিলাকে যথাসময়ে কোর্টে সাক্ষ্য হিসাবে হাজির করার জন্যে ফৌজদারী আইনের বিধান অনুযায়ে যাবতীয় ব্যবস্থা করতে পারে। কিন্তু আগে থেকেই তার মত একজন সাক্ষীর স্বাধী-নতা ক্ষুণ্ণ করে তাকে জেলে আটকে রাখার কোন অধিকার আইন ফৌজদারী কোর্টকে দেয়নি। আর এছাড়া অনিলা সব সময়ে কোর্টে হাজির হয়ে সাক্ষ্য দিতে প্রস্তুত আছে বলেই মনে হয়।

উপরোক্ত অবস্থায় অনিলার বিরুদ্ধে ওয়ারেন্ট জারী করে তাকে ধরে এনে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে জেলবাসের হুকুম দিয়ে ফৌজদারী

Mamun Academy

কোর্ট আইন অনুযায়ী কাজ করেনি।

অতঃপর মাননীয় বিচারপতিদ্বয় অনিলা ওরফে আয়েশার রীট আবেদন মঞ্জুর করে তাকে তৎক্ষণাৎ জেলের নিউট্রাল হোম থেকে মুক্তি দানের আদেশ প্রদান করেন।

বিবাহ বন্ধনে দণ্ডিত

অবিশ্বাস্য মনে হলেও ঘটনাটি সত্যই ঘটেছিল বগুড়ার অ্যাসিস্টেন্ট সেশন জজের কোর্টে ১৯৬৯ সালের ১৩ই জানুয়ারী। সেই সময়ে দেশের সংবাদপত্রেও ফলাও করে প্রকাশিত হয়েছিল ঐ ঘটনাটি এবং চমকপ্রদ এই বিচার কাহিনী।

আসামী আফতাব উদ্দীনকে সেদিন হাজির করা হয়েছিল বগুড়ার তৎকালীন অ্যাসিস্টেন্ট সেশন জজ এ রাজ্জাক সাহেবের কোর্টে আসামীর কাঠগড়ায়। তার বিরুদ্ধে পাকিস্তান দণ্ড বিধির ৪৯৩ ধারা ভঙ্গের অপরাধে সরকার পক্ষ থেকে অভিযোগ আনা হয়েছিল।

বগুড়া জিলার শিবগঞ্জ থানার বাসিন্দা আফতাব উদ্দীনের অতি নিকট প্রতিবেশী ছিল নূরুন নাহার বেগম নামক এক সুন্দরী অল্পবয়স্কা গ্রাম্য মেয়ে। নূরুন নাহারের যৌবন ও রূপে মুগ্ধ হয়ে পতঙ্গের মত আফতাব তার প্রতি আকৃষ্ট হল। সে তখন নানা ভাবে প্রলোভন দিয়ে সরলপ্রাণা নূরুন নাহারকে প্রভাবান্বিত করার চেষ্টা করতে লাগল। ক্রমে সরলমনা, সংসারে অনভিজ্ঞা নূরুন নাহারও আফতাব উদ্দীনের বাক্‌চাতুর্যে ও প্রলোভনে ভুলে গিয়ে তার কথায় বিশ্বাস স্থাপন করে ফেলল।

Mamun Academy

আফতাব তার সঙ্গে গোপনে দেখা-সাক্ষাৎ করত ও সেই সময়ে প্রায়ই বলত যে তাকে সে বিয়ে করতে চায় ও তাকে জীবন সঙ্গিনী হিসাবে পেলে নিজেকে ধন্য মনে করবে। সেই সঙ্গে তাদের বিবাহোত্তর জীবনের রঙীন দিনগুলোর স্বপ্নও চতুর আফতাব উদ্দীন নূরুন নাহারের সামনে তুলে ধরে। আর মেয়েটিও সরলভাবে তার কথায় বিশ্বাস স্থাপন করে। এই সময়ে আফতাব নাহারকে তার গভীর প্রেম নিবেদন করে পর পর অনেকগুলো চিঠিও লেখে। সেসব পত্রে সে তার প্রণয়ীকে আশ্বাস দেয় যে তাকে বিয়ে করতে পারলে তারা প্রকৃতই সুখী দম্পতি হবে ও নাহারকে সে সত্যিই পরম সুখে রাখবে।

এরপর একদিন আফতাব নূরুন নাহারকে জানাল যে গোপনে তাদের মধ্যে বিয়ে হয়ে গেছে। তাই এখন তারা স্বামী-স্ত্রী। তবে এখনই এই ব্যাপারটি বাইরে জানাজানি হলে আফতাবের পড়াশুনার ক্ষতি হবে, যার ফলে তাদের ভবিষ্যতের সব উচ্চ আশা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হবে। নূরুন নাহারও সেদিন আফতাবের কথা বিশ্বাস করে ধরে নিল যে তাদের বিয়ে সত্যিই হয়ে গেছে।

এরপর থেকে গোপনে তাদের মেলামেশা এমন কি স্বামী-স্ত্রী ভাবে সহবাসও চলতে থাকল। আফতাবের উপদেশ মত নূরুন নাহার তার পিতার বাড়িতে থেকে আফতাবকে তার স্বামী হিসাবে গ্রহণ করে তার সমস্ত লালসার ইন্ধন যোগাতে লাগল। আফতাব ছিল সেবার ম্যাট্রিক পরীক্ষার্থী। এই বিয়ের কোন অনুষ্ঠান করলে বা ব্যাপারটা জানাজানি হলে আফতাবের পরীক্ষার সত্যিই ক্ষতি হবে বুঝতে পেরে নূরুন নাহারও তখন চুপচাপ রইল, তবে সেই সঙ্গে আফতাবকে সে তার স্বামীর মর্যাদা ও অধিকার দিয়ে চলল।

কয়েক মাসের মধ্যেই তারা উভয়ে বুঝতে পারল যে নূরুন নাহার

অন্তঃসত্ত্বা—সে মা হতে চলেছে। এখন কি হবে? দুজনেই পড়ল মহা চিন্তায়। বিশেষ ভাবে আফতাব ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে অস্থির হয়ে উঠল। প্রকৃতপক্ষে সে চেয়েছিল নুরুন নাহারের সঙ্গে মাত্র কিছুদিন ফুর্তি করে পরীক্ষার পরে শহরে পালিয়ে বাঁচবে। কিন্তু পরীক্ষার আগেই আবার এ কি ফ্যাসাদ এসে হাজির হল? সে এই বিপদ থেকে পরিত্রাণ পাবার পথ খুঁজতে লাগল। চিন্তা করে দেখল যে এখন মাত্র একটিই উপায় আছে—অবশ্য যদি নাহার তাতে রাজি থাকে; তা হল এখনই নাহারের পেটের অনাগত সন্তান নষ্ট করে ফেলা।

নাহারকে সে অনেক বুঝাবার চেষ্টা করল এই সোজা পথটি বেছে নেবার জন্যে। কিন্তু নুরুন নাহার তা শুনেই আঁতকে উঠল। উত্তরে সে পরিষ্কার জানাল যে আফতাবের কথামত তার উপর বিশ্বাস করে সে তাকেই স্বামী বলে জেনেছে। আর তাদের মধ্যে প্রকৃত বিয়েও হয়ে গেছে। তাই সন্তানের আগমনে তাদের শঙ্কিত বা ভীত হবার কি আছে? বরং এখন বিষয়টি তাদের প্রিয় বাপ-মা, আত্মীয় স্বজনকে জানালেই ভাল হয়।

কিন্তু আফতাব কিছুতেই তাতে রাজি হল না, সে বলল, দুজনের এই বয়সে ও এই অবস্থায় বাচ্চার আগমন তাদের ভবিষ্যৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন করে দেবে। অনেক চেষ্টা করেও সে নাহারকে বাচ্চা নষ্ট করাতে রাজি করতে পারল না। সে যে নারী! এ কি সে কখনও হতে দিতে পারে?

যতই দিন যেতে লাগল আফতাব ততই অস্থির হয়ে উঠল তাদের কেলেঙ্কারি জানাজানি হয়ে যাবার ভয়ে। একদিন সে মরিয়া হয়ে নাহারকে কাছে ডেকে এনে জোর করে গর্ভপাতের ঔষধ খাওয়াবার

Murun Academy

চেষ্টা করল, কিন্তু নাহার টের পেয়ে তাতে বাধা দিল ও ঘৃণা ভরে সেই ঔষধ প্রত্যাখ্যান করল।

এরপর থেকে আফতাব নূরন নাহারের সঙ্গ এড়িয়ে চলতে শুরু করল। এমন কি ক্রমে ক্রমে সে নাহারের কাছে যাওয়াও বন্ধ করে দিল। অসহায় নূরুন নাহার ঘাবড়ে গেল আফতাবের এই পরিবর্তনে। অবশেষে মরিয়া হয়ে নূরুন নাহার একদিন তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করল তার প্রকৃত মনোভাব জানার উদ্দেশ্যে। এবার কিন্তু আফতাব সম্পূর্ণ ভিন্ন মূর্তি ধারণ করে নাহারকে সোজা বলে বসল যে সে তার বিবাহিত স্ত্রী নয়। এমন কি নাহারের পেটের বাচ্চার পিতৃত্বের দায়িত্ব নিতেও আফতাব সোজাসুজি অস্বীকার করে বসল।

প্রাণপ্রিয় আফতাবের মুখ থেকে আজ এই কথা শুনে নূরুন-নাহার যেন আকাশ থেকে পড়ল। মানুষ যে এরকম বিশ্বাসঘাতক হতে পারে তা সে ইতিপূর্বে কখনও কল্পনাও করতে পারেনি! এখন সে করবে কি? কিভাবে সে সমাজে মুখ দেখাবে? সে যে একজন পরিত্যক্তা অসহায়া নারী!

অনেক চেষ্টা করেও সে আফতাবের মনোভাব বদলাতে পারল না। তাই শেষ পর্যন্ত মাত্র দুইটি পথ খোলা রইল নাহারের সামনে: আত্মহত্যা করা অথবা মরিয়া হয়ে লড়ে যাওয়া। অনেক চিন্তা করে সে দ্বিতীয় পথ অনুসরণ করাই সাব্যস্ত করল।

তার নিজের ও পেটের সন্তানের ভবিষ্যৎ চিন্তা করে সে ঠিক করল যে সত্য পথে থেকে, জীবনের এই কঠোর সংগ্রামে সে শেষ পর্যন্ত লড়ে যাবে।

এবার সে আফতাবকে সোজা বলল যে সামাজিক আচার অনুসারে তাকে বিয়ে করতে হবে এবং এ ব্যাপারে আর দেরি করা যায়

না। কিন্তু আফতাবকে সে কিছুতেই রাজি করাতে পারল না।

এখন কি করা? দুর্বল সে, তার উপরে আফতাবের মিথ্যা প্রলোভনে পড়ে আজ সে সর্বস্বান্ত। অবলার সর্বশেষ গতি রইল আইনের আশ্রয় নেয়া। অবশেষে নুরুন নাহার মাতা-পিতার কাছে সব খুলে বলল, এই দুর্দিনে তারাই তার একমাত্র সহায়।

শেষ পর্যন্ত তাদের সহায়তায় নুরুন নাহার এক ফৌজদারী মোকদ্দমা দায়ের করল আফতাবের বিরুদ্ধে। ফৌজদারী দণ্ডবিধির ৪৯৩ ধারামতে সে অভিযোগ করল যে আসামী আফতাব তাকে প্রতারণা করে, নিজেকে তার স্বামী বলে পরিচয় দিয়ে তাকে তার সঙ্গে স্বামী-স্ত্রী রূপে বসবাস করতে বাধ্য করেছে। পরে বাদিনী অন্তঃসত্ত্বা হলে তাকে ত্যাগ করে আরও বেশি প্রতারণা করেছে।

এই মোকদ্দমায় সাক্ষী প্রমাণ নিয়ে প্রাথমিক তদন্তের পর প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ টি. আহম্মদ. আসামীকে বিচারের জন্যে দায়রায় সোপর্দ করেন। বিচারে দোষী সাব্যস্ত হলে আসামী আফতাবের সর্বাধিক ১০ বৎসর পর্যন্ত সশ্রম কারাদণ্ড ও সেই সঙ্গে জরিমানাও হতে পারত।

অতঃপর ১৫ই জানুয়ারী সহকারী সেশন জজ এ. রাজ্জাক সাহেবের কোর্টে এই মামলার বিচার শুরু হয়। তখন বিবাদমান উভয় পক্ষের মধ্যেই প্রবল উত্তেজনা বিরাজ করছিল।

উভয় পক্ষের বিবরণ শুনে জজ সাহেবও বোধহয় বিচলিত হয়ে উঠলেন। তিনি দেখলেন, এক্ষেত্রে যে কেবল আইনের বিচার ও শাস্তির প্রশ্নই জড়িত, তা নয়, এর সঙ্গে গভীরভাবে জড়িত রয়েছে একটি গুরুত্বপূর্ণ মানবিক দিক। তিনটি সুন্দর জীবনের ভবিষ্যৎ একান্তভাবে জড়িত এই মামলার সঙ্গে। তাদের মধ্যে একজন আবার এখনও

Mamun Academy

অনাগত শিশু, যে হয়ত ভূমিষ্ঠ হয়েই দেখবে যে কি ভয়ানক অভিশাপ নিয়েই সে জন্মেছে এই সুন্দর পৃথিবীতে।

পরিস্থিতির এই দিকটি চিন্তা করে জজ সাহেব গভীর ভাবে ভাবতে লাগলেন এর সমাধানের উপায়। হঠাৎ তাঁর মনে যেন একটি ক্ষীণ আশা দেখা দিল। তিনি উভয় পক্ষের কাছেই প্রশ্ন করে বসলেন, এই মামলায় উভয় পক্ষেরই জয়ী হয়ে বা হেরে গিয়ে সত্যিকারের কি কোন লাভ-লোকশান হবে? তার কি কোন স্থায়ী সমাধান তাতে লাভ করবে? তারচেয়ে তাদের পক্ষে কি এখনও একে অপরকে স্বামী-স্ত্রী রূপে গ্রহণ করা সম্ভব নয়? যদি তারা এখনও এই প্রস্তাবে রাজি হয়ে নিজেদের জীবনকে আবার সুখে ভরপুর করে তুলতে চায় তবে তিনিও (জজ সাহেব) খুব খুশি হবেন এবং এর আইনগত অসুবিধা তিনি দূর করতে চেষ্টা করবেন।

মাননীয় জজ সাহেবের এই আবেদনে হঠাৎ যেন উভয় পক্ষের মনের দরজার অন্তর্নিহিত বন্ধ কপাট খুলে গেল। আসামী আফতাব ও বাদী নূরুন নাহারের মনের পর্দায় তৎক্ষণাৎ ছবির মত ভেসে উঠল অতীতের সেই সুখের দিনগুলো। নূরুন নাহার ভাবল, কি হবে আসামীকে জেলে পাঠিয়ে? সে কি শান্তি পাবে তাতে? যাকে সে একদিন সত্যিকার স্বামী হিসাবে গ্রহণ করে নারীর দেহ-মন সর্বস্ব উজাড় করে বিলিয়ে দিয়েছিল, তাকে কারাগারের লৌহ কপাটের অন্তরালে পাঠিয়ে তার কি লাভ হবে? আর কি পরিচয়ই বা সে দেবে তার অনাগত প্রিয় সন্তানের যাকে সে তিলে তিলে গড়ে তুলছে নিজের রক্ত মাংস দিয়ে? সমাজ ত তাকে গ্রহণ করবে না!

এ সব চিন্তা করে নূরুন নাহার নিজের পক্ষ থেকে সানন্দে রাজি হয়ে গেল মাননীয় জজ সাহেবের প্রস্তাবে। সেই সঙ্গে সে কোর্টকে

Mamun Academy

জানাল তার অশেষ কৃতজ্ঞতা।

আর আফতাব? সে ত জেলের দুয়ারে পা বাড়িয়েই আছে। নিজের অতীত কর্মের জন্যে আজ সে সত্যিই অনুতপ্ত। সবাই জেনে গেছে যে সে বিশ্বাসঘাতক। একটি সরল, সুন্দরী, কিশোরী মেয়ের সর্বস্ব লুট করে নিয়ে সে শেষ পর্যন্ত চরম বিশ্বাসঘাতকতা করেছে তার সঙ্গে। এই পথ থেকে ফিরে গিয়ে আবার যে সে সুখী-সুন্দর জীবন যাপন করতে পারবে এমন কথা ত এতদিন সে একবারও ভাবতে পারেনি। এখন এই শেষ সুযোগ ছেড়ে দিলে দ্বিতীয় বার ত তা আর ফিরে আসবে না।

আসামীর কাঠগড়া থেকে আফতাব আর একবার তাকাল নূরুন-নাহারের দিকে। দেখল তার দৃষ্টিও আফতাবের দিকেই নিবদ্ধ। সমস্ত মন-প্রাণ দিয়ে যেন নাহার মিনতি করে বলছে, রাজি হয়ে যাও। চল, আমরা আবার ফিরে যাই সেই নিভৃত পল্লীর সুখী জীবনে। মামলা, কোর্ট, আইন-আদালত এ-সব আর ভাল লাগছে না। আমরা নতুনভাবে জীবন শুরু করি আবার।

আফতাবও এবার রাজি হয়ে গেল জজ সাহেবের প্রস্তাবে। সে নাহারকে তার স্ত্রী হিসাবে গ্রহণ করে বাড়ি ফিরে যেতে চাইল।

দুজনের এই উত্তর শুনে কোর্টের সকলের মধ্যে মৃদু উৎসাহের গুঞ্জন শোনা গেল। আর সেই সঙ্গে সাফল্যের হাসি ফুটে উঠল জজ সাহেবের মুখে। এতদিন কেবল চার দেয়ালের ভিতরে আটকা থেকে, উকিল, সাক্ষী ও আইনের বাঁধাধরা বেড়া জালের আওতায় তাঁকে জেল, জরিমানা বা খালাস গম্ভীর মুখে এই সব রায়ই দিয়ে এজলাস থেকে নেমে আসতে হয়েছে। কিন্তু আজ তিনি সত্যিকারের একটি সমাজ সেবার কাজ করার সুযোগ পেয়ে নিজেকে ধন্য

মনে করলেন। মনে হল আজই বুঝি প্রথম তিনি বিবাদমান পক্ষের সত্যিকারের কোন স্থায়ী উপকার করতে পারলেন। এই ভেবে বিরাট প্রশান্তি লাভ করলেন তিনি মনে।

ছেলেমেয়ের বাবা-মায়েরা ও তাদের শুভাকাঙ্ক্ষী সবাই যেন এই প্রস্তাবে হাতে চাঁদ পেল। তারাও সবাই সানন্দে রাজি হয়ে গেল এই আপোষ ব্যবস্থায়।

কিন্তু ফুলেও যে কাঁটা থাকে। এই মামলার সুযোগ নিয়ে গ্রামে ও কোর্টে উভয় পক্ষের সাঙ্গপাঙ্গরা, যারা এতদিন উভয় পক্ষকে সর্বস্বান্ত করে অজস্র টাকা চুষছিল তাদের কাছ থেকে, আবার সেই সঙ্গে গ্রামের দলাদলিও বেশ মাথা চাড়া দিয়ে উঠছিল যা থেকে লাভবান হচ্ছিল কেবল ছোট বড় তথাকথিত মাতব্বরেরা—এই মিট-মাটের প্রস্তাব কিন্তু তাদের ঠিক মনঃপুত হল না। মামলা চললেই তাদের লাভ, আর শেষ হয়ে গেলে তাদের নেতৃত্বে ভাটা পড়বে। এবার তাদের কেউ কেউ প্রস্তাব দিল যে উভয় পক্ষ সময় নিয়ে গ্রামে ফিরে যাক। তারপর সেখানে দিনক্ষণ দেখে ছেলেমেয়ের বিয়ে সমাধা হবে।

কিন্তু অভিজ্ঞ জজ সাহেব বুঝতে পারলেন যে এই অবস্থায় যদি এদের ছেড়ে দেয়া হয় তবে গ্রামে গিয়ে মন্দ লোকের কুপরামর্শে ও গ্রাম্য দলাদলির চক্রে পড়ে এদের বিয়ে আর না-ও হতে পারে। তাই সেই ঝুঁকি নেয়া চলবে না। তিনি এবার দৃঢ়ভাবে জানালেন যে উভয় পক্ষই যখন রাজি, তখন বাদী বিবাদীর বিয়ে এখনই কোর্টের মধ্যে সকলের সামনে সুসম্পন্ন করতে হবে। আর তা হলেই কেবল মাত্র তিনি মামলা উঠিয়ে নেয়ার প্রস্তাবে রাজি হতে পারেন —অন্যথায় নয়।

জজ সাহেব যেন আফতাব-নাহারের ঠিক মনের কথারই প্রতিধ্বনি তুললেন। তারা জানত যে আগেও গ্রামে সালিশের চেষ্টা কয়েকবারই করা হয়েছিল কিন্তু দলাদলির কারণে তা শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়। আজ এখান থেকে সময় নিয়ে চলে গেলে আগের ঘটনারই আবার পুনরাবৃত্তি হবে। আজ কিন্তু জজ সাহেবের এই দৃঢ়তা দেখে দুষ্ট ও স্বার্থান্বেষী লোকেরা প্রমাদ গুণল। তাদের হীন প্রচেষ্টা সফল হতে পারল না। শেষ পর্যন্ত উভয় পক্ষ সেখানেই বসে ছেলে-মেয়ের বিবাহ কার্য সমাধা করতে রাজি হল।

এরপর বাদীপক্ষ কোর্টের কাছে দরখাস্ত দাখিল করল মামলা উঠিয়ে নেয়ার প্রার্থনা জানিয়ে। সরকারী উকিল মিঃ এম. এ. রহিম এই ব্যাপারে সক্রিয় সমর্থন ও চেষ্টা চালিয়ে আইনগত অসুবিধাগুলো দূর করতে সাহায্য করলেন। সেই সঙ্গে তিনি উভয় পক্ষকে জানালেন তাঁর আন্তরিক শুভেচ্ছা।

অতঃপর জজ সাহেব আইনগত দিকটি সমাধা করে উভয় পক্ষের আবেদন মঞ্জুর করে মামলা উঠিয়ে নিতে অনুমতি দিলেন এবং উভয় পক্ষকে মৌখিক আদেশ দিলেন তৎক্ষণাৎ বিবাহকার্য সমাধা করতে।

কোর্টের সাধারণ গম্ভীর পরিবেশ সেদিন সহসা যেন যাদুস্পর্শে এক নতুন রূপ ধারণ করল। সবার মধ্যে তখন উৎসবের সাড়া। ম্যারেজ রেজিস্ট্রারকেও সেখানেই ডাকা হল। আসামীর কাঠগড়া থেকে নেমে আফতাব বরবেশে এসে দাঁড়াল নূরুন নাহারের পাশে। উভয়ের মুখেই ফুটে উঠল স্বর্গীয় জ্যোতি। ক্ষণিকের মধ্যে যেন স্বপ্নের মত কোথা থেকে কি হয়ে গেল। যেন বিশ্বাসই করতে পারছে না তারা কেউ।

সেদিন কোর্টরুমে বসেই বিচারক, উভয় পক্ষের আত্মীয়-স্বজন,

উকিল-সাক্ষির সামনে কাজী শুভ-বিবাহ কার্য সমাধা করলেন। সবাই হাত তুলে দোয়া করল রহমানুর রাহিমের দরবারে ওদের সুখ-শান্তির জন্যে। কোর্টেই সবাইকে মিষ্টান্ন বিতরণ করা হল অনুষ্ঠান শেষে। আর জজ সাহেবই হলেন অনুষ্ঠানের মধ্যমণি, বর-কনে উভয়েরই যেন পিতা-মাতাতিনি।

অনুষ্ঠান শেষে বর-বধূ যখন কোর্ট থেকে বেরিয়ে এল তখন সেখানে বেশ ভিড় জমে গেছে। সবাই এসে তাদের অভিনন্দন জানাল আন্তরিকভাবে। পান খেতে খেতেও অনেকেই হাত তুলে মোনাজাত করল ওদের জন্যে। দেখতে দেখতে সমস্ত শহরে ছড়িয়ে গেল এই অভিনব বিয়ের বার্তা। চারদিকে যেন একটা উৎসবের সাড়া পড়ে গেল। যে পথ ধরে বর-বধূ এগুতে লাগল সে পথেই ভিড় জমে গেল। সবাই আনন্দে অভিনন্দন জানাল নব-দম্পতিকে।

এই ভাবেই আসামী আফতাব সেদিন জেলের দুয়ারে পা রাখতে গিয়েও পা রাখল শান্তির দুয়ারে। সুন্দরী নব বধূকে লাভ করে তারই হাত ধরে বাড়ির দিকে সাড়ম্বরে মিছিল করে রওনা হল। বিচারে তার সাজা বিয়ে এবং সুন্দরী বধূ লাভ।

বর-বধূ উভয়ের মুখই তখন আনন্দে উদ্ভাসিত।

১৩ই জানুয়ারীর ওই দিনটি কি তারা কোনদিন ভুলতে পারবে?

Mamun Academy

জুরীর বিচার

এক

জুরীর বিচার এখন আর আমাদের দেশে নেই। জুরীদের মধ্যে উৎকোচ গ্রহণের প্রবণতা আশঙ্কাজনক ভাবে বৃদ্ধি পাওয়ায়, বিচারের এই সুপ্রাচীন সুন্দর প্রথাটি বর্তমানে আমাদের দেশ থেকে বাধ্য হয়ে উঠিয়ে দেয়া হয়েছে। কিন্তু ইংল্যাণ্ড, আমেরিকা এমন কি আমাদের খুবই নিকট দেশ সিংহলেও এই প্রথার বিলোপ সাধনের কথা সেখানকার জনসাধারণ চিন্তাও করতে পারে না।

১৯৬২ সালের জানুয়ারী মাসে সিংহলের প্রধান মন্ত্রী ও সেই সময়কার পৃথিবীর একমাত্র মহিলা প্রধান মন্ত্রী মিসেস সলোমান বন্দরনায়কের সরকারের বিরুদ্ধে এক গোপন সামরিক অভ্যুত্থানের ষড়যন্ত্র শেষ মুহূর্তে ফাঁস হয়ে যায় ও ফলে তা ব্যর্থ হয়। সেই সময়ে সিংহলের সর্বত্র খ্রীস্টান ক্যাথলিক চার্চ দ্বারা বহু স্কুল পরিচালিত হত। সেই সব স্কুলে ইংরেজীর মাধ্যমে শিক্ষা দেয়া হত, আর সেই সংগে খ্রীস্টান ধর্মের মাহাত্ম্যও ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে প্রচার করা হত। সিংহলের সংখ্যা-গুরু বৌদ্ধ-ধর্মাবলম্বী লোকদের কাছে এটা খুবই আপত্তিজনক ছিল। কিন্তু ইতিপূর্বে কোন সরকারই এই সব প্রাচীন মিশনারী স্কুলের কাজে হস্তক্ষেপ করতে সাহস করেনি, কারণ ক্যাথলিকরা সিংহলে দ্বিতীয় সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়। আর তাছাড়া তারা শিক্ষা, দীক্ষা ও সম্পদে বৌদ্ধদের চেয়ে অনেক বেশি অগ্রসর

ছিল।

কিন্তু মিসেস বন্দরনায়কের সরকার তাঁর পার্টির নির্বাচনী ওয়াদা অনুযায়ী ওই সব ক্যাথলিক পরিচালিত স্কুল-কলেজ সরকারী নিয়ন্ত্রণে নিয়ে এসে সেখান থেকে খ্রীস্টান ধর্মীয় শিক্ষা উঠিয়ে দিলেন আর সেই সংগে সিংহলী ভাষাকেই সে সব স্কুলের শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করার আদেশ প্রদান করেন।

যুগ যুগ ধরে পরিচালিত এই সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উপর হঠাৎ এই সরকারী হস্তক্ষেপ খ্রীস্টান সম্প্রদায়ের কাছে অসহনীয় বলে মনে হল। কিন্তু পার্লামেন্টে তারা সংখ্যালঘু, তাই তাদের আইনগত বাধা পার্লামেন্টের সংখ্যাগুরু ভোটে বাতিল হয়ে গেল। এর পরেই চলল গোপন অভ্যুত্থানের মাধ্যমে সরকার উৎখাতের ষড়যন্ত্র। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেই ষড়যন্ত্র ধরা পড়ে গেল। দেখা গেল যে সেই ষড়যন্ত্রের পিছনে ছিল সিংহলের প্রধান প্রধান সামরিক ও বেসামরিক খ্রীস্টানেরা, বিশেষ করে রোমান ক্যাথলিক কর্মচারীরা। আর সেই ষড়যন্ত্রের প্রধান নেতা ছিলেন রয়াল সিংহল নৌবাহিনীর ভূতপূর্ব কমাণ্ডার ইন-চীফ্, রিয়ার অ্যাডমিরাল রয়াল-ডি-মেলো। ইনিও ছিলেন একজন গোঁড়া রোমান ক্যাথলিক।

আদালতে এইসব ষড়যন্ত্রকারীদের বিচারের সময়ে মিসেস বন্দরনায়কের সরকার জুরীদের দ্বারা এদের বিচারের বিরোধিতা করলেন এই কারণে যে, দেশের আইন অনুযায়ী এইসব আসামীরা এই মামলার বিচারে ইংরেজী ভাষাভাষী জুরী নিযুক্তির দাবি করতে পারত, কেননা আসামীরা প্রায় সবাই ছিল ইংরেজী জানা ও সিংহলী ভাষায় অনভিজ্ঞ। সরকার পক্ষ মনে করল যে ইংরেজী ভাষাভাষী জুরীরা আসামীদের প্রতি পক্ষপাতিত্ব করতে পারে কারণ তারাও

স্বভাবতঃই স্কুল থেকে ইংরেজী মাধ্যম উঠাবার বিরোধী ছিল।

এই কারণে মিসেস বন্দরনায়ক সরকার খুব তাড়াহুড়া করে পার্লামেন্টে একটি আইন পাশ করে নিল যার বলে কেবলমাত্র ওই মামলাটির জন্যে জুরীর বিচার সাময়িকভাবে উঠিয়ে দেয়া হল। অতঃপর জুরীর বদলে তিনজন বিচারপতির সমন্বয়ে গঠিত একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন আদালত বিচার শেষে তাঁদের রায়ে মোট ২৪ জন আসামীর মধ্যে ১২ জনকে দোষী সাব্যস্ত করে ১৯৬৩ সালের ১০ই জানুয়ারী প্রত্যেককে ১০ বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করল।

আসামীগণ শেষ পর্যন্ত ইংল্যাণ্ডের প্রিভি কাউন্সিলে ওই রায়ের বিরুদ্ধে আপীল দায়ের করেন। এখানে বলে রাখা দরকার যে তখনও সিংহলের সর্বোচ্চ আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে প্রিভি কাউন্সিলে আপীল করা যেত।

১৯৬৫ সালের ডিসেম্বর মাসে এই মামলার আপীলের শুনানী শুরু হল, শেষ পর্যন্ত বিচারে প্রিভি কাউন্সিল আসামীদের সাজা বেআইনী বলে ঘোষণা করে আসামীদের মুক্তির আদেশ প্রদান করল, প্রিভি কাউন্সিলের সেই সিদ্ধান্তের প্রধান যুক্তি ছিল যে মিসেস বন্দরনায়কের সরকার বিশেষ উদ্দেশ্যে কেবলমাত্র এই মামলার বিচারের জন্যেই খুব তাড়াহুড়া করে আইন পাশ করে এই মামলায় জুরীর বিচার উঠিয়ে দিয়ে আসামীদের (যারা সবাই সিংহলী নাগরিক) এক বিশেষ প্রাচীন নাগরিক অধিকার হরণ করেছে। তাই উক্ত বিচার ঠিক আইন অনুযায়ী সমাধা করা হয়নি।

সিংহলী জনসাধারণ কিন্তু সেদিন আইনের শাসনের এই জয়কে অভিনন্দন জানিয়েছিল। সরকারও এই রায় মেনে নিয়ে আসামীদের মুক্তি দেয়।

Mamun Academy

এরপর সিংহলে পুনরায় এক সামরিক অভ্যুত্থানের ব্যর্থ চেষ্টা করা হয় ১৯৬৬ সালের প্রথম দিকে তৎকালীন প্রধান-মন্ত্রী মিঃ ডাডলী সেনানায়কের সরকারের বিরুদ্ধে। এই ষড়যন্ত্রের কথাও শেষ মুহূর্তে ফাঁস হয়ে যায় আর এতে সিংহলের ভূতপূর্ব প্রধান সেনাপতি ইংলণ্ডে শিক্ষা প্রাপ্ত মেজের জেনারেল রিচার্ড উডুগামাসহ ২৮ জন ব্যক্তির বিচার হয় দেশের সরকার ও রাণীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণার অপরাধের অভিযোগে। এই মামলার সব আসামীরাই কিন্তু ছিল সিংহলী ভাষাভাষী গোঁড়া বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী। এরা সবাই ছিল সেনাবাহিনীর সার্জেন্ট, কর্পোরাল ও সাধারণ সৈনিক। ডাডলী সেনানায়কের সরকারের বিরুদ্ধে এদের অভিযোগ ছিল যে তিনি তামিল ভাষাভাষী ভারতীয় বংশোদ্ভূত, যাদের মধ্যে অনেকেই ছিল হিন্দু, তাদের বিশেষ কতগুলো সুবিধা প্রদান করেন। তারা বিশেষভাবে সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষেপে উঠল যখন সেনানায়ক সরকার সংখ্যালঘু লোকের ব্যবহৃত তামিল ভাষাকেও সরকারী ভাষা হিসাবে ব্যবহারের বিশেষ মর্যাদা প্রদান করল। সিংহলীদের কাছে এ ছিল অসহ্য, তাই শুরু হয় সরকার উৎখাতের ষড়যন্ত্র যা শেষ পর্যন্ত বিফল হয়।

দেশের আইন অনুযায়ী এবার এদের বিচারের সময় আসামীরা স্বাভাবিকভাবেই সিংহলী ভাষা জানা জুরী গ্রহণের দাবি জানাল। এইসব জুরীরা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী লোক হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি ছিল। কিন্তু সরকার এই বিচারে সিংহলী ভাষাভাষী বৌদ্ধ জুরী গ্রহণের বিরুদ্ধে প্রবল আপত্তি জানালএই কারণে যে এই সব জুরীরা স্বভাবতঃই আসামীদের পক্ষে সহানুভূতিশীল হবে যার ফলে তাদের রায় ভাষা ও ধর্মের কারণে প্রভাবান্বিত হতে পারে। তাই সরকার পক্ষ এই

বিচারে ইংরেজী ভাষাভাষী জুরী গঠনের দাবি জানাল।

কিন্তু সিংহলের তৎকালীন প্রধান বিচারপতি মিঃ ফার্নাণ্ডো (Mr. H. N. G Fernando) সরকার পক্ষের দাবি প্রত্যাখ্যান করলেন এই কারণে যে ওই সব আসামীদের তাদের বহু পুরাতন এক নাগরিক অধিকার ও আইনের শাসন থেকে অন্যায়ভাবে বঞ্চিত করা চলবে না।

মোট ৩৭ দিন ধরে এই মামলার বিচার চলে। সাক্ষ্য-প্রমাণ শেষে বিচারপতি জুরীদের সতর্ক করে বলে দিলেন যে সরকার পক্ষ ২৮ জন আসামীর প্রত্যেকের বিরুদ্ধে সন্দেহাতীত ভাবে অভিযোগ প্রমাণ করতে ব্যর্থ হয়েছে মনে হলে আসামীরা খালাস পাবার অধিকারী। শেষ পর্যন্ত জুরীরা একমত হয়ে সমস্ত আসামীদেরই নির্দোষ বলে ঘোষণা করে।

আগের মামলার মত এই মামলার রায়কেও কিন্তু সিংহলী নাগরিকেরা অভিনন্দন জানাল এই কারণে যে এর দ্বারা দেশে জুরীর বিচার ও আইনের শাসনই সুপ্রতিষ্ঠিত হল।

দুই

এই প্রসঙ্গে আমেরিকার জুরীর বিচারের আর একটি চমকপ্রদ কাহিনী না বলে পারছি না :

বিচারালয়ে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে আছে একজন যুবক আসামী। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ যে সে একজন অনিন্দ্য সুন্দরী মেয়েকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করেছে। কিন্তু যুবতীর লাশ আসামী এমনভাবে গুম্ করে ফেলেছে যে পুলিশ বহু চেষ্টা করেও মেয়েটির মৃত দেহের কোন হদিসই করতে পারেনি। কিন্তু তা সত্ত্বেও ওই হত্যা-

কাহিনীর এত প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সাক্ষ্য প্রমাণ ছিল যে তা দ্বারা কোর্টে আসামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। বিচারের সময় এত প্রবল ও সুদৃঢ় সাক্ষ্য পাওয়া গিয়েছিল ওই যুবক আসামীর বিরুদ্ধে যে মামলার শেষে বোঝা গেল, তার আর নিস্তার নেই।

তবুও শেষ চেষ্টা হিসাবে আসামী-পক্ষের অভিজ্ঞ উকিল জুরীকে এই কথাই বার বার বোঝাতে চেষ্টা করছিল যে এই মামলায় সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ আছে— একমাত্র এই কারণে যে বহু চেষ্টার পরেও তথাকথিত মৃত মেয়েটির লাশ খুঁজে পাওয়া যায়নি। সুতরাং এ-ও হতে পারে যে মেয়েটি সত্যিই মরেনি, সে হয়ত এখনও জীবিতই আছে। আসামীকে সাজা দেবার জন্যেই মেয়েটিকে সাবধানে সংগোপনে লুকিয়ে রাখা হয়েছে। পরে আবার যথা সময়ে সে আত্ম-প্রকাশ করবে। এ অবস্থায় যদি আসামীর সাজা হয় ও পরে মেয়েটিকে জীবিত পাওয়া যায় তবে নিশ্চয়ই একটি মারাত্মক দুঃখ-জনক বিচার বিভ্রাট ঘটবে আর সেজন্যে আল্লাহ ও দেশের কাছে দায়ী থাকবেন জুরীরা।

কিন্তু আসামী পক্ষের উকিলের এই সুনিপুণ সওয়াল জবাবের পরও জুরীরা তার যুক্তি-তর্ক মানতে চাইলেন না। এই কারণে যে, আসামীর বিরুদ্ধে ভুরি ভুরি সাক্ষ্য প্রমাণ পাওয়া গেছে।

জুরীদের এই অনমনীয় মনোভাব দেখে শেষ পর্যন্ত আসামীর উকিল এক নতুন মতলব আঁটলেন। তিনি হঠাৎ নাটকীয় ভঙ্গিতে কোর্টের দরজার দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে সেদিকে আঙ্গুল নির্দেশ করে বলে উঠলেন, 'এই চেয়ে দেখুন সবাই, তথাকথিত সেই মৃত মেয়েটি স্বয়ং এদিকে আসছে।'

এই কথা শুনে সমস্ত জুরী, বিচারক এবং কোর্টের ভিতরের

প্রায় সকলেই তৎক্ষণাৎ দরজার দিকে ফিরে তাকাল উৎসুক দৃষ্টি মেলে। কিন্তু কোন মেয়েকেই সেইদিকে দেখা গেল না।

সঙ্গে সঙ্গে সুনিপুণ ভঙ্গিতে আসামী পক্ষের উকিল বলে উঠলেন 'দেখলেন ত, আমার কথা শুনে আপনারা সবাই একসঙ্গে দরজার দিকে তাকালেন—দেখতে যে মেয়েটি সত্যিই এদিকে আসছে কিনা। তাহলে আপনাদের সবার মনে এখনও সন্দেহ রয়েছে যে মেয়েটি হয়ত এখনও বেঁচে আছে। আসামীর অপরাধ সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশের এর চেয়ে ভাল প্রমাণ কি আর হতে পারে? তাই আমার অনুরোধ এই সন্দেহের অবকাশেই আমার আসামী খালাস পাবার যোগ্য।'

কিন্তু এর পরেও যখন সমস্ত জুরীগণ একমত হয়ে আসামীকে খুনের অপরাধে দোষী বলে ঘোষণা করলেন তখন সেই উকিল উঠে আবার নিবেদন করল, 'কিন্তু আপনারা ত সকলেই মেয়েটি সত্যই খুন হয়েছে কিনা সেই সন্দেহে আমার উক্তিতে বিশ্বাস করে দরজার দিকে তাকিয়েছিলেন। তাহলে সত্যিই কি সন্দেহের অবকাশ এখানে ছিল না?'

উত্তরে জুরীগণের 'ফোরম্যান' ধীরে ধীরে বললেন, 'হ্যাঁ আমরা সবাই ওদিকে তাকিয়েছি সেটা ঠিক। কিন্তু আমি সেই সঙ্গে তীক্ষ্ণ-ভাবে এ-ও লক্ষ্য করেছি যে আপনার আসামী তখন দরজার দিকে মোটেও তাকায়নি মেয়েটির আগমনের অপেক্ষায়। আর এর কারণ সে তার অন্তরের অন্তঃস্থল থেকেই জানত যে মেয়েটি আর কোনদিন ফিরবার নয়, কেননা সে আগেই তাকে পৃথিবী থেকে চিরতরে সরিয়ে দিয়েছে।'

Mamun Academy

বিদেশিনীর ফরিয়াদ

Mamun Academy

ঘটনাটি সেবার পশ্চিম পাকিস্তানে এক মহা আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল, কারণ এই পাশবিক অত্যাচারের সঙ্গে জড়িত ছিল এক-জন উচ্চ শিক্ষিত প্রথম শ্রেণীর সরকারী কর্মচারী।

১৯৬০ সালের ২৪শে মে রেহ্‌ড়ী রেল স্টেশনের নিকটে লাহোরগামী প্রধান সড়কের উপরে এসে দাঁড়াল ২০ বৎসরের এক স্বাস্থ্যবতী যুবতী বিদেশিনী পর্যটক। সুন্দরী এই তরুণীর নাম মিস টেরিয়াস ক্যাথারিন।

তখন বিকাল ৩টা। হাতে একটি সুটকেস ও ঘাড়ে ঝুলানো একটি ব্যাগ নিয়ে সে বড় রাস্তার পাশে এসে দাঁড়াল লাহোরগামী কোন যানবাহন পাবার আশায়।

মিনিট দশেক পরে চলমান একটি জীপ গাড়ি এসে দাঁড়াল তার সামনে মিস ক্যাথারিনের হাত ইশারায়। জীপে তিনজন যাত্রী, একজন ইঞ্জিনিয়ার সালেহ মোহাম্মদ, বয়স ৩১ বৎসর, দ্বিতীয় জন ওভারশিয়ার নজর মোহাম্মদ ও অপর ব্যক্তি ড্রাইভার আবদুল আজিজ। বলা বাহুল্য যে, নজর মোহাম্মদ ও আজিজ ছিল ইঞ্জিনি-য়ার সালেহ মোহাম্মদের অধীনস্থ কর্মচারী।

মিস ক্যাথারিনের প্রশ্নের উত্তরে সালেহ মোহাম্মদ জানাল যে তারা ওই রাস্তা ধরে লাহোরের দিকে আরও ২০ মাইল পর্যন্ত যাবে,

ইচ্ছা করলে মিস ক্যাথারিন তাদের সঙ্গে সে পর্যন্ত যেতে পারে। ক্যাথারিন দ্বিধাগ্রস্ত হল। তার যেতে হবে লাহোর, ২০ মাইল গিয়ে মাঝপথে কোন যানবাহন পাবে কিনা সময়মত, তাই সে চিন্তা করতে লাগল। তখন সালেহ তাকে আশা দিয়ে বলল যে ওখান থেকে লাহোরগামী অন্য গাড়িও পাওয়া যেতে পারে।

ক্যাথারিন একটু চিন্তা করে যাওয়াই ঠিক করল। পথে বেরিয়েছে সে তাই গন্তব্যস্থলের কাছাকাছি যতটুকু এগুনো যায় সে চেষ্টাই করা উচিত, বিশেষ করে শিক্ষিত সালেহ মোহাম্মদের মধুর ব্যবহারে সে উৎসাহিত বোধ করল। সালেহর নির্দেশে ওভারশিয়ার নজর মোহাম্মদ সামনের সীট থেকে উঠে গিয়ে পেছনে বসল, আর মিস ক্যাথারিন জীপে উঠে সামনের সীটে সালেহ মোহাম্মদের পাশে এসে বসল।

জীপ ছুটে চলল সুন্দর পীচ ঢালা রাস্তা ধরে। সালেহ মোহাম্মদ ও ক্যাথারিনের মধ্যে ইংরেজীতে বেশ আলাপ জমে উঠল।

উত্তর-পশ্চিম ইউরোপের ছোট্ট রাজ্য লাক্সেমবুর্গের নাগরিক মিস ক্যাথারিন। স্বদেশে উচ্চ শিক্ষা সমাপ্ত করে স্কলারশিপ নিয়ে সুইজারল্যাণ্ডের ভাষা-ইন্সটিট্যুটে শিক্ষারত ছিল। এছাড়া সাংবাদিকতায়ও তার ভাল ট্রেনিং ছিল। জার্মানী ও লাক্সেমবুর্গের কয়েকটি কাগজে নিয়মিত লেখা পাঠাত সে।

বিদেশ ভ্রমণে ছিল তার এক প্রচণ্ড নেশা, বিশেষভাবে ইতিহাস প্রসিদ্ধ স্থানগুলো দেখতে সে ছিল বরাবরই খুব উৎসাহী। ১৯৬৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে লাক্সেমবুর্গ থেকে রওনা হয়ে ইটালী, মিসর, লেবানন, সিরিয়া, জর্ডান, ইরাক, কুয়েত প্রভৃতি দেশসমূহ ঘুরে ১৯৬৫ সালের ১২ই মে ক্যাথারিন এসে অবতরণ করে প্রাচ্যের প্রবেশ

Mamun Academy

দ্বার করাচী শহরে। করাচীতে চারদিন অবস্থান করে সে আসে ঐতিহাসিক থাট্টা শহরে। পাকিস্তানের ঐতিহাসিক দর্শনীয় স্থান-গুলো দেখার বিশেষ ইচ্ছা ছিল ওর। থাট্টা থেকে সে যায় মহেন-জোদারোতে। সেখানে গভীর মনোযোগের সঙ্গে দেখেছে বিশ্ববিখ্যাত প্রাগৈতিহাসিক অমূল্য সম্পদসমূহ। সেখান থেকে সে আসে লার-কানায়। সাতদিন লারকানায় থেকে ক্যাথারিন লাহোরের পথে ট্রেনে সেদিনই রেহড়ী স্টেশনে এসে নামে। উদ্দেশ্য, প্রসিদ্ধ শহর লাহোরে কয়েকদিন বেড়িয়ে তারপর সে রাস্তাপথে ভারতে প্রবেশ করবে।

মিস্ ক্যাথারিন ছিল প্রধানতঃ একজন হিচ হাইকিং, (Hitch Hiking) ভ্রমণযাত্রী। ইউরোপের তরুণ তরুণীদের মধ্যে হিচ হাইকিং ভ্রমণ তখন বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। এরা সাধারণতঃ নিজেরা বহন উপযোগী মালপত্র নিয়ে পথের চলমান কোন প্রাই-ভেট গাড়ি জীপ বা অন্য কোন যানবাহনে নিজ অনুরোধে উঠে বসে, আর যথাস্থানে পৌঁছে মালিককে ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় নেয়।

অল্প খরচে মনের আনন্দে বিদেশ ভ্রমণের এটি হল এক আধুনিক পন্থা। অর্থ বাঁচান ছাড়াও বিদেশে রাস্তাপথে বিভিন্ন লোকের সঙ্গে মেশার ভাল সুযোগ মেলে এই সব হিচ হাইকিং ভ্রমণকারী-দের। এছাড়া এতে আছে বিদেশে প্রচুর এডভেঞ্চারের সুযোগ যা তরুণ তরুণীদের কাছে কম আকর্ষণীয় নয়। যদিও গাড়ির আশায় অনিশ্চিতভাবে অনেক সময় রাস্তার পাশে অপেক্ষা করতে হয় এই এক অসুবিধা। তবে এ ব্যাপারেও তরুণীরা সাধারণত তরুণদের চেয়ে অধিক ভাগ্যবান বলে বিবেচিত হয়ে থাকে, কারণ তারা সহজেই লিফট পেয়ে যায়।

Mamun Academy

সালেহ মোহাম্মাদ ছিল সেচ বিভাগের একজন এস. ডি. ও. ইঞ্জিনিয়ার। রেহড়ী থেকে ২০ মাইল দূরে পানোয়াকিলে ছিল তার বাসা ও হেডকোয়ার্টার। সেখানেই ফিরছিল সে সেদিন তার সরকারী জীপ গাড়িতে।

গাড়িতেই সে মিস ক্যাথারিনের সঙ্গে পরিচিত হল। সর্বক্ষণই উভয়ের মধ্যে কথাবার্তা চলতে লাগল ও পরিচয় গভীর হল। এক সময় সালেহ মোহাম্মদ জানতে পে লাহোর শহর পানোয়াকিল থেকেও অনেক দূরে অবস্থিত, তখন সন্ধ্যা হতে আর বেশি দেরি নেই, তাই এই অসময়ে লাহোরের দিকে যেতে মহিলার অসুবিধা হতে পারে, রাত্রে পথে বিপদের আশঙ্কাও আছে। শুনে মিস ক্যাথারিন চিন্তিত হয়ে পড়ল।

সালেহ ওর মনের অবস্থা টের পেয়ে অভয় দিয়ে বলল, 'আপনি কিন্তু আজ রাত্রে পানোয়াকিলেও থেকে যেতে পারেন। সেখানে ভাল রেস্ট হাউজ আছে, কোন অসুবিধা হবে না। আমি সব ব্যবস্থা করে দিতে পারব। আর কাল সকালে আমি এই জীপ নিয়েই সরকারী কাজে লাহোরের দিকে আরও ১০০ মাইল যাব, তখন আমি আপনাকে লাহোরের কাছাকাছি পৌঁছে দিয়ে আসতে পারব।

'পানোয়াকিলে রাত কাটাবার মত ভাল রেস্ট হাউজ আছে কি?' আবার জিজ্ঞেস করল মিস ক্যাথারিন।

'সে বিষয়ে আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন। সেখানে ভাল রেস্ট হাউজ আছে আর সেটা আমার চার্জেই থাকে। আপনি বিদেশী পর্যটক। এদেশে আপনার কোনও অসুবিধা যাতে না হয় সেটা দেখার দায়িত্ব আমারও আছে। সেখানে রাত কাটাবার ভাল ব্যবস্থা আমি করে দেব। আর তাছাড়া আমার বাসাও রেস্ট হাউজের

Manik Academy

কাছেই, আপনার কোন অসুবিধা হবে না।' বলল সালেহ।

'বেশ তাহলে আমি রাজি। ভালই হবে, এ অঞ্চলটাও ঘুরে দেখার সুযোগ পাওয়া যাবে। তবে রেস্ট হাউজে আমার আলাদা থাকার ব্যবস্থা করে দিতে পারবেন ত?'

'নিশ্চয়ই। আপনি সে সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন। আমি থাকতে আপনার কোনও অসুবিধা হতে দেব না।'

কিন্তু হায়! তখন কি সেই বিদেশিনী বুঝতে পেরেছিল যে কতবড় শয়তানি লুকিয়ে ছিল এই ভদ্রবেশী শিক্ষিত নরপিশাচের মধ্যে? সরল বিশ্বাসেই ক্যাথারিন নির্ভর করল তার উপরে।

বিকাল ৪টার সময়ে তাদের নিয়ে জীপ পানোয়াকিল পৌঁছল। প্রধান সড়ক ছেড়ে ছোট্ট একটি সুরকির রাস্তা বেয়ে অবশেষে নির্জন এক বাগানের পাশে এসে থামল গাড়ি।

কাছেই ছিল দুটি সুন্দর আধুনিক বাংলো. সালেহ মোহাম্মদ জানাল যে এর একটি তার বাসা আর অন্যটি রেস্ট হাউজ। দেশের প্রত্যন্ত এলাকায় এত সুন্দর রেস্ট হাউজ দেখে ক্যাথারিনের মন প্রফুল্ল হয়ে উঠল। সেদিকে তাকিয়ে সে সালেহকে বলল, 'আমাকে বরং রেস্ট হাউজে নামিয়ে দিয়ে আপনি বাসায় যান।'

'আপনি পরিশ্রান্ত। আমার বাংলোয় বসে একটু বিশ্রাম নিন, আর সেই সঙ্গে একটু পানাহারও করা যাক। ততক্ষণে আমি চৌকিদার দিয়ে আপনার রুমটি ঝেড়েমুছে ঠিক করে দেয়ার ব্যবস্থা করছি।

সরল বিশ্বাসে ক্যাথারিন সালেহ-এর এই প্রস্তাবেও রাজি হল।

গাড়ি থেকে নেমে সালেহ মোহাম্মদের ড্রইংরুমে এসে বসল তারা।

'একটু ড্রিঙ্ক করা যাক। আপনি কি বিয়ার পছন্দ করেন, না

হুইস্কি ?' জিজ্ঞেস করল সালেহ।

'যদি অসুবিধা না হয় তবে বিয়ারই ভাল হবে।'

আদেশ পেয়ে বেয়ারা ট্রেতে করে তিন গ্লাস বিয়ার এনে রাখল তাদের সামনে।

বিয়ার পানের পরেই ওভারশিয়ার বিদায় নিল তাদের কাছ থেকে।

'আপনি একটু অপেক্ষা করুন, আমি অল্পক্ষণের মধ্যে ভেতর থেকে আসছি।' এই বলে সালেহ ড্রইংরুম ছেড়ে ভিতরে চলে গেল। ক্যাথারিন একলাই বসে রইল ড্রইংরুমে।

কিছুক্ষণ পরেই সালেহ ঢুকল ড্রইংরুমে। কিন্তু এবার তার ভিন্ন মূর্তি। সোজা ক্যাথারিনের কাছে এসে সে তার হাত চেপে ধরল। ওর মুখের কাছে মুখ নিয়ে বলল, 'ডার্লিং মাত্র একটি চুমু খাব তোমার ওই সুন্দর মুখে।' বলেই সে দু'হাতে জড়িয়ে ধরতে চেষ্টা করল ক্যাথারিনকে।

সভয়ে চমকে লাফিয়ে উঠল ক্যাথারিন তার সোফা থেকে। তড়িৎগতিতে সে কয়েক পা পিছিয়ে গেল। ঘৃণাভরে সে সালেহর প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করল ও তার হাত ছাড়িয়ে নিল।

কিন্তু সালেহ ছাড়বে না। নির্জনে একাকিনী এক বিদেশী তরুণীকে তার ঘরের মধ্যে পেয়ে শয়তান যেন তার মাথায় চেপে বসেছে। এ সুযোগ সে ছাড়তে রাজি নয়।

এবার সে জোর করে ক্যাথারিনের উপরে পাশবিক অত্যাচারের চেষ্টা করল। আর ক্যাথারিনও তার সমস্ত শক্তি দিয়ে প্রতিরোধ করতে লাগল সেই হীন প্রচেষ্টা। ফলে ধস্তাধস্তি শুরু হয়ে গেল উভয়ের মধ্যে।

Mamun Academy

কামনার পৈশাচিক মূর্তি ফুটে উঠল সালেহ মোহাম্মদের চোখে মুখে। তা দেখে ভীত সন্ত্রস্ত অসহায়া নারী তাকে শয়তানের হাত থেকে উদ্ধার করার জন্যে ড্রাইভারের দিকে কাতর ভাবে চেয়ে তার সাহায্য প্রার্থনা করতে লাগল।

ড্রাইভার কাছেই ছিল। সে এল ঠিকই কিন্তু ক্যাথারিনকে সাহায্য না করে বরং তার প্রভুর ইঙ্গিতে ঘরের জানালা-দরজা সব বন্ধ করতে শুরু করল।

এবার উভয়ে মিলে ক্যাথারিনকে আক্রমণ করল ও তাকে সোফা থেকে টেনে মেঝেতে ফেলে দিল। নিচে বিছানো ছিল উলের কার্পেট। সেই কার্পেটের উপরেই দুজনে চেপে ধরল তাকে। ক্যাথারিনের পরনে ছিল ফুল প্যান্ট, আণ্ডার অয়্যার ও স্কার্ট, দুজনে জোর করে তার সমস্ত কাপড় খুলে ফেলে ক্যাথারিনকে উলঙ্গ করে ফেলল। কিন্তু সে অসহায়া ক্যাথারিন তার সমস্ত শক্তি দিয়ে নিজের সতীত্ব রক্ষার জন্যে সমানভাবে ওদের বাধা দিয়ে যেতে লাগল।

সালেহ এবার তাকে শাসিয়ে বলল, 'দেখ এখানে কেউ তোমাকে কোন সাহায্য করতে আসবে না, কারণ এখানে ধারে কাছে কোন প্রাণীই নেই। তাই অনর্থক চিৎকার করে কোন লাভ হবে না। বরং সুবোধ মেয়ের মত আমাদের প্রস্তাবে রাজি হয়ে যাও, তুমিও মুক্তি পাবে।'

এই বলে সালেহ নিজের প্যান্টের বোতাম খুলে ক্যাথারিনের উপর লাফিয়ে পড়ল, তাকে জোর করে চেপে ধরে তার উপর বলাৎকার করতে উদ্যত হল। কিন্তু ক্যাথারিনও মরিয়া হয়ে সর্বশক্তি প্রয়োগ করে তাকে বাধা দিতে লাগল, ফলে সালেহ তার হীন কাজে সফল হতে পারল না।

Mamun Academy

কয়েকবারই চেষ্টা করে বিফল হল সালেহ। ক্যাথারিন অসহায় ভাবে চিৎকার করে ড্রাইভারকে ডাকল তাকে উদ্ধার করতে। এবারও এগিয়ে এল ড্রাইভার, কিন্তু সে ক্যাথারিনের গালে সজোরে এক চড় মেরে তাকে চুপ থাকতে বলল। তারপর ড্রাইভার নিজেও ক্যাথারিনকে ধর্ষণের চেষ্টা চালাল। কিন্তু প্রবল প্রতিরোধের সামনে তার প্রভুর মত ড্রাইভারও বিফল হল।

রাগে ও উত্তেজনায় ড্রাইভার তখন টেবিলের উপরে রাখা একটি বড় ফুলদানী দেখিয়ে ক্যাথারিনকে বলল, 'দেখ তুমি যদি এখনও বাধা দিতেই থাক বা চিৎকার কর তবে তোমাকে এই ফুলদানী দিয়ে পিটিয়ে ঠাণ্ডা করব, তখন বুঝবে মজা।'

ওর কথায় সায় দিয়ে সালেহ বলল, 'তুমি যদি এখনও আমাদের প্রস্তাবে রাজি না হও, তবে আমরা সমস্ত রাতভরও তোমাকে রেহাই দিব না, প্রয়োজন হলে তোমাকে খুন করতেও দ্বিধা করব না।'

কিন্তু ওদের বাধা দিতে দিতেই ক্যাথারিন বলল, 'কি রকম হীন ও নীচ লোক তোমরা। তুমি না শিক্ষিত একজন ইঞ্জিনিয়ার! আর তোমরা দুজন পুরুষ মানুষ একজন অসহায় মেয়ের উপর এক সঙ্গে বলাৎকার করতে যাচ্ছ? ছিঃ ছিঃ, এই কি তোমাদের শিক্ষা ও সভ্যতার নমুনা?'

কিন্তু কে শোনে কার কথা? শয়তান ততক্ষণ পুরোপুরিই চেপে বসেছে সালেহর মাথায়। পরপর তিনবার সে ক্যাথারিনকে ধর্ষণের চেষ্টা করল। কিন্তু প্রতিবারই প্রবল বাধার মুখে ব্যর্থ হল।

এবার নিরুপায় সালেহ তার ড্রাইভারকে এক শিশি ক্রীম আনতে বলল। সেই ঘরেই ক্রীম ছিল। ড্রাইভার দৌড়ে গিয়ে তা এনে এগিয়ে ধরল তার সাহেবের দিকে। এরপর আবার চলল

তাদের মধ্যে নিষ্ফল ধস্তাধস্তি।

দু'দুজন পুরুষের সঙ্গে আর কতক্ষণ লড়বে অসহায়া নারী ক্যাথারিন? পরিশ্রান্ত হয়ে পড়ল সে। ক্রমে সে প্রতিরোধের ক্ষমতা হারিয়ে ফেলতে লাগল। অবশেষে ঘরের এক কোণে দৌড়ে গিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে সালেহর দিকে চেয়ে হাত জোড় করে কাতরকণ্ঠে বলল, 'পবিত্র কোরান ও হজরত মোহাম্মদের দোহাই, কথা দাও যে তুমি শুধু একলাই কাজ সেরে আমাকে রেহাই দেবে। আর তোমার ড্রাইভার আমাকে স্পর্শ করতে পারবে না। বল, ধর্মের নামে এই প্রতিজ্ঞা করলে আমি তোমাকে আর বাধা দেব না।'

সালেহর হঠাৎ যেন বিশ্বাস হল না যে এই তেজী মেয়ে শেষ পর্যন্ত বশ্যতা স্বীকার করবে। সে সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে গেল এই সন্ধির প্রস্তাবে। তার আদেশে ড্রাইভার অনিচ্ছা সত্ত্বেও ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

এরপর ক্যাথারিন আর বাধা দিল না। আর একটা নরপশু তার দেহের উপরে চালাল অত্যাচার।

পরে উঠে বসে সালেহ ক্যাথারিনকে সেই রুমের সংলগ্ন বাথরুমে গিয়ে শরীর ধুয়ে আসতে বলল।

ক্যাথারিন তার কাপড়চোপড় ও ব্যাগ নিয়ে ক্রন্দনরত অবস্থায় কোনমতে টলতে টলতে বাথরুমের দিকে এগুতে গিয়ে ক্লান্তি ও অবসাদে প্রায় অজ্ঞান হয়ে মাটিতে পড়ে যাচ্ছিল। তখন সালেহ দৌড়ে এসে তাকে ধরে বাথরুমে যেতে সাহায্য করল।

বাথরুমের দরজা আটকিয়ে ঠাণ্ডা পানিতে গা ধুয়ে ক্যাথারিন অনেকটা ভাল বোধ করল। তবে সে সময়ে সমস্ত শরীর ঠাণ্ডা পানিতে ধুলেও সাবধান ক্যাথারিন তার স্ত্রী-অঙ্গের ভিতরে পানি

প্রবেশ করতে দেয়নি। বাথরুমে এবার সে তার ব্যাগ খুলে দেখল যে আত্মরক্ষার জন্যে তার মধ্যে যে ছুরিটি রেখেছিল সেটা নেই—নিশ্চয়ই সালেহ তা আগেই সরিয়ে ফেলেছে।

ক্যাথারিন আবার তার পোশাক পরে নিল। ব্যাগ থেকে টাকা পয়সা ও পাসপোর্ট ইত্যাদি বের করে নিজের কাছে রাখল। এবার সে চিন্তা করতে লাগল কিভাবে এখনই এই পিশাচদের হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যায়। ড্রাইভারের চোখেও সে দেখেছে কামের আগুন। এই দোজখে আর এক মুহূর্তও থাকা উচিত নয়। ওই ঘরেও সে আর কিছুতেই ফিরে যাবে না। অত্যাচারীদের উপযুক্ত সাজা দেবার দৃঢ় সংকল্প সে গ্রহণ করল।

বাথরুমের চারদিকটা তাকিয়ে দেখল যে এর বাইরের দিকের দেয়ালের উপরের দিকটা ফাঁকা। তার মাথা থেকে সেই ফাঁক দেড় ফুট উপরে। একটি পানির আলগাটবও আছে বাথরুমে। নিমেষের মাঝে উদ্ধারের একটি চিন্তা তার মাথায় খেলে গেল যদি টবটি উপুড় করে তার উপরে দাঁড়ানো যায়, তবে সে দেয়ালের সেই ফাঁক তার নাগালের মধ্যে পেতে পারে। তৎক্ষণাৎ সে পানির টবটি এনে দেয়ালের কাছে উপুড় করে তার উপরে দাঁড়িয়ে পানির পাইপটির সাহায্যে অতি কষ্টে দেয়ালের উপরে উঠে বসল, তারপর সেই ফাঁক দিয়ে এক লাফে বাইরে নেমে পড়ল।

এতে যে শব্দ হল তা শুনে সালেহ মোহাম্মদ ও তার ড্রাইভার দৌড়ে বাইরে বেরিয়ে এল। কিন্তু নিচে পড়েই মুক্তির নেশায় প্রাণ-পণে দৌড়ে ক্যাথারিন রাস্তার কাছে এক ফাঁকা জায়গায় এসে দাঁড়াল।

সালেহ ও ড্রাইভার দৌড়ে এসে ক্যাথারিনের পথ রোধ করে

Mamun Academy

দাঁড়াল। ক্যাথারিনও তখন জোরে চিৎকার করে উঠল, 'সাবধান, ফের আমার গায়ে হাত দেবে না কেউ। আমাকে যেতে দাও, আমাকে যেতে দাও···।'

এবার সালেহ দেখল যে বিপদ। পাখি খাঁচা থেকে বেরিয়ে গেছে। একটু দূরে লোকজনও আছে। চিৎকার শুনে তারাও এসে পড়তে পারে। তাই এবার সে ভোল পালটে অনুনয় বিনয় করে তাকে রেস্ট হাউজে ফিরে আসার জন্যে অনুরোধ করতে লাগল। কিন্তু ক্যাথারিন তা দৃঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান করে বলল, 'দেহে প্রাণ থাকতে আমি আর তোমাদের ওই শয়তানের আস্তানায় ফিরে যাব না। ভাল চাও ত আমাকে যেতে দাও, না হলে আমি এত জোরে চিৎকার করব যে দূরের লোকও ছুটে আসবে। আর নিশ্চয়ই তোমাদের মত দুজন অত্যাচারীর হাত থেকে দুর্ভাগা নারীকে উদ্ধার করার জন্যে বীরের অভাব এ দেশে হবে না।'

ক্যাথারিনের স্বরের দৃঢ়তা দেখে সালেহ প্রমাদ গুণল। ভাবল একে আর ঘাঁটিয়ে লাভ নেই। এবার সে স্বর নামিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কোথায় যেতে চাও তুমি এখন? যাক, আমার গাড়িই সেখানে পৌঁছে দিয়ে আসবে।'

'তোমরা যদি আমাকে লাহোরগামী প্রধান সড়কে পৌঁছে দিতে পার তবেই আমি খুশি হব। বাকি পথ আমি নিজেই দেখে নিতে পারব।'

সালেহ ড্রাইভারকে গাড়ি আনতে বলল।

ড্রাইভার চলে গেলে সে ক্যাথারিনকে বলল, 'বিদেশে তোমার নিশ্চয়ই টাকার প্রয়োজন হবে। তোমাকে আমি বরং কিছু টাকা দেই, আর যা ঘটে গেছে তা দয়া করে ভুলে যাও।'

Mamun Academy

'আমার টাকার প্রয়োজন নেই, ধিক তোমার প্রস্তাবে। আমি তাড়াতাড়ি এখান থেকে বের হতে পারলেই খুশি হব।' তেজের সঙ্গে উত্তর দিল ক্যাথারিন।

জীপ নিয়ে ড্রাইভার এসে হাজির হল। গাড়িতে এবার আব দুল্লাহ নামে এক চাকরও ছিল। সে ক্যাথারিনের মালপত্র সব গাড়িতে উঠাল। ক্যাথারিনকে তারা তাদের মাঝখানে সামনের সীটে এসে বসতে আহ্বান করল। কিন্তু ক্যাথারিন আবদুল্লার পাশে বসতে রাজি হল না। অগত্যা আবদুল্লাহ উঠে পিছনের সীটে চলে গেল। আর ক্যাথারিন সামনের সীটে এসে বসল। সালেহ জানাল যে জীপ তাকে প্রধান সড়ক ধরে লাহোরের দিকে ১০ মাইল এগিয়ে দিয়ে আসবে।

ক্যাথারিন কিন্তু সে কথায় বিশ্বাস স্থাপন করতে পারল না। এদের চোখে মুখে কুটিল ভাব দেখে তার গভীর সন্দেহ হল ওদের মতলব সম্বন্ধে তার ভয় হল যে ওরা তাকে নির্জনে নিয়ে গিয়ে মেরেও ফেলতে পারে, তাই সে সুযোগ খুঁজতে লাগল কত তাড়াতাড়ি তাদের হাত থেকে মুক্তি পাওয়া যায়।

গাড়ি ছোট রাস্তা ছেড়ে লাহোরগামী প্রধান রাজপথে পৌঁছবার পরই ক্যাথারিন চলন্ত গাড়ি থেকেই লাফ দিয়ে নামার চেষ্টা করল। কিন্তু সেই মুহূর্তে ড্রাইভার তার বাহু চেপে ধরল। একটু ধস্তাধস্তি হল তাদের মধ্যে। এতে স্বভাবতঃই জীপের গতি মন্থর হয়ে এল, আর সেই সুযোগে ক্যাথারিন হঠাৎ একলাফে রাস্তায় নেমে পড়ল, ড্রাইভার বাধা দিয়েও তাকে ঠেকাতে পারল না, ক্যাথারিন এক ঝটকায় তার বাহু ছাড়িয়ে নিল।

সেখান থেকে মাত্র কয়েক গজ দূরেই ছিল একটি পেট্রোল পাম্প,

Mamun Academy

সেখানে বসা ছিল কয়েকজন লোক। তারা রাস্তায় এই কাণ্ড দেখে কৌতূহলবশে সেদিকে এগিয়ে এল। এদের দেখেই আবদুল্লাহ ক্যাথারিনের মালপত্র জীপ থেকে কোনরকমে রাস্তায় নামিয়ে রেখেই দ্রুত গাড়ি নিয়ে সেখান থেকে সরে পড়ল।

ক্যাথারিন সোজা পেট্রোল পাম্পের কাছে চলে এল। সেই পাম্পের দায়িত্বে ছিল তখন আতা মোহাম্মদ নামক এক ধার্মিক ব্যক্তি। সবেমাত্র সে মাগরিবের নামাজ শেষ করে জায়নামাজ থেকে উঠেছে। ক্যাথারিনকে সেই অবস্থায় দেখে আশেপাশের কয়েকজন লোকও এসে সেখানে জড়ো হল। আশ্চর্য হয়ে সকলে লক্ষ্য করল যে এই বিদেশী মহিলা অনবরত কাঁদছে আর সেই সংগে নিজের হাত দিয়ে নিজেরই শুভ্র কপালে আঘাত করছে। আতা মোহাম্মদকে দেখে সে বলল, 'আমার বড় বিপদ, পুলিশের আশ্রয় নিতে হবে। কাছে কোথাও টেলিফোন আছে কি?'

প্রভূত সহানুভূতি দেখিয়ে আতা মোহাম্মদ ঘাড় নেড়ে বলল, 'না ত, কাছে কোথাও টেলিফোন ত দেখছি না।'

'তাহলে কাছে কোন পুলিশ স্টেশন বা থানা আছে কি?'

'হ্যাঁ বেটি, কাছেই পনোয়াকিল থানা। তুমি বরং সেখানে যেতে পার,' অভয় দিয়ে বলে আতা মোহাম্মদ।

'তুমি আমার পিতার সমান। দয়া করে আমাকে সেখানে তাড়াতাড়ি পৌঁছে দেয়ার ব্যবস্থা কর। আমি যে এদিকের পথ-ঘাট কিছুই চিনি না।'

'নিশ্চয়ই তোমাকে সেখানে পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করছি। তবে তোমাকে খুব পরিশ্রান্ত মনে হচ্ছে, বরং এককাপ চা খেয়ে নাও।' সত্যিই তখন এককাপ চায়ের খুব দরকার ছিল ক্যাথারিনের। চা

Mamun Academy

খেতে খেতে আতা মোহাম্মদ তার বিশ্বস্ত ড্রাইভার আব্দুল করিমকে ডেকে পাঠাল। তারপর একটি টোঙ্গায় করে আব্দুল করিম যখন ক্যাথারিনকে পানোয়াকিল থানায় নিয়ে এল তখন সন্ধ্যা ৭টা।

থানায় তখন ডিউটিতে ছিল মোহাম্মদ মুসলিম নামক একজন এ. এস. আই। মিস ক্যাথারিন তাকে সমস্ত ঘটনার বিবরণ বলল ও তখনই একটি কেস রেকর্ড করে নিতে বলল। কিন্তু মুসলিম কোন এক্সাহার লিখে না নিয়ে অযথা নানা প্রশ্নে সময় নষ্ট করতে লাগল। বিরক্ত হয়ে শেষে ক্যাথারিন একটি কাগজ নিয়ে তাতে নিজেই ইংরেজীতে তার অভিযোগ লিপিবদ্ধ করে তা মুসলিমের হাতে দিয়ে অবিলম্বে তার অভিযোগ সম্বন্ধে তদন্ত শুরু করতে বলল। মুসলিমকে সে আরও অনুরোধ করল যে তখনই যেন তাকে কোন লেডি ডাক্তারের কাছে পাঠানো হয়, তার ডাক্তারী পরীক্ষা সম্পন্ন করার জন্যে। কিন্তু এ. এস. আই. মুসলিম তাকে জানাল যে সেই রাত্রে আর ডাক্তারী পরীক্ষা করা সম্ভব হবে না; পরদিন তা করা হবে।

'কিন্তু তাতে আমার অভিযোগ প্রমাণে অসুবিধা হবে ও প্রত্যক্ষ প্রমাণ নষ্ট হয়ে যাবে,' বলল ক্যাথারিন।

'কিন্তু ডাক্তার অনেক দূরে থাকে। এত রাত্রে সেখানে তুমি কি করে যাবে?' বলে তাকে নিরাশ করল মুসলিম।

এই প্রসঙ্গে বলে রাখা দরকার যে শেষ পর্যন্ত পরদিন দুপুর দেড়টার সময়ে পুলিশ ক্যাথারিনকে ডাক্তারী পরীক্ষার জন্যে পানোয়াকিলের লেডি ডাক্তার মিস এস. এম. মেমনের কাছে পাঠায়।

ক্যাথারিনের তাগাদায় সেই রাত্রেই এ. এস. আই মুসলিম ক্যাথারিনকে নিয়ে তার পুলিশ প্রধানের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্যে তাঁর বাসস্থান ঘেইকীতে যায়। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁকে তখন বাসায়

না পেয়ে তারা রাত ১০টায় পুনরায় থানায় ফিরে আসে। মাত্র তখনই মুসলিম কেসটি কাগজে লিখতে শুরু করে। ততক্ষণে রাত ১২টা পার হয়ে গেছে। ক্যাথারিন ভয়ানক পরিশ্রান্ত। ঘুমে তার চোখ বুঁজে আসছিল। তার অনুরোধে মুসলিম তার পরিবারের সঙ্গেই সে রাতের মত থাকার ব্যবস্থা করে দিল।

পরদিন সকাল ৬টায় মুসলিম পুনরায় ক্যাথারিনের নিকটে এসে তাকে তার রাত্রের জবানবন্দী বদলাতে অনুরোধ করল ও আসামী সালেহ মোহাম্মদকে যতদূর সম্ভব অভিযোগ থেকে অব্যহিত দিতে পীড়াপীড়ি করতে লাগল। কারণ স্বরূপ বলল যে আসামী পক্ষ খবর পেয়ে সেই রাত্রেই এসে এ সম্বন্ধে তাকে খুব ধরেছে আর এ-ও বলেছে যে, যদি ক্যাথারিন এতে রাজি হয় তবে আসামীপক্ষ তাকে ক্ষতিপূরণ হিসাবে প্রচুর অর্থ দিতে রাজি আছে।

ক্যাথারিন ঘৃণাভরে এই হীন প্রস্তাব অগ্রাহ্য করল। কিন্তু তবুও মুসলিম যখন তাকে বারবার একই অনুরোধ করতে লাগল, তখন সে রেগে গিয়ে জবাব দিল: 'দেখুন মিঃ মুসলিম, আপনার অনুরোধ কোনক্রমেই আমার পক্ষে রক্ষা করা সম্ভব নয়। আমি যে অভিযোগ করেছি তার এক বিন্দুও মিথ্যা নয়। তাই কিছুতেই আমি তা পরিবর্তন করব না। এ ব্যাপারে আমাকে আর কোন অনুরোধ করবেন না। আপনি অযথা মূল্যবান সময়ও অপচয় করছেন। মনে রাখবেন আপনি যদি আমার অভিযোগ সম্বন্ধে সত্যিই কোন ব্যবস্থা না করেন তবে আমি শুক্কুরে গিয়ে পুলিশ প্রধানের কাছে আমার অভিযোগ পেশ করব।'

ক্যাথারিনের এই অনমনীয় দৃঢ় মনোভাবে মুসলিম প্রমাদ গুণল। তখন থেকেই সে আর দ্বিধা না করে থানার ডায়েরীতে

এজাহার লিখতে শুরু করল।

সেদিন দুপুরে ক্যাথারিনের ডাক্তারী পরীক্ষা করিয়ে বিকালে তার প্যান্ট ও আণ্ডারওয়্যার রাসায়নিক পরীক্ষার জন্যে পাঠানো হল। তার গোপন অঙ্গের স্রাব মিশ্রিত তুলাখণ্ডও পাঠানো হল ওই একই সঙ্গে রাসায়নিক পরীক্ষার জন্যে।

পরদিন (২৬/৫/৬৭) তারিখে ডি. এস. পি ও থানার পুলিশ সাবইন্সপেক্টর থানায় ফিরে এলেন। এখন থেকে কেসের তদন্তভার বড় দারোগা নিজ হাতে গ্রহণ করলেন। ক্যাথারিনকে নিয়ে তিনি ঘটনাস্থলে গেলেন। আসামী সালেহ বা ড্রাইভার কাউকেই সেখানে পাওয়া গেল না। বোঝা গেল যে দুজনেই পলাতক। সালেহর ড্রইংরুমে ওই উভয় আসামীরই একটি ফটো ঝুলানো ছিল। সেই ফটো দেখেই ক্যাথারিন আসামীদের সনাক্ত করল। পুলিশকে নিয়ে ক্যাথারিন সংলগ্ন বাথরুমেও গেল। সেখানে সে পুলিশকে দেখাল, কিভাবে সে টবের উপরে দাঁড়িয়ে ছোট দেয়াল ডিঙিয়ে ওপারে লাফিয়ে পড়ে ওদের হাত থেকে পরিত্রাণ পেয়েছিল। ক্যাথারিন তারপর পুলিশকে পেট্রোল পাম্পে নিয়ে গেল। সেখানে রাস্তায় সে কিভাবে জীপ থেকে লাফিয়ে নেমেছিল তা-ও সে পুলিশকে দেখাল। পেট্রোল পাম্পের লোকেরা ক্যাথারিনের উক্তির সত্যতার সাক্ষ্য দিল। এরপর সিভিল সার্জেনও ক্যাথারিনকে পরীক্ষা করল।

সালেহ মোহাম্মদকে পুলিশ ২৮শে মে গ্রেপ্তার করল। আসামী সনাক্ত করার উদ্দেশ্যে এক সনাক্ত মহড়ার (Test Identification parade) ব্যবস্থা করা হয়। সেখানেও ক্যাথারিন সঠিকভাবে আসামী সালেহকে সনাক্ত করল। ড্রাইভার কিন্তু শেষ পর্যন্ত পলাতক রইল। অনেক খোঁজ করেও পুলিশ তাকে ধরতে পারেনি।

Mamun Academy

ঘটনার পরদিন দুপুর দেড়টার সময় যখন ক্যাথারিনকে প্রথমে পানোয়াকিলের লেডী-ডাক্তারের সামনে পরীক্ষার জন্যে পাঠানো হয় তখন লেডী-ডাক্তার তাকে পরীক্ষা করে তার ডান চক্ষুর উপরের পাতায় একটি ক্ষত দেখতে পায়। সেই কাটা দাগ ডাক্তারের মতে ধস্তাধস্তিতে আঘাতের কারণে হয়ে থাকবে। ক্যাথারিনের ডান হাতের পিছনে নখের আঁচড়ের দাগও পাওয়া যায়। এছাড়া ক্যাথারিনের উভয় উরুতেই অসংখ্য এলোমেলো আঁচড়ের দাগ ছিল। ডাক্তার মত দিলেন যে, উলের কার্পেটের উপর ধস্তাধস্তি ও টানা-হ্যাঁচড়ার কারণে ওসবের সৃষ্টি হতে পারে।

লেডী-ডাক্তার অতঃপর ক্যাথারিনের স্ত্রী-অঙ্গও পরীক্ষা করেন। তাঁর মতে:

১। স্ত্রী অঙ্গের বাহির্দেশে কোন প্রকারের আঘাতের চিহ্ন পাওয়া যায়নি।

২। ঘটনার বহু পূর্বেই তার হাইমেন বা সতীচ্ছদ ছিন্ন হয়েছিল।

৩। তার যোনীদেশ বেশ প্রশস্ত।

৪। সেই দিনই ছিল তার মাসিক স্রাবের শেষ দিবস।

ক্যাথারিনের যোনীদেশের স্রাব মিশ্রিত তুলাখণ্ড যা সেদিন লেডী-ডাক্তার সংগ্রহ করে রাসায়নিক পরীক্ষার জন্যে পাঠিয়েছিলেন-তাতে কিন্তু পরীক্ষার পর কোন পুরুষের বীর্যের অস্তিত্ব পাওয়া যায়নি।

এরপর ঘটনার পঞ্চম দিনে সিভিল সার্জেন নিজেও ক্যাথারিনকে পরীক্ষা করেন।

পুলিশ এই মামলার বিস্তারিত তদন্তের পর আসামী সালেহ মোহাম্মদ, তার ড্রাইভার আবদুল আজীজ ও চাকর আবদুল্লার

Mamun Academy

বিরুদ্ধে চার্জশীট দাখিল করে।

প্রথমে শুরুতে সহকারী জেলা ম্যোজিস্ট্রেটের কোর্টে এই চাঞ্চল্যকর মামলার বিচার হয়।

আসামী ড্রাইভার ও চাকর পলাতক থাকায় তখন কেবলমাত্র সালেহ মোহাম্মদের বিচার শুরু হয়।

বিচারে আসামী সালেহ একটি লিখিত জবাব দেয়। তা হল এই:

'আমি নির্দোষ। রোহড়ী রেল স্টেশনের নিকটে বা দিনী ক্যাথারিনের সঙ্গে আমার প্রথম সাক্ষাৎ হয়। সে আমাকে অনুরোধ করে তাকে আমার জীপে লাহোরের দিকে লিফট দেবার জন্যে। আমি তাতে রাজি হই। গাড়িতেই তার সঙ্গে আমার পরিচয় ও কথাবার্তা হয় ও ক্রমে সেখানেই পরিচয় গভীর হয়। পথে জীপে পাশাপাশি বসে আমরা ইংরেজীতে কথাবার্তা বলি। ক্রমে আমরা উভয়েই আমাদের ঘনিষ্ঠতার আরও সুযোগ নিতে শুরু করি। আমি তার উরুদেশ স্পর্শ করি ও তাকে কাছে টেনে নিই। প্রতিবারেই সে হেসে তাতে সাড়া দিচ্ছিল।

'বাংলোতে পৌঁছে আমি তাকে বিয়ার দেই। সে আগ্রহের সঙ্গে নিজে বোতলের মুখ খুলে গ্লাসে ঢেলে বিয়ার আমাকে এবং ওভারশিয়ার নজর মোহাম্মদকে এগিয়ে দেয়। আমি অতঃপর নজর মোহাম্মদকে সেখান থেকে যেতে বলি।

'নজর মোহাম্মদ চলে গেলে আমি ক্যাথারিনকে কাছে এনে আলিঙ্গন ও তাকে চুম্বন করি। এতে সে আপত্তি করেনি। বরং সে জানায় যে এদেশে তার টাকার প্রয়োজন। তখন আমি তাকে বলি যে আমি তাকে প্রচুর অর্থ দিতে পারি যদি সে আমাকে খুশি করতে রাজি থাকে। উত্তরে ক্যাথারিন জানায় যে সে আমার সঙ্গে

Mamun Academy

সমস্ত রাত কাটাতে প্রস্তুত আছে যদি আমি তাকে ২৫০ টাকা দিতে রাজি থাকি।

'সেই ঘরে কোন বিছানা না থাকায় আমি তার সঙ্গে প্রেম করতে করতে তাকে টেনে কার্পেটের উপরে ফেলে দিই ও তাকে সম্পূর্ণ উলঙ্গ করে ফেলি। এরপর আমাদের শৃঙ্গার প্রবল ভাবে চলে। আমরা গভীরভাবে একে অন্যকে আলিঙ্গন করছিলাম। কার্পেটের উপরে কখনও সে আমার উপরে আবার কখনও বা আমি তার উপরে এভাবে গড়াগড়ি করছিলাম। এই সময় ক্যাথারিনও মত্ত হয়ে ওঠে ও সে আমার শার্ট ও প্যান্টের বোতাম খুলে ফেলে।

'হঠাৎ আমি লক্ষ্য করলাম যে বাদিনী তার গোপন অঙ্গ থেকে কি একটা জিনিস বের করে এনে তা বাইরে ফেলার চেষ্টা করছে। 'ওটা কী?' জিজ্ঞেস করলে সে খাপছাড়া উত্তর দেয়। আমার সন্দেহ হল ও তারপর লক্ষ্য করে দেখলাম যে তার হাতে রক্তমাখা এক-টুকরা তুলা। তার ঊরু অঙ্গও ভেজা আর সেখানেও রক্তের চিহ্ন দেখতে পেলাম, এতে আমার দৃঢ় প্রত্যয় জন্মাল যে সেই সময়ে তার মাসিক স্রাব হচ্ছিল। তখন আমি তাকে পরিষ্কার জানালাম যে সে অবস্থায় তার সঙ্গে সহবাস করা চলে না, সেই ক্ষণ থেকে তার প্রতি আমার মনেও বিতৃষ্ণা জন্মাল।

'তারপর ক্যাথারিন বাথরুমে গিয়ে তার কাপড় পরে নিল। সেখান থেকে ফিরে এসে সে আমার কাছে টাকা দাবি করল। উত্তরে আমি বললাম যে এক্ষেত্রে টাকা দেয়ার কোন প্রশ্নই ওঠে না। এতে সে ভয়ানক রেগে ওঠে ও বারবার টাকা দাবি করতে থাকে।

'অগত্যা আমি তাকে একশো টাকার একটি নোট প্রদান করলাম। সে রেগে গিয়ে প্রথমে সেই নোট ছুঁড়ে মাটিতে ফেলে দিল, কিন্তু

Manna Academy

পরক্ষণেই কি ভেবে আবার তা তুলে নিল।

'সে আর ওখানে থাকতে রাজি হল না। তার আমিও দেখলাম যে তাকে আর রাত্রে ওখানে রেখে লাভ নেই, তাই তার কথামত স্থির হল যে তখনই তাকে আমার জীপে করে লাহোরের রাস্তায় পৌঁছে দেয়া হবে।

'সে প্রস্তুত হয়ে নিলে আমি নিজে তার মালপত্র জীপে উঠালাম ও ড্রাইভারকে বললাম যে ক্যাথারিন যেখানেই যেতে চায় সেখানেই যেন তাকে নামিয়ে দেয়া হয়। তার সঙ্গে করমর্দন করে আমি তাকে বিদায় দিই, আমার চাকর আবদুল্লাকেও তার সঙ্গে পাঠাই। তারপর কি হয়েছে আমি জানি না।

'প্রায় ৪৫ মিনিট পরে জানলাম যে আমার জীপ ফিরে এসেছে।

'এর ঘণ্টা তিনেক পরে এ. এস. আই মুসলিম আমাকে খবর পাঠায় যে মহিলাটি টাকা দাবি করছে। আর যদি আমি টাকা না দিই তবে আমার বিরুদ্ধে সে গুরুতর মামলা রুজু করবে। আমি কোন দোষ করিনি।

'বাদিনীর পিছনে ও হাতে যে আঘাতের চিহ্ন পাওয়া গেছে তা বোধ হয় আমাদের উভয়ের কার্পেটের উপরে গড়াগড়ি ও শৃঙ্গারের কারণে হয়ে থাকবে। আর যতদূর আমার স্মরণ হয় তার চোখের ওপরের আঘাতটির কারণ—যখন সে প্রথম জীপে উঠতে যায় তখন জীপের এক অংশের সঙ্গে সে ধাক্কা খায়, তখন বেদনায় হাত দিয়ে সে চোখ ঢেকে ফেলেছিল। এরপরও কিছুক্ষণ সে রুমাল দিয়ে তার চোখ ঢেকে রেখেছিল।'

বিচারের সময় মিস ক্যাথারিন ছাড়াও সরকারী পক্ষের বহু সাক্ষীর জেরা-জবানবন্দী হয়। লেডী-ডাক্তার, সিভিল সার্জেন, ওভারশিয়ার

নজর মোহাম্মদ, ট্যাক্সি ড্রাইভার আবদুল করিম, পেট্রোল পাম্প-ওয়ালা আতা মোহাম্মদ প্রমুখ সকলেই মিস ক্যাথারিনের বিবরণকে সমর্থন জানিয়ে কোর্টে সাক্ষ্য দেয়।

পুলিশের রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে তিনজন আসামীই প্রথমে পলাতক ছিল। পরে গুপ্তচরের খবর অনুসারে ২৮শে মে তারিখে সালেহ মোহাম্মদকে শুক্কুরের এক বাড়ি থেকে গ্রেপ্তার করা হয়। সেখান থেকেই তার জীপও উদ্ধার করা হয়।

এছাড়া বিচারের সময়ে পুলিশ বাদিনীর কাপড়-চোপড়, ঘটনাস্থলের কার্পেট, খালি মদের বোতল, সনাক্ত করা আসামীদের ফটো ইত্যাদি সব কোর্টে হাজির করে।

কোর্টে মিস ক্যাথারিন আসামী পক্ষের উকিলের কঠিন জেরার সম্মুখীন হয়। কিন্তু প্রতিটি প্রশ্নের উত্তরই সে অতি দৃঢ়ভাবে প্রদান করে।

লেডী-ডাক্তারের রিপোর্টের উপর ভিত্তি করে তাকে জেরা করা হয় যে মিস ক্যাথারিন যদিও অবিবাহিতা কুমারী, কিন্তু ডাক্তারী রিপোর্টে দেখা যায় যে আগে থেকেই সে পুরুষসহবাসে অভ্যস্ত। এর উত্তরে ক্যাথারিন নির্ভীকভাবে জানায় যে দেশে তার প্রেমিক আছে, তার সঙ্গে স্বেচ্ছায় সে সহবাস করেছে।

সমস্ত সাক্ষ্য-প্রমাণ বিবেচনা করে সহকারী জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মিস ক্যাথারিনের অভিযোগ ও বিবরণ সত্য বলে গ্রহণ করেন। বিচারক এই বিদেশী মহিলার দৃঢ়তা, সত্যবাদিতা, ও সর্বক্ষণের স্বাভাবিক আচরণে ও বিবরণে বিশ্বাস স্থাপন করেন। আর সেই সঙ্গে আসামীর বর্ণনাকে কাল্পনিক অস্বাভাবিক ও অপ্রমাণিত বলে গণ্য করেন।

Mamun Academy

ম্যাজিস্ট্রেট আসামী সালেহ মোহাম্মদকে পাকিস্তান দণ্ডবিধির ৩৬৬ ধারা (ধর্ষণের উদ্দেশ্যে ফুসলানো) ও ৩০৬ ধারা (পাশবিক অত্যাচার) অনুসারে দোষী সাব্যস্ত করে তাকে প্রথম ধারায় তিন বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড ও ১০০০ টাকা জরিমানা এবং ২য় ধারায় পাঁচ বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ড ও ২০০০ টাকা জরিমানা প্রদান করেন।

আসামী উপরোক্ত দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে পশ্চিম পাকিস্তান হাই-কোর্টে আপীল করে।

হাইকোর্টের জাস্টিস এ. এম. ফারুকী উক্ত আপীল মামলায় বিচার করেন। এখানে আসামী পক্ষের কৌঁসুলী ছিলেন পাকিস্তানের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আইনবিদ মিঃ এ. কে. ব্রোহী।

আসামী পক্ষ সমর্থন করতে গিয়ে তিনি প্রধানতঃ যেসব যুক্তি তর্ক প্রদর্শন করেন তা হল :

বাদিনী ক্যাথারিন একজন দুশ্চরিত্রা মহিলা। পথে পথে দেহ ব্যবসা করেই সে দেশ ভ্রমণের খরচ যোগাড় করে এসেছে। আসামী তাকে প্রতিশ্রুত ২৫০ টাকা না দেয়ার কারণেই সে তার উপর রাগান্বিত হয়ে তাকে উপযুক্ত শিক্ষা দেবার উদ্দেশ্যে এই মিথ্যা মোকদ্দমার অবতারণা করেছে।

লেডী ডাক্তারের রিপোর্ট ও সাক্ষ্যের উপরই তিনি বিশেষ জোর দিয়ে প্রমাণ করার চেষ্টা করেন যে আসামী যদি সত্যিই ক্যাথারিনের উপর পাশবিক অত্যাচার করে থাকবে তা হলে তার গোপন স্ত্রী-অঙ্গে কোন রকম আঘাতের চিহ্ন পাওয়া যায়নি কেন? বিশেষ করে, যদিও সে ঘটনার পর স্ত্রী-অঙ্গে পানি দেয়নি, তবুও সেখানে ডাক্তারী পরীক্ষায় পুরুষের বীর্যের কোন চিহ্ন পাওয়া গেল না কেন?

কৌঁসুলী আরও বললেন যে মহিলার দুশ্চরিত্রতার প্রমাণ পাওয়া

Mamun Academy

যায় তার জেরার যেখানে ক্যাথারিন স্বীকার করেছে যে এখানে আসার আগে সে লারকানায় এক যুবকের বাসায় ৭দিন অবস্থান করেছিল।

কিন্তু মাননীয় জাস্টিস ফারুকী তাঁর বিজ্ঞ রায়ে আসামী পক্ষের সমস্ত যুক্তি খণ্ডন করেন।

শেষোক্ত যুক্তির খণ্ডনে তিনি তাঁর রায়ে বলেন যে, আসামী পক্ষের এই যুক্তি সংসারে অনভিজ্ঞা কোন বালিকার বেলায় প্রযোজ্য হতে পারে। কিন্তু এখানে যে মহিলা জড়িত সে একজন শিক্ষিতা জার্মান মহিলা যে একাই বিশ্ব ভ্রমণে বেরিয়েছে এবং বহির্বিশ্বের অনেক কিছু সে দেখেছে জেনেছে। বন্ধুর পথে সে যাত্রা শুরু করেছে এবং কোথায় কিভাবে স্বাত্মরক্ষা করতে হয় তাও তার ভালভাবে জানা আছে। তাদের দেশে যুবক-যুবতীরা এরকম ভ্রমণে অভিজ্ঞ। যেহেতু লারকানায় সে এক পুরুষের বাড়িতে ৭ দিন কাটিয়েছে তাতেই মনে করার কোন কারণ নেই যে সেখানে মহিলার কোনও অসৎ উদ্দেশ্য ছিল। আর যদি এই মহিলা আসামীর সঙ্গে সহবাসে সত্যিই রাজি হত, তবে সে কোনক্রমেই ওরকম হৈচৈ করে পুলিশ কেস করত না।

আসামী প্রদত্ত গল্পের অসারতা প্রমাণ করতে গিয়ে বিচারপতি বলেন যে, আসামীর বর্ণনা মত যদি এই মহিলা সত্যিই দেহ ব্যবসা করেই অর্থ সংগ্রহ করতে থাকত তা হলে সেদিন তাকে হাতে সুটকেস ও ঘাড়ে হ্যাভার স্যাক নিয়ে লাহোরগামী কোন গাড়িতে লিফট নেয়ার আশায় অনিশ্চিত ভাবে প্রধান সড়কের পাশে এসে দাঁড়াতে হত না। যদি দেহ বিক্রি করে টাকা যোগাড় করাই তার উদ্দেশ্য হত, তবে নিশ্চয়ই তাকে সেজন্যে অপরিচিত স্থান পানো-

য়াকিলে যেতে হত না। বরং সে এভাবে প্রচুর অর্থ করাচীতে বসেই সংগ্রহ করতে পারত—যেখানে সে ৪দিন অবস্থান করেছিল।

মিস ক্যাথারিনকে কোর্টে বিশদভাবে জেরা করা হয়েছে। তাতে কোথাও প্রকাশ পায়নি যে সে বিলাসিতার জীবন যাপন করত অথবা পথে পথে প্রচুর টাকা আয় ও ব্যয় করত। বরং সাক্ষ্য প্রমাণে প্রকাশ পেয়েছে যে মহিলাটি পথে খুবই মিতব্যয়ী ছিল এবং বিদেশে নিজে কষ্ট করে গায়ে খেটে যথাসম্ভব টাকা বাঁচাবার চেষ্টা করত। এটা কিছুতেই বিশ্বাস করা যায় না যে এরকম একজন শিক্ষিতা, অভিজ্ঞা ও বুদ্ধিমতী মহিলা একজন অপরিচিত পথিকের নিকট হঠাৎ দেহ বিক্রি করে অর্থোপর্জানের প্রস্তাব করে বসবে।

বাদিনীর শরীরের ক্ষত চিহ্নের যে কৈফিয়ত আসামী দিয়েছে তাও মাননীয় বিচারপতির বিশ্বাসযোগ্য হয়নি। যদি মহিলা আসামীর সঙ্গে স্বেচ্ছায় সহবাসে ইচ্ছুকই থাকত তবে তার সমস্ত উরুতে ক্ষত চিহ্ন হওয়ার কোন কারণই ঘটতে পারত না। আর তাহলে কেনই বা তাকে জোর করে চেয়ার থেকে হেঁচড়ে কার্পেটের উপর নামাতে হবে?

বরং এই সব ক্ষতচিহ্ন বাদিনীর অভিযোগই সপ্রমাণ করেছে যে আসামী তার ড্রাইভারের সহযোগে জোর করে বাদিনীর উপর পাশবিক অত্যাচার করেছে। আবার বলা হয়েছে যে বাদিনীর মাসিক স্রাব থাকার কারণে শেষ পর্যন্ত আসামী তার সঙ্গে সহবাসে রাজি হয়নি। আসামীর এই যুক্তির অসারতা প্রমাণ করতে গিয়ে মাননীয় জাস্টিস বলেন: আসামীর বর্ণনা মতে সে তাদের মত্ততার এক পর্যায়ে দেখে যে বাদিনী তার গোপন অঙ্গের ভেতর থেকে কিছু বের করে এনে তা বাইরে ফেলে দেবার চেষ্টা করছে। পরে আসামী

আরও দেখে যে তা রক্তমাখা তুলা। এর ফলে সে বুঝতে পারে যে বাদিনীর তখন মাসিক স্রাব হচ্ছিল। এই কারণেও মহিলার সে সময়ে সহবাস থেকে দূরে থাকার ইচ্ছা হওয়া স্বাভাবিক ছিল। প্রকৃতপক্ষে সে প্রায় দু'ঘণ্টা যাবত দুইজন সবল পুরুষকে তার সমস্ত শক্তি দিয়ে প্রতিহত করেছিল এবং অবশেষে যখন সে পরিশ্রমে ভেঙে পড়ে কেবল তখনই যুদ্ধ ত্যাগ করে। যদি এই মহিলা তার মাসিক স্রাব আসামীর কাছ থেকে লুকাবারই ইচ্ছা করত তবে সে অনায়াসে আগে বাথরুমে গিয়ে আসামীর লক্ষ্যে তার তুলা ইত্যাদি ফেলে দিয়ে আসতে পারত। আর সেটাই হত স্বাভাবিক। কিন্তু আসামীর কাহিনী হল নিতান্ত অস্বাভাবিক যা কখনও ধোপে টেকে না।

বাদিনী যখন আসামীর বাসস্থান ত্যাগ করে তখন প্রায়-সন্ধ্যা, আসামীর এই কথাই যদি সত্যি হবে, তবে এই বিদেশী একাকিনী মহিলা কেন ওই অসময়ে অনিশ্চিতের পথে পা বাড়াবে? স্বাভাবিক-ভাবে সে বরং সেই রাত্রে ওখানেই থাকত। অবস্থা দৃষ্টে মনে হয় যে বাদিনী আসামীদের তরফ থেকে রাত্রে আরও অত্যাচারের ভয়ে ভীত হয়ে প্রথম সুযোগেই নিরাপত্তার উদ্দেশ্যে বাংলো ত্যাগ করে। জীপে ড্রাইভারের সাথে চাকর আবদুল্লাকে পাঠানো ও ওদের মাঝ-খানে ক্যাথারিনকে বসাবার চেষ্টা করার মধ্যেই বিচারক মনে করেন যে আসামীদের আরও কোন গভীর দুরভিসন্ধিও হয়ত ছিল। কিন্তু চতুর ক্যাথারিন পথিমধ্যে নেমে যাওয়ায় তাদের সে উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়।

ক্যাথারিনের গোপন-অঙ্গে পুরুষের বীর্যের চিহ্ন পাওয়া যায়নি —সুতরাং পাশবিক অত্যাচারের কাহিনী মিথ্যা, আসামী পক্ষের এই

তর্কের উত্তরে মাননীয় বিচারপতি বলেন যে, সিভিল সার্জেনের সাক্ষ্যে দেখা যায় যে বাদিনীর মাসিক স্রাবের কারণে এবং ঘটনা ও ডাক্তারী পরীক্ষার মধ্যে যে সময় অতিবাহিত হয়েছে, তার কারণেও সে চিহ্ন মুছে যাওয়া স্বাভাবিক। তার স্ত্রী-অঙ্গে কোন আঘাতের চিহ্ন পাওয়া যায়নি তার কারণ বাদিনীর নিজের স্বীকারোক্তিতেই পাওয়া যায়; অর্থাৎ সে আগেই পুরুষ সংসর্গে এসেছিল। কিন্তু তার উরুর অসংখ্য ক্ষত থেকে প্রমাণিত হয় যে আসামীর হীন প্রচেষ্টা বাদিনী তার সমস্ত শক্তি দিয়ে বহুক্ষণ পর্যন্ত প্রতিহত করেছিল।

মাননীয় জাস্টিস ফারুকী আরও বলেন, 'আমি বিশ্বাস করিতে পারি না যে বাদিনী, যে এই বিদেশে নিঃসঙ্গ অবস্থায় ভ্রমণ করছিল, সে এই দূর দেশে এতবড় একটা মিথ্যা কাহিনী বানোয়াট করবে যাতে সে কেবল মাত্র আসামীকেই নয়, এমন কি তার পলাতক ড্রাইভারকেও অভিযুক্ত করছে। আর তার কারণ কিনা সে তার প্রতিশ্রুত টাকার সম্পূর্ণ অংশ পায়নি! আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে বাদিনীর কাহিনী যদি সত্যি না হত, তবে সে অবশ্যই লাহোর যাত্রা করতেই ব্যগ্র হয়ে পড়ত, এবং এভাবে সে তার সমস্ত ভ্রমণ প্রোগ্রাম নষ্ট হতে দিত না। কারণ সে জানত যে বিদেশে কোর্টের এই বিচারে তার অনেক সময় নষ্ট হবে।'

আসামীর বিরুদ্ধে পাশবিক অত্যাচারের দোষ প্রমাণিত হয়েছে বলতে গিয়ে জাস্টিস বলেন, 'আমি নিশ্চিত যে আসামী তার বাসায় নির্জনে এই মহিলাকে পেয়ে তাকে মদ পান করিয়ে তার সঙ্গে জোর করে সহবাসের চেষ্টা করার পরেও সে কাজ সমাধা না করে সে কিছুতেই মহিলাকে ছেড়ে দেয়নি। সময়টাও এখানে দেখতে হবে। বাদিনী আসামীর বাসায় ঢোকে বিকাল ৪টার সময়, আর সন্ধ্যা ৭টার আগে

তাকে সেখান থেকে ছাড়া হয়নি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে বাদিনীর উপরে সত্যি সত্যিই পাশবিক অত্যাচার করা না হলে সে কিছুতেই নিজের উপরে এই কলঙ্কের বোঝা টেনে আনত না। অবিবাহিত এক কুমারীর পক্ষে স্বেচ্ছায় স্বীকার করা যে তার উপর কোন পুরুষ বলাৎকার করেছে—অবশ্যই একটি মহা লজ্জার কথা। যদি সত্যিই আসামী তার উপর বলাৎকার না করত, তবে বাদিনী অনায়াসেই বলতে পারত যে তার উপরে অত্যাচারের চেষ্টা মাত্র করা হয়েছিল কিন্তু বাদিনী সে চেষ্টা ব্যর্থ করে দিতে সক্ষম হয়েছিল, আসামী বা ড্রাইভারের সঙ্গে তার পূর্বের কোন পরিচয় বা রাগারাগি ছিল না।'

মাননীয় জাস্টিস বাদিনীর অভিযোগ সত্য বলে গ্রহণ করেন ও আসামীকে পাশবিক অত্যাচারের দোষে দোষী সাব্যস্ত করেন। কিন্তু যেহেতু আসামীর এই শাস্তির ফলে তার চাকরিও হারাবে —যাতে তার ভবিষ্যৎও অন্ধকার হয়ে যাবে—তাই আসামীকে তিনি কেবল ৩৭৬ ধারার অভিযোগে তিন বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত ও সেই সঙ্গে আরও ২,০০০ (দু'হাজার) টাকা জরিমানা করেন।

বিদেশিনী ক্যাথারিনের ফরিয়াদের চাঞ্চল্যকর মামলার এভাবেই সমাপ্তি হয়।

Mamun Academy

পাখীর সাক্ষ্য

আমরা শুনেছি যে হযরত সোলায়মান (আঃ) পশু-পাখীর ভাষা বুঝতে পারতেন। কিন্তু আর কেউ তা পারতেন বা পারে বলে শোনা যায় না। কিন্তু একটি কাক পাখীর পরোক্ষ সাক্ষীতে সত্যই শেষ মুহূর্তে একটি নির্দোষ লোক ফাঁসির মঞ্চ থেকে রেহাই পেয়ে গিয়েছিল।

প্রায় ১০০ বৎসর আগেকার ঘটনা এটা। ১৮৭০ সালে আমেরিকার টেক্সাসে গ্রিনভিলের নিকটে পাশাপাশি বাস করত দুটি অবস্থাপন্ন পরিবার। দুই পরিবারই সে অঞ্চলে বিখ্যাত ছিল। তাদের নিজেদের মধ্যে অতি ঘনিষ্ঠ পরিচয় ও সখ্যতা বিদ্যমান ছিল। এদের এক পরিবারে ছিল একজন যুবক, নাম টম। আর অন্য পরিবারে ছিল একটি যুবতী মেয়ে, নাম জুলিয়া।

টম ও জুলিয়ার মধ্যে প্রথমে পরিচয় হয় ও পরে তারা উভয়ে উভয়ের প্রেমে পড়ে যায়। সবার আগোচরে পরস্পরের হৃদয় দেয়া নেয়া হয়ে গেল। তখন তারা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার জন্যে পাগল হয়ে উঠল। তাদের পিতামাতাও এই জুটি পছন্দ করল। এবং উভয় পরিবারই তাদের মিলনে দোয়া দেবে বলে ঠিক করল। তারপর কেবল বাকি রইল শিগগির একটি শুভক্ষণ দেখে বিয়ে দেয়া।

সেই সময় আমেরিকায় একটি বিশেষ প্রথার প্রচলন ছিল।

Mamun Academy

বিভিন্ন স্থান থেকে যুবক যুবতীরা, বিশেষ করে নবু দম্পতিরা সাপ্তাহিক অবসর বিনোদনের জন্যে দূরের কোন ফাঁকা কৃষি ফার্মে একত্রিত হত। সেখানে হৈ-হুল্লোড়ের মধ্য দিয়ে সপ্তাহান্তের দিনগুলো কাটিয়ে যুবক-যুবতীরা আবার ফিরে আসত তাদের নিজ নিজ বাড়িতে। সে যুগে পথে ঘাটে প্রায়ই রাহাজানি হত। তাই আত্মরক্ষার তাগিদে প্রায় সকল যুবকই সঙ্গে করে আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে আসত। তবে ওই পিকনিক্ হোমে এসে সেই সব আগ্নেয়াস্ত্র তারা জমা রাখত একটি নির্দিষ্ট ঘরে, যাতে সেখানে হৈ-হুল্লোড়ের সময় কোনরকম দুর্ঘটনা না ঘটে। সপ্তাহান্ত শেষ করে ঘরে ফিরে যাবার সময়ে আবার তারা যে যার অস্ত্র নিয়ে যেত।

বিয়ে ঠিক হয়ে যাবার পর টম ও জুলিয়া উভয়ে একত্রে "উইক এণ্ড" উপভোগ করার জন্যে এমনি একটি পিকনিক্ হোমে গিয়ে হাজির হল এক শুক্রবারে। সেদিন আরও কয়েকটি পার্টিও এসেছিল বিভিন্ন স্থান থেকে ওই হোমে।

এদের মধ্যে পূর্বাঞ্চল থেকে আগত একটি অনন্যা সুন্দরী মেয়ে টমের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। প্রাণোচ্ছল, অপরূপ সুন্দরী এই মেয়েটির দিকে টম যতই তাকায় ততই সে মুগ্ধ হয়ে যায়। ঐ মেয়েটিও টমের মধ্যে যেন এতদিন পর তার আসল মানুষটিকে খুঁজে পেল। সে-ও টমের আহ্বানে সাগ্রহে সাড়া দিয়ে সব সময় টমের পাশাপাশিই থাকতে লাগল। স্বাভাবিকভাবেই টম ও ওই মেয়েটির এহেন আচরণ জুলিয়ার মোটেই মনঃপুত হল না। তবে প্রথমে সে ভাবল যে এটা বোধহয় টমের ক্ষণিকের মোহ। এখান থেকে চলে গেলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু রোববার পর্যন্ত টম ও বিদেশিনী মেয়েটির ঘনিষ্ঠতা এত দৃষ্টিকটুতার পর্যায়ে এসে পৌঁছল যে জুলি-

Mamun Academy

য়ার পক্ষে তা নীরবে সহ্য করা অসম্ভব হয়ে উঠল। রোববার দুপুরে সে ভয়ানক একচোট ঝগড়া করল ওই মেয়েটির সঙ্গে যে হঠাৎ উড়ে এসে জুড়ে বসেছে তার এতদিনের প্রিয় টমকে তার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিতে।

উত্তরে সেই মেয়েটিও তাকে কয়েকটা কড়া কড়া কথা শুনিয়ে দিল। তারপর সে ঠাট্টা করে বলল, 'তোমার না আছে রূপ, না আছে গুণ! কি দিয়ে ধরে রাখবে টমকে? পার যদি তবে নিয়ে যাও না তাকে?' জুলিয়াও নারমুখী হয়ে উঠল। রোববার দিন রাত্রে সেই হোমেই সে আবার এক কুরুক্ষেত্র বাধিয়ে দিল। তারপর সে ভয়ানক ঝগড়া করল টমের সঙ্গেও। সাবধান করে দিল টমকে সে যেন আর সেই মেয়েটার সঙ্গে না মেশে। কিন্তু নবাগতা মেয়েটি এর মধ্যেই টমের হৃদয় পুরোপুরি দখল করে নিয়েছে তাকে দেখে টমের মনে হল যেন আকাশ থেকে স্বয়ং ট্রয়ের হেলেন নেমে এসেছে তারই জন্যে। রূপে, গুণে আনন্দোচ্ছ্বাসে জুলিয়া এর সামনে বোন্ ছার। একে ছেড়ে জুলিয়াকে সে কিছুতেই গ্রহণ করতে পারবে না। এই হোমে এসে এ ব্যাপারে জুলিয়ার এই পাগলামি দেখে টম বড়ই বিব্রত বোধ করতে লাগল। টম জুলিয়াকে যতই বোঝাবার চেষ্টা করে জুলিয়া ততই বেশি ক্ষেপে গিয়ে আরও শোরগোল শুরু করে। লজ্জায় মরে যায় টম। কিন্তু তবুও সে তার 'হেলেন'কে ছাড়তে রাজি নয়। শেষ পর্যন্ত টম রেগে গিয়ে জুলিয়াকে তার শেষ সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে দিল যে ওই সুন্দরী মেয়েটিকেই সে বিয়ে করবে, জুলিয়াকে নয়। জুলিয়াও জানাল যে বাড়ি ফিরে সে দেখে নেবে টমকে।

সেই রাত্রেই ভোরের দিকে জানা গেল যে জুলিয়াকে আর হোমে

Mamun Academy

বা আশেপাশে কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। সকালে অনেক খোঁজাখুঁজির পর জুলিয়ার মৃতদেহ আবিষ্কার করা হল হোমের মাইল দুই দূরে এক ছোট্ট নদীর পাড়ে একটি ওক গাছের নিচে। দেখা গেল তাকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। আর তার পাশে পড়ে রয়েছে একটি পিস্তল। খোঁজ নিয়ে জানা গেল যে ওটা টমেরই পিস্তল।

হৈ চৈ পড়ে গেল আশেপাশে ও ফার্মে সেই পিকনিক্ হোমের বিভিন্ন পার্টির মধ্যে। গতরাতে টম ও জুলিয়ার মধ্যে প্রচণ্ড ঝগড়া ও রাগারাগির কথা, টমের নতুন প্রেমিক এবং ওকে নিয়ে জুলিয়া কর্তৃক টমকে গালিগালাজ ও ফলে একটি বিশ্রী আবহাওয়া সৃষ্টির কথা হোমের সবারই জানা ছিল। সেসব কারণে জুলিয়াকে পথ থেকে সরিয়ে নিষ্কণ্টক হবার জন্যে টমই যে তাকে হত্যা করেছে সকলেই এই সন্দেহ করল। আর তাছাড়া আসল কথা হল টমের পিস্তল দ্বারাই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছে। সেই কারণেও সবার সন্দেহ আরও ঘনীভূত হল।

টম কিন্তু এই সন্দেহের বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদ জানাল। সে এই হত্যাকাণ্ড সম্বন্ধে কিছুই জানে না বলে ঘোষণা করল। তার পিস্তল যে কিভাবে ঘটনাস্থলে গেল তাও সে জানে না।

কিন্তু তখন তার কথা বিশ্বাস করে কে? হত্যাকারী কি সহজে নিজের দোষ স্বীকার করে? বলল সবাই।

এই দুর্ঘটনার পর জুলিয়া ও টমদের পরিবারদের মধ্যে পূর্বের সেই সখ্যতা নিমেষে অন্তর্হিত হয়ে গেল। তারা পরস্পর পরস্পরের ঘোর শত্রু হয়ে দাঁড়াল। জুলিয়া ছিল পিতামাতার অতি আদরের কন্যা। 'উইক এণ্ড'-এ গিয়ে টমের মতিচ্ছন্নতা ও তারপরই

Mamun Academy

জুলিয়ার হত্যাকাণ্ডে স্বভাবতই তারা টমকে দায়ী করল। তারপর টমকে উপযুক্ত শাস্তি দেবার জন্যে তারা উঠে পড়ে লাগল। পুলিশ টমকে গ্রেফতার করল ও তার বিরুদ্ধে কোর্টে চার্জশীট দিল। দোষী সাব্যস্ত হলে টমের প্রাণদণ্ড অবধারিত।

এদিকে টমের পিতামাতা তাদের বাড়ির অনতিদূরে বসবাসকারী এক উদীয়মান তরুণ অ্যাডভোকেট মিঃ ড্যানিয়েল উপথিগ্রোভকে নিযুক্ত করল উকিল হিসাবে। মিঃ ড্যানিয়েল প্রথমে টমের পিতার সঙ্গে ও পরে টমের সঙ্গে এই নিয়ে গভীর আলোচনা করলেন। আলোচনার পর তার স্থির বিশ্বাস জন্মাল যে টম খুন করেনি। কিন্তু টমের বিরুদ্ধে এত সাক্ষ্য প্রমাণ ছিল যে তাকে রক্ষা করা একরকম অসম্ভব ব্যাপার হয়ে পড়েছিল, বিশেষ করে টমের পিস্তল যে পাওয়া গেছে মৃতদেহের পাশে, তার কোন কৈফিয়ত পাওয়া যাচ্ছিল না।

তাছাড়া প্রেমের ব্যাপারে টমের হঠাৎ ডিগবাজি ও তার পরই জুলিয়ার খুন, এই নিয়ে পাড়া প্রতিবেশীরাও টম ও তার পরিবারের উপর ক্ষেপে গিয়েছিল। এই হত্যাকাণ্ড নিয়ে চারদিকে যে রকম হৈ চৈ শুরু হয়ে যায় তাতে টমের পক্ষে সাক্ষ্য প্রমাণ সংগ্রহ করাও কঠিন কাজ ছিল।

এ হেন অবস্থায় ড্যানিয়েল চেষ্টা করে মামলাটির বিচারকার্য যথাসম্ভব দেরি করাচ্ছিলেন এই আশায় যে শেষ পর্যন্ত হয়ত কোন সূত্র পাওয়া যেতে পারে। কারণ তাঁর মন বলছিল যে টম নির্দোষ। তবুও শেষ পর্যন্ত বিচারের দিন ঘনিয়ে এল। আর এক দিন পরেই কোর্টে বিচার শুরু হবে।

এমন সময়, বিচারের আগের রাত্রে, আল্লার তরফ থেকে এসে

গেল এক অপ্রত্যাশিত অমোঘ সাক্ষ্য যা মামলার মোড় সম্পূর্ণ ঘুরিয়ে দিল।

ড্যানিয়েলের একজন রেড ইণ্ডিয়ান বন্ধু ছিল যার একটা পা ছিল খোঁড়া। ঠাট্টা করে সবাই তাকে 'ফোর টো' বলে ডাকত। অতিরিক্ত মদ্যপান, পাগলাটে ও উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপনে সে ছিল অভ্যস্ত। কিন্তু 'ফোর টো' ড্যানিয়েলকে খুবই ভালবাসত আর এদের মধ্যে বন্ধুত্বও ছিল খুবই প্রগাঢ়। তাই যখনই 'ফোর টো' শহরে আসত তখনই সে ড্যানিয়েলের চেম্বারে এসে একবার তার সঙ্গে দেখা করে যেত।

সেই রাত্রেই 'ফোর টো' হঠাৎ এসে হাজির হল ড্যানিয়েলের চেম্বারে। ড্যানিয়েল তখন টমের মামলার চিন্তায় অস্থির। এই সময় আবার পাগলা বন্ধুকে দেখে ড্যানিয়েল বরং বিরক্তই হলেন—এ কারণে যে তাঁর মূল্যবান সময় অপচয় করবে এই মাতাল বন্ধুটি।

ফোর টোর হাতে ছিল একটি ময়লা কাগজ, কাগজটির এক প্রান্ত ছেঁড়া। সেটা দেখে ড্যানিয়েল জিজ্ঞেস করলেন, 'এই নোংরা কাগজটা আবার কিসের?'

'পাখীর লেখা চিঠি এটা।'

'তুমি নিশ্চয়ই আজ বেশি মদ খেয়েছ। পাখী আবার চিঠি লিখতে পারে নাকি?' বিরক্ত হয়ে ড্যানিয়েল বললেন।

'সত্যি বলছি আজ আমি মদ খাইনি। আর এই চিঠি আমি পাখীর কাছ থেকেই পেয়েছি। আজ এটা আমি একটা কাকের বাসার মধ্যে পেলাম। এতে টম ও জুলিয়ার নাম দেখে ভাবলাম এটা বোধহয় তোমার ঐ কেসের ব্যাপারে কাজে লাগতে পারে। তাই নিয়ে এসেছি।'

নাম দু'টি শুনে ড্যানিয়েল চমকে উঠলেন। ছোঁ মেরে তিনি

Mamun Academy

কাগজটি ফোর টোর হাত থেকে নিয়ে নিলেন। কাগজের দিকে তাকাতেই ড্যানিয়েলের চোখ বিস্ফারিত হয়ে গেল। রুদ্ধশ্বাসে তিনি কাগজটি পড়ে ফেললেন, তাঁর মনে হল বুঝি স্বপ্ন দেখছেন। একবার-দুইবার-তিনবার অপলক দৃষ্টিতে তিনি পড়ে ফেললেন ওই লেখাগুলো, এবার তাঁর চোখের কোণে দেখা দিল এক ফোঁটা আনন্দের অশ্রু। ফোর টোকে তিনি জড়িয়ে ধরলেন দু'হাতে। দুই চোখ রগড়ে আবার তিনি পড়লেন সেটা :

'প্রিয় টম,

তুমি জান কি গভীরভাবে আমি তোমাকে ভালবেসেছি। আর আমিও জানতাম যে তুমিও আমাকে সমানভাবে ভালবাসতে। কিন্তু গত-রাত্রে সে ভুল আমার চিরতরে ভেঙেছে। এখন দেখছি যে, যে-কোন অপদার্থ বেহায়া মেয়ে তোমার সামনে এসে তার স্কার্ট একটু উঁচিয়ে দাঁড়ালেই তুমি এমন মজে যাও যে তারপরই সে তোমাকে নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরাতে পারে। এখন আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের ভবিষ্যতের আর কোন আশাই নাই। আর সেই কারণে এটাই হল আমার পক্ষে দ্রুত নিষ্কৃতি পাওয়ার একমাত্র পথ।

জুলিয়া।'

এই চিঠিটা ছিল নিঃসন্দেহে জুলিয়ার নিজেরই হাতের লেখা, আর চিঠির এক অংশ কিছুটা ছেঁড়া ছিল, কাগজটি পুরানো ও ময়লা হয়ে গিয়েছিল। বোঝা যায় বহু রোদ শিশির এর উপর দিয়ে গিয়েছে। কিন্তু তবু এর লেখা স্পষ্ট ভাবে পড়া যায়।

এই চিঠির কথা যখন প্রকাশ পেল তখন সাক্ষীদের মধ্যে যারা জুলিয়ার মৃতদেহ প্রথমে দেখেছিল তারাও এসে জানাল যে মৃত জুলিয়ার বুকে একটি সেপটিপিন আঁটা ছিল ; আর তার সঙ্গে এক-

টুকরো ছেঁড়া কাগজও ছিল। তা তারা দেখেছে। সেই পিন ও কাগজের রহস্য তখন তারা কেউ বুঝতে পারেনি। এবার এই ছিন্ন চিঠিটি দেখে তারা বুঝতে পারছে যে এই চিঠিটির ছেঁড়া অংশটুকুই তারা জুলিয়ার বুকের সঙ্গে সেপটিপিন দিয়ে আঁটা অবস্থায় দেখেছিল।

অতঃপর বিচারের সময় ড্যানিয়েল জুরীদের বুঝাতে সক্ষম হলেন যে প্রেমে ব্যর্থ হয়ে ক্ষোভে দুঃখে সেই রাত্রেই জুলিয়া গোপনে টমের পিস্তল বের করে নিয়ে তা দ্বারা নিজেই আত্মহত্যা করেছে। তবে আত্মহত্যার আগে আত্মহত্যার কারণ ব্যাখ্যা করে এই পত্রটি নিজ হাতে লিখে সে নিজের বুকের উপর সেপটিপিন দিয়ে এঁটে দেয়। কিন্তু তার মৃতদেহ কেউ দেখার আগেই ভোরে যখন সেই কাগজটি ফর ফর করে বাতাসে উড়ছিল তখন একটি কাক এসে তার বাসা তৈরির জন্যে ছোঁ মেরে কাগজটি টেনে ছিঁড়ে নিয়ে যায় তার বাসায়। সেদিন 'ফোর টো' যখন একটি গাছের নিচ দিয়ে যাচ্ছিল তখন কাকের বাসাটি সে নিচে পড়ে থাকতে দেখে। বোধহয় আগের রাত্রের ঝড়ে বাসাটি নিচে পড়ে যায়। সেই বাসা হাতড়ে 'ফোর টো' আবিষ্কার করেছে ঐ অমূল্য চিঠিটি।

এরপর এই মামলার জুরীরা সবাই একমত হয়ে টমকে নির্দোষ বলে ঘোষণা করে ও সে বেকসুর খালাস পায়। ঠিক সময়মত আল্লার সাক্ষী কাকের পাঠানো চিঠিটিই নাটকীয়ভাবে ফাঁসির মঞ্চ থেকে টমের জীবন রক্ষা করল।

তাই ত কথায় বলে,—'রাখে আল্লাহ মারে কে?'

Maman Academy

সন্দেহের অবকাশে মুক্তি

বিকেল চারটার সময়ে রাজলক্ষ্মী যখন সন্তর্পণে বাড়িতে ঢুকল, তখন তার দিকে তাকিয়েই আঁৎকে উঠল তার মা। সভয়ে দেখল যে রাজলক্ষ্মীর উভয় পায়ের উরু বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে তাজা রক্ত। তার পরনের কাপড়ের অংশও রক্তে ভিজে লাল হয়ে গেছে। চুল তার উস্কোখুস্কো। চোখে উদাস দৃষ্টি।

'কি হয়েছে তোর? কাপড়ে রক্ত কেন?' সভয়ে প্রশ্ন করল তার মা।

রাজলক্ষ্মী কিন্তু কোন উত্তর না দিয়েই দু'হাতে মুখ ঢেকে টলতে টলতে পাশ কাটিয়ে নিজের ঘরের বিছানায় গিয়ে ধপ করে শুয়ে পড়ল। আর ডুকরে ডুকরে কাঁদতে লাগল।

মা অনেকটা আঁচ করতে পারল ব্যাপার কি? বুঝতে পারল যে রাজলক্ষ্মীর গোপন অঙ্গ দিয়েই গড়িয়ে পড়ছে তাজা রক্ত। 'কে তোর এই সর্বনাশ করেছে?' জিজ্ঞেস করল মা মেয়ের মাথায় হাত দিয়ে।

রাজলক্ষ্মী কিন্তু কোন কথা না বলে আগের মতই কাঁদতে লাগল। এবার মা ছুটে গিয়ে রাজলক্ষ্মীর বাবাকে ডেকে নিয়ে এল। তাদের কাছে রাজলক্ষ্মী যে বিবরণ দিল তা এই:

সেদিন ছিল ১০ই জ্যৈষ্ঠ (১৯৩৩ সাল)। রাজলক্ষ্মী তাদের

Mamun Academy

কালনা গ্রামের (বর্দ্ধমান জিলা) পাঁচু মারিয়ার বাড়িতে যাচ্ছিল তার মেয়ের বিয়ের উৎসব উপলক্ষে। তখন বেলা প্রায় ৩টা। রাজলক্ষ্মী পথে যখন সুরেন্দ্র নাথের বাড়ির কাছাকাছি এল তখন রাস্তায় সুরেন্দ্রের স্ত্রীর সঙ্গে তার দেখা।

সুরেন্দ্রের স্ত্রীর বয়স তখন ২৬ বৎসর হলেও, তার দু' একটি চুলে তখনই পাক ধরেছে। রাজলক্ষ্মীকে দেখেই সুরেন্দ্রের স্ত্রী তাকে কাছে ডেকে বলল, 'কোথায় যাচ্ছ এই ভর দুপুর বেলা ?'

'কেন পাঁচুর মেয়ের বিয়েতে যাচ্ছি। খুব হৈ চৈ হচ্ছে সেখানে।'

'সে ত রাত্রে। এখনও অনেক দেরি। আমিও ত যাব সেই বিয়েতে। এক সঙ্গেই বরং যাওয়া যাবে সেখানে,' বলল সুরেন্দ্রের স্ত্রী।

'বেশ ভালই হবে, তাহলে চটপট তৈরি হয়ে নাও,' তাড়া দিল রাজলক্ষ্মী।

'আচ্ছা যাব যাব, তবে এত তাড়া কিসের ? তুমি বরং কিছুক্ষণ আমার মাথার পাকা চুল তুলে দাও।'

'ভারী ত বয়স হয়েছে ? এর মধ্যেই পাকা চুল ? কই এখানেই বস, দেখি পাওয়া যায় কিনা পাকা চুল।' এই বলে রাজলক্ষ্মী ওর হাত ধরে নিচে বসতে বলল।

'না না, এখানে নয়। রাস্তার পাশের লোকেরা দেখে কি ভাববে বল ত ? তার চেয়ে চল আমাদের বাড়িতে। সেখানেই বেছে দেবে আমার চুল।'

অগত্যা রাজলক্ষ্মী রাজি হল। সুরেন্দ্রের বাড়ির দিকেই পা বাড়াল দু'জনে।

ছটি মাত্র ঘর সুরেন্দ্রের বাড়িতে, রাজলক্ষ্মীকে নিয়ে সুরেন্দ্রের স্ত্রী তাদের থাকবার ঘরেই এসে ঢুকল।

রাজলক্ষ্মী যেই মাত্র সুরেন্দ্রের স্ত্রীর চুলের বেণী খুলে নিয়ে তা

Mamun Academy

বাছতে বসেছে এমন সময় পিছনের দরজা দিয়ে হঠাৎ সুরেন এসে ঢুকল সেই ঘরে। একেবারে সোজা রাজলক্ষ্মীর পাশে এসে বসল সুরেন। তারপর হঠাৎ সে রাজলক্ষ্মীকে তার বুকের মধ্যে চেপে ধরে আদর করতে চেষ্টা করল। স্ত্রীর সামনে সুরেনের হঠাৎ এরকম ব্যবহারের জন্যে রাজলক্ষ্মী মোটেই প্রস্তুত ছিল না, সে এক ঝটকায় মুক্ত হয়ে বাইরে যেতে চেষ্টা করল এবং সুরেনের স্ত্রীরও সাহায্য প্রার্থনা করল। কিন্তু আশ্চর্য! কোথায় স্বামীকে ঠেকাবে, তা না করে স্ত্রীও এসে যোগ দিল এবার স্বামীর সঙ্গে। দুজনে মিলে রাজলক্ষ্মীকে জোর করে বিছানায় শুইয়ে দিল ও তার পরনের কাপড় খুলে ফেলল। এর মধ্যে সুরেনের স্ত্রী দৌড়ে গিয়ে ঘরের কোণ থেকে এক বাটি তেল নিয়ে এল, সেই তেল সে রাজলক্ষ্মীর স্ত্রী-অঙ্গে মেখে দিল, সেই সঙ্গে সুরেনও কিছু তেল তার অঙ্গে মাখল। তারপর সুরেন জোর করে রাজলক্ষ্মীর উপর পাশবিক অত্যাচারের চেষ্টা করল, রাজলক্ষ্মী সমস্ত শক্তি দিয়ে বাধা দিতে লাগল। ফলে সুরেন প্রথমে তার সেই হীন কাজে সফল হতে পারল না। এ অবস্থায় সুরেনের স্ত্রী এসে সাহায্য করতে লাগল তার স্বামীকে। ততক্ষণে রাজলক্ষ্মী বিছানা থেকে উঠে দাঁড়িয়েছে। সুরেনের স্ত্রী আবার তাকে জোর করে শুইয়ে দিল ও সেই সঙ্গে তার দুই বাহু চেপে ধরল যাতে সে নড়াচড়া করতে না পারে। অসহায় রাজলক্ষ্মী একবার চিৎকার করতে চেষ্টা করল, কিন্তু সুরেনের স্ত্রী সঙ্গে সঙ্গে তার মুখ চেপে ধরল। অতঃপর রাজলক্ষ্মীর পক্ষে আর বাধা দিয়ে ঠেকিয়ে রাখা সম্ভব হল না; সুরেন জোর করে তার ওপর অত্যাচার চালাল, আর তার স্ত্রী কেবল সেই জঘন্য কাজের দৃশ্য নিজ চোখেই দেখল তাই নয়, সে সর্বক্ষণ পাশে থেকে তার স্বামীকে এ ব্যাপারে সক্রিয় ভাবে সাহায্যও

Mamun Academy

করল।

এরপর সুরেন পাশের ঘরে চলে গেল। তখন সুরেনের স্ত্রী রাজলক্ষ্মীকে অভয় দিয়ে বলল যে এ ব্যাপার কেউ জানতে পারবে না। রাজলক্ষ্মী যেন এ নিয়ে আর কোন উচ্চবাচ্য না করে। তার স্বামীর স্বাস্থ্য রক্ষার জন্যে এ কাজটির খুব প্রয়োজন ছিল। রাজলক্ষ্মীকে সে অনেকগুলো ভাল ভাল চুড়ী দেবে বলে লোভ দেখাল। তবে তার আগে সে পাশের পুকুর থেকে ভাল করে স্নান করে ও সেই সংগে তার পরিধানের কাপড়চোপড় ভাল করে ধুয়ে আসতে বলল। স্নানের পর রাজলক্ষ্মীর ব্যবহারের জন্যে সে তার নিজের একটি পরিষ্কার কাপড়ও গুছিয়ে রাখল। স্নান করে এলেই সে নিজ হাতে রাজলক্ষ্মীকে নতুন চুড়িগুলো পরিয়ে দেবে। তাই স্নান সেরেই যেন রাজলক্ষ্মী আবার বাড়ি ঘরে চলে আসে। এই বলে সুরেনের স্ত্রী রাজলক্ষ্মীর হাত ধরে তাকে পুকুরের দিকে ঠেলে দিল।

রাজলক্ষ্মীর কিন্তু তখনও খুব জ্বালা করছিল গোপন অঙ্গে। রক্ত গড়িয়ে পড়ছিল সেখান থেকে। সুরেনের বাড়ি থেকে রাজলক্ষ্মীদের বাড়ি ছিল ১০০ গজের মত দূরে। সে সেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে পুকুর ঘাটে না গিয়ে সোজা চলে এল তার নিজ বাড়িতে।

মেয়ের কাছে এ কাহিনী শুনে বাপ মা দুজনেই হায় হায় করে উঠল। সুরেনকে যথোচিত শাস্তি দেবার উদ্দেশ্য রাজলক্ষ্মীর বাপ তখনই ছুটল থানায়। সেখানে গিয়ে সে সব জানিয়ে একটি এজাহার দিল।

এজাহার রেকর্ড করেই পুলিশ দৌড়ে এল কালনা গ্রামে তদন্তের জন্যে। এসব মামলায় তদন্তে দেরি হলে প্রমাণ নষ্ট হবার সম্ভাবনা খুব বেশি থাকে। পুলিশ রাজলক্ষ্মীর রক্তমাখা কাপড়-চোপড়

নিজ হেফাজতে নিয়ে নিল। সেই সংগে রাজলক্ষ্মীকেও পাঠানো হল ডাক্তারী পরীক্ষার জন্যে।

সুরেন ও তার স্ত্রীকে পুলিশ গ্রেপ্তার করল। সুরেনকেও পাঠানো হল ডাক্তারী পরীক্ষায়। তার বাড়ি তন্ন তন্ন করে খুঁজেও কিন্তু রাজলক্ষ্মীর গোপন অঙ্গে মাখানো সেই তেলের পাত্র বা বাকি তেলের সন্ধান পাওয়া গেল না।

রাজলক্ষ্মীর ডাক্তারী পরীক্ষায় দেখা গেল যে তার যোনীপথ খানিকটা ছিঁড়ে গেছে, আর সেই ক্ষত থেকেই রক্ত বেরিয়ে তার উরু-দেশ ও কাপড়চোপড় ভিজে গিয়েছিল। তার স্ত্রী-অঙ্গের ভেত-রেও আঘাতের দরুণ কিছু রক্ত জমে আছে দেখা গেল। তবে তার শরীরের আর কোথাও কোন আঘাতের চিহ্ন পাওয়া গেল না। ডাক্তা-রের মতে রাজলক্ষ্মীর বয়স তখন ১৪ বৎসরের মত হবে। তবে বয়স অনুপাতে তার যোনীপথ অনেক বেশি প্রশস্ত ছিল। ডাক্তার তাকে পরীক্ষার পর আরও বুঝতে পারেন যে রাজলক্ষ্মী এই ঘটনার অন্তত তিনমাস আগে থেকেই বহুবার পুরুষ সংসর্গে এসেছিল, আর সে কারণেই বয়স অনুপাতে তার অস্বাভাবিক শারীরিক বৃদ্ধি হয়েছিল।

ডাক্তারী পরীক্ষায় কিন্তু সুরেনের পুরুষাঙ্গে বা শরীরের কোথাও কোন ক্ষতচিহ্ন দেখা গেল না। তার অঙ্গে বা কাপড়ে কোন তেলের চিহ্ন বা রক্তের দাগও পাওয়া যায়নি। অবশ্য তেলের চিহ্ন রাজ-লক্ষ্মীর কাপড়ে বা গোপন-অঙ্গেও ছিল না।

পুলিশ যথারীতি তদন্তের পর আসামী সুরেন্দ্র নাথের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৭৬ ধারা মতে নাবালিকা রাজলক্ষ্মীর উপরে পাশবিক অত্যাচারের অভিযোগে চার্জশীট দাখিল করল।

১৯৩৩ সালের জুলাই মাসে বর্ধমানের তৎকালীন সেশান জজ

বাবু নরেন্দ্রনাথ মুখার্জীর কোর্টে জুরীর সামনে এই চাঞ্চল্যকর মামলার বিচার শুরু হয়।

বিচার শেষে জুরীগণ একমত হয়ে আসামী সুরেন্দ্রকে নাবালিকা রাজলক্ষ্মীর উপরে বলাৎকারের অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করে রায় দেন। জজ বাহাদুরও জুরীগণের সঙ্গে একমত হয়ে আসামী সুরেনকে পাঁচ বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দেন।

এই আদেশের বিরুদ্ধে আসামী কলকাতার মহামান্য হাইকোর্টে এক আপীল দায়ের করে।

কলকাতা হাইকোর্টের তৎকালীন ইংরেজ বিচারপতি জাস্টিস উইলিয়ামস্ ও জাস্টিস হ্যাণ্ডারসনের কোর্টে এই আপীলের শুনানী হয়।

আপীলের শুনানীর সময় বিচারপতিগণ কেসের সমগ্র নথিপত্র ঘেঁটে দেখতে পান যে এই মামলায় সরকার পক্ষের প্রধান ও একমাত্র দেখা সাক্ষী রাজলক্ষ্মী বিপক্ষের অ্যাডভোকেটের জেরার উত্তরে বলেছিল :

জেরাঃ তোমাদের বাড়ি আসামী সুরেনের বাড়ি থেকে কত দূরে অবস্থিত ?

উত্তরঃ বেশি দূরে নয়। প্রায় ১০০ গজের মধ্যে।

জেরাঃ এর মাঝে অনেক বাড়ি-ঘর ও দোকান-পাট আছে ?

উত্তরঃ হ্যাঁ, তা আছে। এলাকাটি বসতিপূর্ণ।

জেরাঃ সুরেন্দ্রের স্ত্রীর সঙ্গে তোমার আগের পরিচয় ছিল ?

উত্তরঃ ঠিক পরিচয় ছিল না। তবে তাকে আমি দেখেছি। আর সেও বোধহয় আমাকে দেখে থাকবে। তবে আমাদের মধ্যে যাতায়াত ও কথাবার্তা ছিল না।

Mamun Academy

জেরাঃ তা হলে একজন অপরিচিত মেয়েলোক হঠাৎ তোমাকে তার পাকা চুল বাছতে বলল, আর তুমিও কি ভাবে তাতে রাজি হয়ে তার সঙ্গে তার বাড়ি গেলে ?

উত্তরঃ আমি তাকে আগেই চিনতাম, তাই গিয়েছিলাম।

জেরাঃ সুরেন্দ্রের বাড়িতে কয়টি কামরা ?

উত্তরঃ দুইটি।

জেরাঃ ওর আশেপাশে বোধহয় আরও বাড়ি ঘর আছে ?

উত্তরঃ হ্যাঁ, তা আছে।

জেরাঃ আচ্ছা তোমার ওপর যখন অত্যাচার চলছিল, তখন অন্য কামরাটিতে কে ছিল ?

এবার একটু চিন্তা করে রাজলক্ষ্মী উত্তর দিলঃ সেখানে কেউ ছিল না।

জেরা : কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট তুমি বলেছ যে সে সময়ে পাশের কামরায় আরও দুজন মহিলা ছিল। তোমার কোন উক্তি সত্যি ? দৃঢ় কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন বিপক্ষ দলের অ্যাডভোকেট। বলা তিনি ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট দেয়া রাজলক্ষ্মীর উক্ত বিবৃতির প্রতিও কোর্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন।

উত্তর : ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট সে কথা বলেছি কিনা তা আমার মনে নেই। উত্তর দেয় রাজলক্ষ্মী শঙ্কিত ভাবে।

জেরা : আচ্ছা সুরেন্দ্র যখন তোমার উপর অত্যাচারের চেষ্টা করছিল তখন সেই ঘরের উভয় কামরার দরজা কি বন্ধ ছিল, না খোলা ছিল ?

উত্তর : দুটি দরজাই খোলা ছিল।

জেরা : সেই সময় তুমি চিৎকার করনি কেন ?

উত্তর : কারণ সুরেনের স্ত্রী আমার মুখ চেপে ধরে রেখেছিল।

Mamun Academy

জেরা : সে যখন তেল আনতে গেল ও তোমার গোপন অঙ্গে তা মাখতে লাগল তখন ত তুমি চিৎকার করতে পারতে ?

উত্তর : আমার ভয় করছিল।

জেরা : তাহলে কোন সময়েই তুমি বাধা দাওনি বা চিৎকার করোনি ?

উত্তর : আমি বাধা দেয়ার চেষ্টা করেছি। কিন্তু সফল হইনি। তবে চিৎকার করতে পারিনি ভয়ে।

জেরা : বেশ, কাজ শেষে যখন তুমি পুকুর ঘাটের দিকে গেলে তখন সেদিকে ত অনেক বাড়িঘর ও লোকজন ছিল। তাদের কাউকে তুমি তোমার দুঃখের কথা বলোনি কেন ?

উত্তর : লজ্জায় বলিনি।

জেরা : সেই সময় তুমি ত কোন রকম ক্রন্দন করোনি, কেমন ?

উত্তর : না। আমি তখন বাড়ি ফেরার জন্যে ব্যস্ত ছিলাম।

এবার প্রসঙ্গ বদল করে বিপক্ষ দলের অ্যাডভোকেট বেশ নরম কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন রাজলক্ষ্মীকে :

জেরা : শশী বেওয়া নামে তুমি কাউকে চেন কি ?

উত্তর : হ্যাঁ, চিনি তাকে আমি পিসী বলে ডাকি।

জেরা : সে ত প্রায়ই তোমার কাছে আসত ? আর মাঝে মাঝে তুমি ও তার সঙ্গে বাইরে যেতে, তাই না ?

উত্তর : হ্যাঁ, তার সঙ্গে মার সম্মতি নিয়ে বাইরেও বেড়াতে যেতাম।

জেরা : তুমি কি জানতে যে সে একজন বেশ্যা ?

উত্তর : এ কথা ঠিক নয়।

রাজলক্ষ্মীর মা এর পরে উঠে আসে সাক্ষীর কাঠগড়ায়।

Mamun Academy

বিপক্ষের অ্যাডভোকেট অন্যান্য প্রশ্নের সঙ্গে তাকে নিম্নলিখিত জেরা করেন।

জেরা : আপনি ত একাধারে নারী, স্ত্রী ও জননী। আচ্ছা বলুনত এটা কি আপনার কখনও বিশ্বাস হয় যে ২৬ বৎসরের একজন যুবতী স্ত্রীর চোখের সামনে তার স্বামী তারই বাড়িতে বসে এক অসহায়া নাবালিকাকে নির্মমভাবে ধর্ষণ করতে পারে ? কেবল তাই নয়, সেই জঘন্য কাজে স্বামীকে বাধা না দিয়ে তার স্ত্রী কি তাকে সক্রিয় ভাবে সাহায্য করতে পারে ?

একটু চিন্তা করে রাজলক্ষ্মীর মা অবনত মস্তকে উত্তর দিল :

উত্তর : নারী চরিত্রের দিক থেকে, সুরেন্দ্রের স্ত্রীর ওরকম ব্যবহার অস্বাভাবিক বৈকি। তবে কোন পুরুষ যৌন রোগে আক্রান্ত হলে, আমাদের অঞ্চলে প্রবাদ আছে যে সেই পুরুষ যদি কোন কুমারী মেয়ের সঙ্গে যৌন সংসর্গে লিপ্ত হতে পারে তবে সে সেই মহা ব্যাধি থেকে মুক্ত হতে পারে। আমার মনে হয় এ ক্ষেত্রে স্বামী সুরেনকে রোগমুক্ত করার জন্যেই সুরেন্দ্রের স্ত্রী স্বভাব বিরুদ্ধ হলেও এই জঘন্য কাজে তার স্বামীকে সহায়তা করেছিল।

তারপর ডাক পড়ল ডাক্তারের সরকারী সাক্ষী হিসাবে, ডাক্তার তাঁর সাক্ষীতে কোর্টকে জানায় যে তিনি ঘটনার পর পরই আসামী সুরেনকে ভাল ভাবে পরীক্ষা করে দেখেন, তাঁর মতে ঘটনার সময় বা তার আগে কখনও সুরেন যৌন রোগগ্রস্ত ছিল না। জোর করে এক নাবালিকার উপর পাশবিক অত্যাচার করলে তার পুরুষাঙ্গে সামান্য ক্ষত হওয়াও স্বাভাবিক ছিল।

ডাক্তার রাজলক্ষ্মীকেও পরীক্ষা করেন। তিনি পরীক্ষায় দেখতে পান যে বয়স অনুপাতে রাজলক্ষ্মীর স্ত্রী-অঙ্গের প্রসারতা ও তার স্তন

Mamun Academy

যুগলের আকার দেখে মনে হয় যে তার বয়স ১৪ বৎসর হলেও সে ঘটনার অন্তত তিন মাস পূর্ব থেকেই পুরুষ সহবাসে লিপ্ত হয়। আর তারপর থেকে সে প্রায়ই ওই কাজে অভ্যস্ত ছিল।

ডাক্তার আরও জানান যে, ঘটনার পর পরই তিনি আসামী ও রাজলক্ষ্মী উভয়কেই পরীক্ষা করেছিলেন। কিন্তু তাদের কারও শরীরের কোন অংশে কোন আঘাতের চিহ্ন পাননি। তাই তাঁর মতে ঘটনার দিন রাজলক্ষ্মীর সম্মতিক্রমেই সঙ্গম হয়, তার ওপর কেউ জোর করে পাশবিক অত্যাচার করেছিল বলে মনে হয় না। একমাত্র তার যোনী প্রদেশের কিঞ্চিত ক্ষত ছাড়া তার শরীরের আর কোথাও কোন ক্ষতের চিহ্ন ছিল না, আর ওই সামান্য ক্ষত স্বাভাবিক সঙ্গমেও হতে পারে।

অন্যান্য সাক্ষীদের কাছ থেকে জানা যায় যে শশী বেওয়া ছিল একজন বেশ্যা। আর রাজলক্ষ্মীর সঙ্গে তার বেশ ঘনিষ্ঠতা ছিল। আরও প্রকাশ পায় যে ঘটনার দিন পাঁচুর বাড়িতে প্রকৃতপক্ষে কোন বিয়ের অনুষ্ঠানই হয়নি, এছাড়া সেই তারিখে হিন্দু পঞ্জিকা অনুযায়ী হিন্দু সমাজে কোন বিয়ে হওয়াও সম্ভব ছিল না। এব্যাপারে রাজলক্ষ্মী গোড়া থেকেই সম্পূর্ণ মিথ্যা উক্তি করে এসেছে বলে মনে হয়।

মাননীয় বিচারপতি এই মামলার প্রধান সাক্ষী রাজলক্ষ্মীর উক্তির অসারতা সম্বন্ধে বলেন যে সে তার সাক্ষ্যতে বলেছে যে সেদিন বিকাল ৩টার সময়ে সে তার বাড়ি থেকে পাঁচুর বাড়ির দিকে রওনা হয়। অথচ তার মার সাক্ষ্য থেকে প্রকাশ পায় যে সেদিন রাজলক্ষ্মী দুপুর ১২টার সময়ে তার বাড়ি থেকে সেজেগুজে বের হয়ে যায় ও বিকাল ৪টার সময়ে ওই অবস্থায় ফিরে আসে, তা হলে সেই দীর্ঘ

Mamun Academy

চার ঘণ্টা রাজলক্ষ্মী কোথায় কাটিয়েছিল তার কোন সদুত্তর পাওয়া যায়নি। আর তার কথা বিশ্বাস করলেও সুরেনের ওখানে সে এক ঘণ্টার বেশি থাকেনি। তাহলে বাকি সময় সে কোথায় ছিল? আর কেনই বা এ ব্যাপারে রাজলক্ষ্মী সত্য গোপন করছে?

মাননীয় বিচারপতি আরও বলেন যে রাজলক্ষ্মীই এই কেসে প্রধান ও একমাত্র দেখা সাক্ষী। কিন্তু তার ওপরে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করে এই মামলার আসামীর সাজা দেয়া কি উচিত হবে? প্রথমত, এটা পরিষ্কার প্রকাশ পেয়েছে যে রাজলক্ষ্মী একটি অসৎ চরিত্রের মেয়ে। আবার সে কোর্টে দাঁড়িয়েও বহু মিথ্যা কথা বলেছে।

আসামী সুরেনের কোন যৌন ব্যাধি ছিল বলে মোটেই প্রমাণিত হয়নি। সেক্ষেত্রে তার যুবতী স্ত্রী তারই বাড়িতে বসে এরকম একটি জঘন্য কাজে স্বামীকে বাধা না দিয়ে বরং সাহায্যকরবে এটা যে কোন স্ত্রীর জন্যেই স্বভাব বিরুদ্ধ ও সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক।

রাজলক্ষ্মী আরও বলেছে যে ঘটনার সময় আসামীর ঘরের উভয় দরজাই খোলা ছিল। এটাও অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে খুবই অস্বাভাবিক বলে মনে হয়। এরকম একটি গর্হিত ও জঘন্য কাজ কেউ দিন দুপুরে দরজা খোলা রেখে করে না, বিশেষ করে যখন আশেপাশে অন্য লোকেরা বসবাস করে। আবার ঘটনার সময় পাশের ঘরে দুজন মহিলা বসে থাকা সত্ত্বেও এ রকম ঘটনা অস্বাভাবিক বলে মনে হয়—যদিও রাজলক্ষ্মী সর্বদাই সুরেনের বিরুদ্ধে তার অভিযোগ সম্বন্ধে দৃঢ়তার সঙ্গে বলে গেছে।

ঘটনার সময়ে ও পরে, বিশেষ করে বাড়ি ফেরার সময়ে বহু লোকের বাড়িঘর ও দোকান তার পথে পড়েছিল। কিন্তু রাজলক্ষ্মী সে সময়ে কোন রকম ক্রন্দন ত করেইনি অত্যাচারের কাহিনীও সে কাউ-

Manik Academy

কেই বলেনি।

এটাও ঘটনাদৃষ্টে অস্বাভাবিক বলে মনে হয়। এও হতে পারে যে রাজলক্ষ্মীর মত একজন চরিত্রহীনা মেয়ে সেদিন বাড়ি থেকে ঘণ্টা চারেক অনুপস্থিতির সময়ে বাইরে এক বা একাধিক লোককে নিজেই দেহদান করেছিল। কিন্তু রক্তস্রাবের কারণে যখন মায়ের কাছে এসে সে ধরা পড়ে গেল তখন সেই রক্তপাতের কৈফিয়ত স্বরূপ মার কড়া প্রশ্নের উত্তরে সে প্রকৃত ব্যক্তির পরিচয় গোপন রেখে আশে-পাশের কারও ওপরে সেই দোষ চাপিয়ে দিয়েছিল। কারণ কুমারী রাজলক্ষ্মী স্বেচ্ছায় কারওসঙ্গে সহবাসে লিপ্ত হয়েছিল, একথা শুনলে তার বাপ মা ভয়ানক শাস্তি দেবে সেই আশঙ্কাতেই এই ধরনের মেয়েরা উপস্থিত বুদ্ধিমত এরকম বলাৎকারের গল্প ফেঁদে বসে।

আসামীকে কখনও রাজলক্ষ্মীর সঙ্গে ঘটনার দিন দেখা গেছে বলে আর কোন সাক্ষীই বলেনি, ডাক্তারী পরীক্ষায়ও তার বিরুদ্ধে কিছু পাওয়া যায়নি। তাই, বিচারপতিগণের মতে, দায়রা জজ বিচারের সময় কেসের সে সমস্ত অসঙ্গতি ও অস্বাভাবিকতার কথা জুরীদের ভালভাবে বুঝিয়ে দেননি। এবং তা যদি তিনি দিতেন তবে নিশ্চয়ই জুরী মহোদয়গণ আসামীকে দোষী বলে রায় দিতে পারতেন না। কারণ একমাত্র রাজলক্ষ্মীর মত একজন সন্দেহজনক চরিত্রের মেয়ের সাক্ষ্যের ওপর বিশ্বাস করে আসামীকে সাজা দেয়া মোটেই নিরা-পদ নয়।

তাই বিচারপতিদ্বয় আসামী সুরেনকে সন্দেহের অবকাশে মুক্তি প্রদান করেন।

Manik Academy

মীরপুরের জোড়া খুন

ঢাকার মীরপুর এলাকা তখনও এত জনাকীর্ণ ও কর্মব্যস্ত ছিল না। ১৯৫৭ সালের জানুয়ারী মাসে যখন এই লোমহর্ষক হত্যাকাণ্ডটি ঘটে তখন মীরপুর ছিল অনেকটা ফাঁকা ও জনবিরল এলাকা। দু'একটি করে ছোট ছোট কলকারখানা গড়ে উঠতে শুরু করেছে তখন এর আশেপাশে।

মীরপুরে তখন 'ঢাকা ব্রিক ও টালি ফ্যাক্টরী' চালু হয়ে কাজ শুরু করেছে সবেমাত্র।

ফ্যাক্টরী হতে একটু দূরে সদ্য তৈরি করা হয়েছে দুটি সুন্দর নতুন বাংলো। ২নং বাংলোতে থাকেন ফ্যাক্টরীর মালিক 'মিঃ আর. এম. এইচ. হীরজী,' তাঁর স্ত্রী মিসেস গুলশান হীরজী আর তাদের পাঁচ-ছয় বৎসরের একটি ফুটফুটে সুন্দর কন্যা। ওই বাংলোরই অপর অংশে থাকত মিঃ আমানুল্লাহ ভিলানী। তিনি ছিলেন মিসেস হীরজীর ভাই এবং ফ্যাক্টরীর অফিস ম্যানেজার। মিঃ হীরজীর চাচাত ভাই রমজান আলী হাসান হীরজী ছিলেন ফ্যাক্টরীর ওয়ার্ক ম্যানেজার। তিনি থাকতেন ফ্যাক্টরীর ১নং বাংলোতে তাঁর পরিবার নিয়ে।

ঘটনাটি ঘটে ১৯৫৭ সালের ১৭ই জানুয়ারী রাত্রে ২নং বাংলোতে। মিঃ এইচ. হীরজী সেদিন ছিলেন কলকাতায়। তাঁর এক বোনের বানু শরীফ সেদিন ওই বাংলোয় বেড়াতে এসেছিলেন। রাত

Mamun Academy

৮-১৫ মিনিটে ২নং বাংলোর ডাইনিং হলে সবাই খেতে বসেছে এক সঙ্গে। গল্প-গুজব ও হৈ-চৈ এর মধ্যে খাওয়া চলছে। আর বাবুর্চি খাবার পরিবেশন করছে, ঠিক এমন সময় হঠাৎ ডাইনিং হলের খোলা দরজার সামনে এসে দাঁড়াল দু-তিনজন লোক যমদূতের মত, এদের মধ্যে সবচেয়ে লম্বা লোকটির হাতে একটি বন্দুক। তার নাক মুখ ঢেকে বাঁধা একটি কাপড়ের পটি, কেবল চোখ দুটি খোলা। এদের দেখে সবাই ভয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠবার চেষ্টা করল। কিন্তু আগন্তুকদের একজন কর্কশ স্বরে বলে উঠল, 'খবরদার। কেউ নড়তে পারবে না, নড়লেই গুলি করব।' কিন্তু এই বন্দুকধারী ও মুখোশ পরা লোকটিকে দেখে হঠাৎ মহিলা দুজন অর্থাৎ মিসেস গুলশান হীরজী ও শের বানু সাফ আতঙ্কে মুহূর্তের মধ্যে ছুটে বারান্দায় বেরিয়ে এলেন। এখানে বলে রাখা ভাল যে মিসেস হীরজী একজন নামকরা লক্ষ্যভেদী ছিলেন। বহুবার তিনি বিভিন্ন পিস্তল ও রাইফেল শুটিং প্রতিযোগিতায় প্রথম পুরস্কার পেয়েছিলেন, তাঁর নিজস্ব একটি রাইফেল এবং তিনটি পিস্তলও ছিল।

ওদের দেখে মিঃ খালেদ দিনা দরজার আড়ালে লুকালেন। আর মিঃ ভিলানী আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে একটি চেয়ার উঁচু করে ধরে আততায়ীদের দিকে ফিরে দাঁড়ালেন। মিঃ ভিলানীকে উদ্দেশ্য করে ওদের একজন বলে উঠল 'শালা শুয়ার কা বাচ্চা, আভি কিধার যাওগে!' বলেই সে সঙ্গে সঙ্গে তার বন্দুক উঁচিয়ে ভিলানীকে লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়ল। বাবুর্চি এডওয়ার্ড ডিকস্টা তখন রান্নাঘরে খাবার আনতে গিয়েছিল, গুলির শব্দ শুনে সে দৌড়ে ঘরের দিকে এল। বারান্দায় মহিলা দুজনও গুলির সঙ্গে সঙ্গে মেঝেতে শুয়ে পড়লেন। তারপরই বাবুর্চি ও মহিলা দুজন অন্য দরজার দিকে

Mamun Academy

এগিয়ে গেলেন। কিন্তু সেখানে একজন দস্যুকে দেখতে পেয়ে তারা ফিরে এসে বাড়ির পেছনের দিকে এগুবার চেষ্টা করলেন। উত্তরের বারান্দায় পৌঁছে তাঁরা আর একবার বন্দুকের গুলির শব্দ শুনতে পেলেন। মিসেস হীরজী তখন বাবুর্চিকে আদেশ দিলেন ফ্যাক্টরীতে গিয়ে লোকজনকে খবর দিতে। মিসেস হীরজী তখন তাঁর মেয়ের কথা চিন্তা করে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। মেয়েকে শোবার ঘরে ঘুম পাড়িয়ে রেখে এসেছিলেন। বাবুর্চি মিসেস শের বানুকে নিকটবর্তী গুদামে লুকাতে উপদেশ দিল। মিসেস হীরজীর বেডরুমের ড্রেসিং টেবিলের ড্রয়ারে তাঁর একটি গুলিভরা পিস্তল ছিল। সেটা সংগ্রহের উদ্দেশ্যেও মেয়েকে আনতে তিনি বেডরুমের দিকে ছুটলেন।

মিঃ খালেদ দিনা কোন রকমে গোপনে তাঁর ১নং বাংলোতে পৌঁছলেন রাত ৮.৪০ মিনিটে. সেখান থেকে তিনি সঙ্গে সঙ্গে তেজগাঁও থানায় ফোনে এই সংবাদ জানিয়ে দিলেন।

এদিকে মিসেস হীরজী বেডরুমে ঢুকে দেখলেন তাঁর মেয়ে তখনও অঘোরে ঘুমুচ্ছে। ক্ষণিক চিন্তা করে এই সাহসী মহিলা ড্রয়ার থেকে তাঁর গুলিভরা পিস্তল নিয়ে বারান্দায় বেরিয়ে এলেন দস্যুদের মোকাবেলা করতে। কিন্তু তৎক্ষণাৎ পরপর আরও দুইটি গুলির শব্দ হল। আর সঙ্গে সঙ্গে মিসেস হীরজীর প্রাণহীন দেহ গড়িয়ে পড়ল মেঝেতে। ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরুতে লাগল তাঁর ক্ষত স্থান দিয়ে। নিমেষের মধ্যেই তাঁর মৃত্যু হল।

হত্যাকারী দলের একজন দৌড়ে এসে তখনও তাঁর হাতে ধরে রাখা পিস্তলটি একটানে ছিনিয়ে নিল। তারপর মিসেস হীরজীর হাতের হীরা বসানো দামী আঙটি, সোনার চুড়ি, ঘড়ি ইত্যাদি সব কিছু তার দেহ থেকে খুলে নিল।

Mamun Academy

এদিকে আহত মিঃ ভিলানী (যাঁকে প্রথমেই গুলি করা হয়েছিল) রক্তাক্ত শরীর নিয়ে কোন রকমে হামাগুড়ি দিয়ে এসে একটি খাটের নিচে লুকালেন। তাঁর ক্ষতস্থানের রক্তে মেঝে ভেসে গেল। বন্দুক ধারী লোকটি তখন রক্তের সেই দাগ অনুসরণ করে খাটের নিচে তাঁকে খুঁজে পেল। তাঁর দিকে বন্দুক উঁচিয়ে আদেশ দিল সেখান থেকে বেরিয়ে আসতে। প্রাণের ভয়ে মারাত্মক ভাবে আহত মিঃ ভিলানী অতি কষ্টে খাটের তলা থেকে বেরিয়ে এলেন। এবার দু'হাত জোড় করে তিনি কাতরকণ্ঠে প্রাণভিক্ষা চাইলেন আততায়ীদের কাছে। অনুনয় বিনয় করতে লাগলেন তাঁকে ক্ষমা করতে। অত্যন্ত কষ্টে তিনি আরও বল্লেন যে গুলির আঘাতে তাঁর অসহনীয় কষ্ট হচ্ছে, তিনি দাঁড়াতে পারছেন না, একটু শুয়ে থাকেন। দস্যু তখন তাঁকে খাটের উপর শুয়ে পড়তে বলল। এরপর তারা ঘরের ড্রয়ার ইত্যাদি খুলে দামী জিনিস পত্র লুট করতে লাগল। একটি ক্যামেরা ও কিছু বিদেশী মুদ্রাও তারা নিয়ে নিল। এমন সময় আরেকজন দস্যু সেখানে এসে হাজির হল। ভিলানীর দিকে তাকিয়ে সে বলল, 'এ সাহেব দেখছি এখনও মরেনি, একে না মারলে ও এ আমাদের চিনে ফেলবে ও নাম বলে দেবে।' এই বলে সে তাঁর দিকে বন্দুক উঁচু করল। জীবনের ভয়ে ও এই সুন্দর পৃথিবীতে বেঁচে থাকার আশায় মিঃ ভিলানী তাঁর বুকের উপর দুই হাত জোড় করে কাতরকণ্ঠে আবার প্রাণভিক্ষা চাইলেন ওদের কাছে, বললেন, এ প্রকারে মেরোনা তোমরা আমাকে। কেবল মাত্র প্রাণে বাঁচতে দাও, কথা দিচ্ছি কোন ক্ষতি করব না তোমাদের। কিন্তু কে শোনে সেই কাতর অনুনয়? খুন চেপে আছে তখন দস্যুদের মাথায়। শোয়া অবস্থাতেই মিঃ ভিলানীর দিকে তাক করে আবার গর্জে উঠল দস্যুর বন্দুক, সঙ্গে সঙ্গে আর্ত চিৎকার

Mamun Academy

করে খাটের ওপরই ঢলে পড়ল মিঃ ভিলানীর নিস্তেজ দেহ। বুকের উপর তখনও তার দুই হাত জোড় করা অবস্থাতেই রইল শেষ বারের মত জীবন ভিক্ষার করুণ আবেদন হিসাবে।

এর মধ্যে ওই বাংলোর দিক থেকে পর পর কয়েকটি বন্দুকের গুলির শব্দ পেয়ে ও বাবুর্চির কাছে এই দুর্ঘটনার খবর পেয়ে ফ্যাক্টরীর ক্যাশিয়ার ২০/২৫ জন লোক সংগ্রহ করে বাংলোর দিকে এগুতে শুরু করল। কিন্তু তারা নং বাংলোয় ঢুকবার চেষ্টা করতেই তাদের দিকে লক্ষ্য করে আবার দস্যুরা ২/৩টি বন্দুকের আওয়াজ করল। ফলে তারা আর এগুতে পারল না। অগত্যা ফ্যাক্টরীর লোকেরা ইঁট ভর্তি একটি ট্রাক যোগাড় করে তাতে উঠে বাংলোর দিকে এগুতে লাগল। এমন সময় তারা লক্ষ্য করল ২/৩ জন লোক দ্রুত বাংলো থেকে বেরিয়ে পূব দক্ষিণ দিকে পালিয়ে যাচ্ছে।

বাংলোতে ঢুকেই তারা দেখতে পেল এক বীভৎস দৃশ্য। মিসেস হীরজীর প্রাণহীন দেহ পড়ে আছে মাটিতে বেডরুমের সামনে। তাঁর শরীর রক্তাক্ত ও ক্ষত-বিক্ষত, মাথার কাছেই পড়ে আছে তাঁর প্রিয় রাইফেলটি। তাঁর অঙ্গের চুড়ি, ঘড়ি, আংটি সবই লুট করে নিয়ে গেছে। আরও এগিয়ে তারা সভয়ে দেখতে পেল মিঃ ভিলানীর রক্তাক্ত দেহ, পড়ে আছে একটি খাটের উপর। তার হাত দুটি তখনও বুকের উপর জোড় করা অবস্থায় রাখা মুখে তাঁর বেদনা মাখা কাতর উক্তির ভাব স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে। তাঁর মাথার গভীর ক্ষত দিয়ে ঘিলু বেরিয়ে এসেছে।

মিসেস হীরজীর ছোট মেয়েটি কিন্তু তখনও মায়ের বিছানায় ঘুমুচ্ছিল, ড্রেসিং টেবিলের ড্রয়ার খোলা। আসবাব-পত্র মেঝের উপর এখানে ওখানে ছড়ানো। দেখা গেল চেষ্টা করেও দস্যুরা

ঘরের স্টীলের আলমারীটি খুলতে পারেনি। বোধহয় মিলের লোকেরা এসে পড়াতেই ডাকাতরা তাড়াতাড়ি করে পালিয়েছে। নিমেষের মধ্যে কি সর্বনাশ ঘটে গেল এ বাড়িতে তা ভেবে সকলে হা-হুতাশ করতে লাগল। তবে পুলিশের আগমণের প্রতীক্ষায় কেউ কোন কিছু ধরল না। পুলিশ যখন ঘটনাস্থলে পৌছল রাত তখন ১০টা ১৫ মিনিট।

পুলিশ কয়েকটি জিনিসের উপর থেকে আততায়ীদের আঙ্গুলের ছাপের ফটো নিল। আসামীদের খোঁজ করা হল, কিন্তু তখনই কাউকে ধরা সম্ভব হল না।

ঘটনার দুদিন পরে অর্থাৎ ২৯শে জানুয়ারী সাধারণ পুলিশের হাত থেকে সি. আই. ডি. ডিপার্টমেন্ট এই কেসের তদন্ত ভার স্বহস্তে গ্রহণ করল। খবরের কাগজে এই হত্যাকাণ্ড নিয়ে বেশ কয়েক দিন ধরে হৈ-চৈ চলল। তারপর আস্তে আস্তে সব ঠাণ্ডা হয়ে এল। সি. আই. ডি. কিন্তু চালিয়ে যেতে লাগল তাদের গোপন তদন্ত।

২৭শে ফেব্রুয়ারী কোন এক গোপন সূত্রে জরুরী খবর পেয়ে সি. আই. ডি-র একজন অফিসার টালী ফ্যাক্টরীর একজন কর্মচারীকে নিয়ে দ্রুত ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম রওয়ানা হলেন। চট্টগ্রাম পোর্ট থেকে তখন জাহাজ 'এস. এস. আরোণ্ডা' করাচীর দিকে রওয়ানা হবার জন্যে সিটি দিচ্ছে। ঠিক সেই সময় সি. আই. ডি. পুলিশ গিয়ে সেই জাহাজে উঠল এবং সেখান থেকে অবাঙ্গালী আসামী বাদশাহ খানকে গ্রেফতার করল, তার কাগজ-পত্রে দেখা গেল যে সে 'মহব্বত খাঁ' ছদ্মনামে করাচী রওয়ানা হচ্ছিল।

এই বাদশাহ খান কিছুদিন সেই টালী ফ্যাক্টরীতে দারোয়ানের কাজ করেছিল। ঘটনার প্রায় তিন মাস আগে তাকে কর্মচ্যুত করা

হয়। এর আগে সে ই. পি. আর. এ ৩/৪ বৎসর চাকরি করেছিল। টালী ফ্যাক্টরীতে একটি দোনালা বন্দুক ছিল। ঘটনার মাস খানেক আগে সেই বন্দুকটি চুরি যায়। হত্যাকাণ্ডের পরে অনেকেরই কিন্তু বাদশাহ খানের প্রতি সন্দেহ হচ্ছিল।

বাদশাহ খানকে গ্রেপ্তার করে ঢাকায় আনা হল। যথাসময়ে সে পুলিশের কাছে একটি স্বীকারোক্তি করল। তারই সূত্র ধরে পুলিশ ১৯৫৭ সালের ২রা মার্চ তারিখে খুব ভোরে নারায়ণগঞ্জের একটি বাড়ি ঘেরাও করে ফেলল। সেই বাড়িতে সস্ত্রীক থাকত হাতেম আলী নামে একজন লোক। নিরপেক্ষ সাক্ষীদের সামনে সেই বাড়ি তল্লাশী করে হাতেম আলীকে গ্রেপ্তার করা হল, হাতেম আলীর কথামত পুলিশ তার শোবার ঘরের বিছানার নিচ থেকে উদ্ধার করল তিনটি সোনার ও প্ল্যাটিনামের আঙটি, একটি পিস্তল, কিছু গুলি, একটি মেয়েদের হাতঘড়ি, একটি ক্যামেরা, কিছু দামী কাপড়, লণ্ড্রির স্লিপ, ইত্যাদি। প্ল্যাটিনাম আঙটিতে বসানো ছিল তিনটি হীরা আর তাতে লেখা ছিল, '১৭শে জুলাই, ১৯৪৩।' সোনার আঙটিতে লেখা ছিল, '৩০শে জুলাই, ৪৭ এম, গুল।' পিস্তলটি ছিল ইটালীর তৈরি, নম্বর ৫১৪৬০। লণ্ড্রীর স্লিপটি ছিল '১৭শে ফেব্রুয়ারী ১৯৫৭' তারিখের, আসামী বাদশাহ খাঁর নামে, তাতে সাতটি কাপড়ের উল্লেখ ছিল। উপরোক্ত সমস্ত মালই মিঃ হীরানীর বাংলো থেকে ডাকাতি করা মাল বলে সঠিক ভাবে সনাক্ত করা হয়। উপরোক্ত আঙটি, ঘড়ি ও পিস্তল মৃত্যুর সময়ে মিসেস হীরানীর হাতে ছিল।

আসামী হাতেম আলীর স্বীকারোক্তি মত তাকে অতঃপর কালিগঞ্জ থানার অধীনে 'চালনা' গ্রামে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে তার নির্দেশ মত পুলিশ ঝোপের ভেতর থেকে একটি দোনলা বন্দুক ও

Mamun Academy

কয়েকটি তাজা কার্তুজ উদ্ধার করে। সেই বন্দুকটিই ১৯৫৬ সালের ডিসেম্বর মাসে মীরপুর টালী ফ্যাক্টরী থেকে চুরি হয়েছিল বলে সনাক্ত করা হয়।

কয়েকদিন পর আসামী হাতেম আলীকে সঙ্গে নিয়ে পুলিশ এক স্বর্ণকারের দোকানে গিয়ে হাজির হল, দোকানদার স্বীকার করল যে উক্ত ঘটনার পরে পরেই হাতেম আলী ও বাদশাহ খান তার দোকানে কয়েকটি সোনার চুড়ি বিক্রির চেষ্টা করেছিল। আর এক জায়গায় গিয়ে হাতেম আলীর কথামত পুলিশ দুইটি কার্টিজের খাপ উদ্ধার করল। ঘটনাস্থলে ব্যবহৃত কার্টিজের সেই খাপ আসামী এখানে এনে ফেলেছিল, পরে বিশেষজ্ঞদের পরীক্ষায় প্রকাশ পায় যে এই কার্টিজ দুটি ফ্যাক্টরী থেকে পূর্বে চুরি করা দোনলা বন্দুক থেকে ছাঁড়া হয়েছিল।

আগেই বলা হয়েছে যে ঘটনার পর পরই পুলিশ ঘটনাস্থলের কয়েকটি জিনিসের উপর থেকে আঙ্গুলের ছাপ সংগ্রহ করেছিল। পরে পরীক্ষায় দেখা গেল যে আসামী হাতেম আলীর আঙ্গুলের ছাপের সঙ্গে তা হুবহু মিলে যাচ্ছে।

এখানে উল্লেখ করা যায় যে ঘটনার পর মীরপুরের নিকটবর্তী লোকজন প্রথমে গুলির আওয়াজ ও পরে কুকুরের চিৎকারে সচকিত হয়ে বাইরে বেরিয়ে এসেছিল। তখন অন্ধকারে ২/৩ জন লোককে পলায়ন রত দেখে চোর মনে করে গ্রামবাসীরা তাদের পিছু ধাওয়া করে। তখন আসামীরা ওদের দিকে লক্ষ্য করে দুইবার বন্দুকের আওয়াজ করে। ফলে গ্রামবাসীরা ভীত হয়ে ফিরে আসে, এই স্থানের কাছেই উপরোক্ত কার্টিজের খাপ দুটি পাওয়া যায়।

উভয় আসামীই ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে স্বেচ্ছায় সমস্ত ঘটনা বিবৃত

করে দুটি পৃথক পৃথক স্বীকারোক্তি (Judicial Confession) করে। ম্যাজিস্ট্রেট প্রয়োজনীয় সতর্কতার সঙ্গে তা লিপিবদ্ধ করেন। তাতে উভয় আসামীই প্রথমে তাদের দোষ স্বীকার করে—যদিও পরে বিচারের সময়ে সেই স্বীকারোক্তি তারা পুলিশের চাপে পড়ে করতে বাধ্য হয়েছিল বলে অভিযোগ করে ও নিজেদের নির্দোষ বলে ঘোষণা করে।

আসামী বাদশাহ খান তার 'জুডিশিয়াল কনফেশনে' বলে যে ব্রিক ফ্যাক্টরীর চাকরি যাওয়ার পর সে হাতেম আলীর সঙ্গে বসবাস করত। হাতেম আলীর বাসায় সে একটি দোনলা বন্দুক দেখে ওটা সম্বন্ধে প্রশ্ন করলে হাতেম জানায় যে সে বন্দুক পীর আহসানের সহযোগিতায় ব্রিক ফ্যাক্টরী থেকে চুরি করে এনেছে। তারপর হাতেম আলী ও পীর আহসান বাদশাহ খানের কাছে অর্থ সংগ্রহের এক প্রস্তাব উত্থাপন করে। উত্তরে বাদশাহ জানায় যে সে তাদের সঙ্গে যেতে পারে কিন্তু সে বাইরে দাঁড়িয়ে থাকবে, বাকি কাজ অন্যদের করতে হবে। অতঃপর পীর আহসান কতগুলো বন্দুকের গুলি সংগ্রহ করে আনে ও সেগুলো হাতেম আলীকে দেয়। ঘটনার দিন বেলা ২টার সময় বাদশাহ খান তার সঙ্গীদের বলে যে তাদের যদি মানুষ খুন করার কোন উদ্দেশ্য থাকে তবে সে তাদের সঙ্গে যাবে না। উত্তরে হাতেম আলী জানায় যে তারা কেবল টাকা-পয়সাই আনবে। কোন রকম খুন খারাবি করবে না। ওদের গন্তব্য স্থানের কথা শুনে বাদশাহ খান জানাল যে ব্রিক ফ্যাক্টরীর লোকেরা তাকে চিনে ফেলবে কারণ সে সেখানে কিছুকাল চাকরি করেছে। তখন তাকে এক খণ্ড কাপড় দেয়া হল মুখ ঢাকার জন্যে আর বলা হল যে সে কেবল ঘরের বাইরে থেকে পাহারা দেবে ও দেখবে কেউ যেন সেই ঘরে ঢুকতে বা

Mamun Academy

ঘর থেকে বাইরে যেতে না পারে ; বাকি কাজ তারাই করবে।

তারপর একটি বিছানার মধ্যে বন্দুকটি বেঁধে নিয়ে সে, হাতেম আলী ও পীর আহসান এই তিনজনে পৌনে পাঁচটার ট্রেনে ঢাকা পৌঁছে, মেডিকেল কলেজের নিকট থেকে মীরপুরের বাস ধরে তারা সন্ধ্যা সোয়া ছয়টায় মীরপুর পৌঁছে, সেখান থেকে মীরপুরের হাট ও মাজার ঘুরে ৭ টায় ফ্যাক্টরী এলাকায় আসে। এর আগেই তারা বিছানা থেকে বন্দুক বের করে নেয়।

ঠিক রাত আটটার সময় তারা সবাই ১নং বাংলোতে পৌঁছে। হাতেম আলী বন্দুক উঁচিয়ে ডাইনিং হলে ঢুকে সেখানকার সবাইকে চুপ থাকতে বলে, কিন্তু আমানুল্লাহ ভিলানী চেয়ার উঁচিয়ে হাতেম আলীকে আক্রমণ করলে সে তাকে গুলি করে আহত করে, এর পরে পরেই বেগম সাহেবা পিস্তল হাতে বেরিয়ে এলে হাতেম সঙ্গে সঙ্গে গুলি করে তাঁকেও মেরে ফেলে, পরে তাঁর দেহ থেকে অলংকারাদি খুলে নেয়। এই সময় বাদশাহ খান সর্বদা বাইরেই ছিল।

ডাকাতি করে তারা তেজগাঁও এয়ার পোর্টে চলে আসে, সেখান থেকে একটি বেবী ট্যাক্সিতে করে তারা গুলিস্তান সিনেমা হলের কাছে আসে। অতঃপর রিক্সায় সদরঘাট যায় এবং ওখান থেকে ট্রাক্সিতে নারায়ণগঞ্জ পৌঁছে।

উপরোক্ত স্বীকারোক্তিতে বাদশাহ খান দেখাবার চেষ্টা করে যে প্রকৃতপক্ষে সে হত্যা কাণ্ডে কোন অংশই গ্রহণ করেনি। আসামী হাতেম আলীই ওই কাজ করেছে।

অপর পক্ষে হাতেম আলী তার জুডিশিয়াল কনফেশনে বলে যে বাদশাহ খানই ব্রিক ফ্যাক্টরী হতে বন্দুকটি চুরির প্রস্তাব করে ও সেই অনুসারেই তারা দুজন ডিসেম্বর মাসে উক্ত বন্দুক চুরি করে আনে।

Mamun Academy

পরে বাদশাহ খানের প্রস্তাব ক্রমেই হাতেম আলী তার সঙ্গে মীরপুর যায়। এর আগে বাদশাহ খানই তার বন্ধুদের কাছ থেকে গুলি যোগাড় করেছিল। পরিচয় গোপন করার উদ্দেশ্যে সে নিজের মুখে কাপড় জড়িয়ে রেখেছিল। পথে বাদশাহ খান আরও জানায় যে মিসেস হীরজী একজন দক্ষ 'গুলি-চালক,' এবং তাঁর নিজস্ব পিস্তল ও রাইফেল আছে।

বাদশাহ খানের হাতেই সব সময় বন্দুকটি ছিল, সে-ই প্রথম ডাই-নিং হলের দরজায় দাঁড়িয়ে মিঃ ভিলানীকে উদ্দেশ্য করে বলে উঠেছিল, 'আভি কিধার যায়েগা, শালা, শুয়ার কা বাচ্চা!' এই বলেই সে মিঃ ভিলানীকে গুলি করে। তারপর তারা বাইরে লোকজনের আওয়াজ পেয়ে সেদিকে ৪/৫টি গুলি করে। এমন সময় মিসেস হীরজী পিস্তল হাতে বেরিয়ে এলে বাদশাহ খানই তাঁকে পরপর দুইবার গুলি করে। ফলে সে নিচে পড়ে যায়. বাদশাহ খানই তাঁর হাতের পিস্তল নিয়ে নিজের পকেটে রাখে। এরপরই বাদশাহ খান আহত মিঃ ভিলানীকে খাটের তলা থেকে বের করে নির্দয়ভাবে হত্যা করে (যা পূর্বেই বলা হয়েছে)। হাতেম আলী বেগম সাহেবার দেহ থেকে চুড়ি, আংটি, ঘড়ি ইত্যাদি লুট করে নেয়। তারা চেষ্টা করেও স্টীলের আলমারীটি খুলতে পারেনি, লোকজন আসতে দেখে তারা তাড়া-তাড়ি সরে পড়ে। অন্যান্য জিনিস নিয়ে তারা জঙ্গলের পাশ দিয়ে দক্ষিণ দিকে যেতে থাকে।

প্রায় সিকি মাইল দূরে এসে বাদশাহ খান তার মুখের কাপড় ও গুলির খাপ ফেলে দেয়। এই সময় কুকুর ঘেউঘেউ করে ওঠে ও তাদের পিছু নেয়। গ্রামের লোকজন বেরিয়ে আসে এবং তাদের ধাওয়া করে। প্রথমে তারা দৌড় দেয় ও পরে বাদশাহ খান তাদের দিকে

Mamun Academy

দুইবার গুলি করে। গুলির শব্দ শুনে ভয়ে গ্রামের লোকেরা থেমে যায়। তারপর তারা দৌড়ে গিয়ে কাছেই একটি খড়ের গাদা পেয়ে কিছুক্ষণ তার পেছনে লুকিয়ে থাকে। সেখানেই বাদশাহ খান আবার তার বিছানার মধ্যে বন্দুকটি লুকিয়ে বেঁধে রাখে এবং তারপর তারা তেজগাঁও হয়ে নারায়ণগঞ্জে পৌঁছে।

এখানেও দেখা যায় যে হাতেম আলী অধিকাংশ দোষ ও খুনের দায় বাদশাহ খানের উপরই চাপাবার চেষ্টা করে।

Mamun Academy

ঢাকার প্রথম সহকারী সেসন জজের আদালতে নয়জন বিশেষজ্ঞ জুরির সাহায্যে এই চাঞ্চল্যকর মামলার বিচার করা হয়। পাকিস্তান দণ্ডবিধির ৩০২/৩৪ ও ৩৯৪ ধারায় সকল জুরীরা একবাক্যে উভয় আসামী বাদশাহ খান ও হাতেম আলীকে দোষী সাব্যস্ত করে। জজ বাহাদুর জুরীদের মত গ্রহণ করে ১৯৫৮ সালের ৩রা জুন তারিখে আসামী-দের ৩০২/৩৪ ধারায় দোষী সাব্যস্ত করে উভয়কেই মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করেন।

এই দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে আসামীরা হাইকোর্টে আপীল করে। ঢাকা হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতি জাস্টিস রহমান ও জাস্টিস চক্রবর্তী এই আপীলের শুনানী করেন।

মাননীয় জাস্টিস হামিদুর রহমান (ইনি পরে সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি হন) তাঁর বিজ্ঞ রায়ে উভয় পক্ষের সাক্ষ্য-প্রমাণ ও কৌঁসুলীদের যুক্তি-তর্ক আলোচনা করে বলেন যে আসামী বাদশাহ খানের বিরুদ্ধে অকাট্য সাক্ষ্য-প্রমাণে বিশেষভাব নিম্নলিখিত সত্য প্রমাণিত হয়েছে। যথা :-

(১) বাদশাহ খান ছিল সেই টালী ফ্যাক্টরীর একজন পদচ্যুত কর্মচারী।

(২) সে তার দুই বন্ধুর (যারা ই, পি, আর-এর সদস্য ছিল)

কাছ থেকে পাখী শিকারের অজুহাতে লাইসেন্স নিয়ে গুলি কিনেছে।

(৩) সে এম, খান ছদ্মনাম ব্যবহার করে করাচীতে গোপনে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করছিল। ও সেই মিথ্যা নামেই টিকা ও ইনজেকশন নেয়ার সার্টিফিকেট যোগাড় করেছিল।

(৪) ঘটনার পর সেদিন রাত ১১-৩০ মিনিটে সাক্ষী ছমিরুদ্দিন বেপারী তাকে ও হাতেম আলীকে নারায়ণগঞ্জ ফেরী ঘাটে দেখে। তখন বাদশাহ খানের হাতে থাকা কভার জড়ানো একটি বন্দুক ছিল। উক্ত সাক্ষীর প্রশ্নের উত্তরে বাদশাহ খান জানিয়েছিল যে তারা ঢাকা থেকে তাদের বন্দুকের লাইসেন্স রিনিউ করে ফিরছিল।

(৫) ঘটনার দিন উভয় আসামীকেই ব্রিক ফ্যাক্টরীর কাছাকাছি দেখা গিয়েছিল। এটাও প্রমাণিত হয়েছে যে উভয় আসামীই একসঙ্গে ঘটনার আগে ও পরে নারায়ণগঞ্জে থাকত।

আসামী হাতেম আলীর বিরুদ্ধে সাক্ষ্যের আলোচনায় বলা হয়েছে যে :—

(১) এটা সন্দেহাতীত ভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে আসামী হাতেম আলীও ঘটনায় জড়িত ছিল ও অংশ গ্রহণ করেছিল।

(২) ঘটনাস্থলে ২নং বাংলোর জিনিসপত্রে আসামীদের আঙ্গুলের যে ছাপ পাওয়া গিয়েছে তা আসামী হাতেম আলীর আঙ্গুলের ছাপের সঙ্গে হুবহু মিলে গেছে।

(৩) হাতেম আলীর বিছানার নিচে থেকেই পুলিশ বিশিষ্ট সাক্ষীদের সামনে ডাকাতির মালামাল অর্থাৎ পিস্তল, আংটি কার্টিজ, লেডিজ হাত ঘড়ি ইত্যাদি উদ্ধার করে আনে। প্রমাণিত হয় যে এসব জিনিস ছিল মিসেস হীরজীর যা ঘটনার পর

Mamun Academy

উধাও হয়। মিসেস হীরজীর স্বামী মিঃ হীরজী এসব জিনিস তাঁর স্ত্রীর বলে সনাক্ত করেছেন।

(৪) স্বর্ণকারের সাক্ষ্যে প্রমাণিত হয়েছে যে ঘটনার পর হাতেম আলী তার কাছে সোনার চুড়ি বিক্রি করতে চেষ্টা করেছিল। এই আসামীই পুলিশকে ঘটনার বেশ কিছুদিন পর যেখানে তারা কার্টিজের খাপ ফেলেছিল সেখানে নিয়ে যায় ও সেখান থেকে খাপ উদ্ধার করে।

(৫) অনুরূপ ভাবে আসামী হাতেম আলীই পুলিশকে চালনা গ্রামে নিয়ে যায় ও সেখানে এক বাঁশ ঝোপের আড়াল থেকে একটি বন্দুক ও কিছু তাজা কার্টিজ বের করে আনে। এই বন্দুকই আগে টালী ফ্যাক্টরী থেকে চুরি গিয়েছিল বলে প্রমাণিত হয়েছে।

(৬) বন্দুক বিশেষজ্ঞরা পরীক্ষা করে দেখেছেন যে সেই বন্দুক থেকেই ঘটনাস্থলে হাতেম আলীর নির্দেশ মত গ্রাম থেকে পাওয়া কার্টিজের খাপগুলোর ভেতরের গুলি ছোড়া হয়েছিল।

(৭) বাবুটি ডি, কস্টা আসামী হাতেম আলীকে ঘটনাস্থলে দেখেছে বলে সনাক্ত করেছে।

উপরোক্ত এবং আরও অনেক সাক্ষ্য-প্রমাণ ও উভয় আসামীর স্বীকারোক্তি পরিষ্কারভাবে প্রমাণ করে যে উভয় আসামীই এই ডাকাতি ও হত্যাকাণ্ডের জন্যে সমানভাবে দায়ী।

মাননীয় বিচারপতি আরও বলেন যে এই হত্যাকাণ্ড নির্মম ও পৈশাচিক। আর পূর্বে ষড়যন্ত্র করেই এই হত্যাকাণ্ড করা হয়েছে। উভয় আসামীর দোষই সন্দেহাতীত ভাবে প্রমাণিত হয়েছে। এই ক্ষেত্রে আসামীদের খালাস বা লঘুদণ্ড দেয়ার কোন যৌক্তিকতাই নেই।

Mamun Academy

তাই উভয় বিচারপতি একমত হয়ে আসামীদের আপীল অগ্রাহ্য করেন ও দায়রা জজের রায় বহাল রেখে উভয় আসামীকেই মৃত্যু-দণ্ডে দণ্ডিত করেন।

Mamun Academy

মহা উত্তেজনায় খুন

এক

ঘটনাটি ঘটেছিল ১৯৩৮ সালে লাহোরের নিকটে অবস্থিত পাঞ্জাবের একটি গ্রামে।

সেই গ্রামে তখন বাস করত হোসেন নামক এক দাগী চোর। ঘরে ছিল তার যুবতী স্ত্রী গুলশান।

এক চুরির অপরাধে হোসেনের তিন বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ড হয়। হোসেন যখন কারা প্রাচীরের অন্তরালে বসে নব বধূর বিরহ-বেদনায় অস্থির হয়ে মুক্তির দিন গুণছিল, তখন কিন্তু হোসেনের অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে তারই গ্রামবাসী মুরাদ নামক এক যুবক হোসেনের স্ত্রীর সঙ্গে ভাব জমিয়ে বসে। নানা ছুতায় সে হোসেনের বাড়িতে আসা যাওয়া শুরু করল। ওর প্রলোভনে ভুলে বিরহিনী গুলশানও মুরাদের দিকে ঝুঁকে পড়ল। ক্রমে তাদের মধ্যে প্রেম ও অবৈধ সংসর্গ শুরু হল।

গোপনে গোপনে তাদের মেলা-মেশা ও অভিসার চলতে লাগল। ফলে কয়েক মাসের মধ্যেই গুলশান অন্তঃস্বত্ত্বা হয়ে পড়ল। এই নিয়ে হোসেনের আত্মীয়-স্বজন ও পাড়া-পড়শীর মধ্যে বেশ কানা-ঘুসা চলতে লাগল। স্বামী যেখানে দীর্ঘ মেয়াদী জেলে আটক তখন তার স্ত্রী কিভাবে গর্ভবতী হল? অবশ্য হোসেনের স্ত্রীর সঙ্গে মুরাদের অন্তরঙ্গতার কথা অনেকেরই জানা ছিল। মুরাদই যে এই

Mamun Academy

সর্বনাশের জন্যে দায়ী তাও কারও জানতে বাকি রইল না। কিন্তু এ নিয়ে টুঁ-শব্দটি করবে কে? মুরাদ যে দুর্দান্ত প্রকৃতির লোক। তার খুন খারাবি করতে কিছুই বাধে না।

ক্রমে আসন্ন প্রসবা হোসেনের স্ত্রী গুলশান গ্রাম ছেড়ে তার দূরের এক আত্মীয় বাড়ি চলে গেল। সেখানে যথাসময়ে সে তার অবৈধ সংসর্গের ফলে এক কন্যা সন্তান প্রসব করল। তবে যে কারণেই হোক মেয়েটি কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই মারা গেল। গুলশান আবার ফিরে এল নিজ গাঁয়ে।

এদিকে জেলের মেয়াদ শেষে হোসেন কারাগার থেকে বেরিয়ে এল। তার অনুপস্থিতির সুযোগে মুরাদের সঙ্গে তার স্ত্রীর অধঃপতনের কাহিনী গ্রামবাসীরা তার কানে পৌঁছে দিল।

সেই সঙ্গে গুলশানের অবৈধ সন্তান প্রসবের কাহিনীও তার কানে গেল। আত্মীয়-স্বজনেরা হোসেনকে প্ররোচিত করল এই অপমানের যথাযথ প্রতিকার করতে ও প্রতিশোধ নিতে। কিন্তু হোসেন তখনকার মত ক্রোধ দমন করে সংযত হল। হোসেনের ভয়ে মুরাদও কিছুদিন দূরে দূরে রইল তার ধরা ছোঁয়ার বাইরে।

হোসেনের জেল থেকে বেরুবার পরে প্রায় বছর দুই এভাবে কেটে গেল। কিন্তু এর মধ্যে কখনও মুরাদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেবার কোন প্রবণতা হোসেনের মধ্যে লক্ষ্য না করে মুরাদ ভাবল হোসেন বুঝি সব ভুলেই গেছে। তার ভয়ও ক্রমে ক্রমে অনেকটা দূর হয়ে গেল।

মুরাদ কিন্তু গুলশানের বিগত প্রেম মোটেই ভুলতে পারেনি। সুযোগ বুঝে হোসেনের অনুপস্থিতিতে সে অতি গোপনে আবার তার বাড়িতে যাতায়াত শুরু করল। গুলশানেরও দুর্বলতা ছিল মুরাদের

Mamun Academy

প্রতি। তবে এখন সে খুবই সতর্ক ও সজাগ, যেন তার স্বামী ঘুণাক্ষরেও কিছু টের না পায়।

৪ঠা মে (১৯৩৮ সাল) তারিখ সকালে হোসেন তার বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল দূরে এক গ্রামে তার আত্মীয় বাড়িতে কোন একটি বিশেষ কাজে। যাবার আগে সে স্ত্রী ও অন্যান্যদের জানিয়ে গেল যে সেই রাত্রে সে আর বাড়ি ফিরবে না, পরদিন ফিরবে।

মুরাদের কাছে এ খবর পৌঁছে গেল। শুনে সে ত মহাখুশী। তাহলে অনেকদিন পরে আজ রাত্রে গুলশানকে আবার পাওয়া যাবে একান্তভাবে। আজ কতদিন ধরে সে ঘুরছে এ রকম একটি সুযোগের আশায়! গুলশানও গোপনে তাকে জানাল যে সে প্রস্তুত থাকবে তার আগমনের অপেক্ষায়।

লাহোরে তখন চলছিল প্রচণ্ড গরম। তাই সে সময় অনেকেই রাত্রে ঘরের ছাদে খাটিয়া পেতে উন্মুক্ত আকাশের নিচে ঠাণ্ডা হাওয়ায় ঘুমাত। হোসেনরাও স্বামী-স্ত্রী সে সময় রাত্রে তাদের ছোট্ট ছাদে পাশাপাশি দুটি খাটিয়া পেতে তাতে রাত কাটাত।

হোসেন কিন্তু তার প্ল্যানমত সেই রাত্রেই সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে চুপচাপ তার বাড়িতে ফিরে এল। তাড়াতাড়ি খাওয়া সেরে অন্ধকার রাতে সে তার স্ত্রীকে নিয়ে ছাদে এল ঘুমুতে। হোসেন আপাদমস্তক চাদর মুড়ি দিয়ে ছাদের এক অন্ধকার কোণে গিয়ে শুয়ে পড়ল। আর তার স্ত্রী শুল একটি ভিন্ন খাটে।

এদিকে মুরাদ জানত যে হোসেন সে রাত্রে বাড়িতে নেই। রাত একটু গভীর হলে সে চুপিচুপি উঠে এল হোসেনের বাড়ির ছাদে। এসেই গুলশান যে খাটে শুয়েছিল, সোজা সেই খাটিয়ার উপরে উঠে পড়ল। গুলশান ঘুমিয়ে পড়েছিল, সে চমকে জেগে উঠে দেখল সমূহ

Mamun Academy

বিপদ। প্রথমে সে 'কে? কে?' বলে চাপা স্বরে চিৎকার করে উঠল, আর সেই সঙ্গে মুরাদকে দূরে ঠেলে দেয়ার চেষ্টা করতে লাগল।

এদিকে মুরাদ ব্যস্ত হয়ে গুলশানের মুখে হাত চাপা দিয়ে বলল, 'চুপ! চুপ! চিৎকার করো না, আমি মুরাদ। শোর করলে অন্য লোকেরা এসে পড়বে! চুপ চাপ শুয়ে পড়ত লক্ষ্মী আমার!' এই বলে সে আরও ঝুঁকে শুয়ে পড়ল গুলশানের পাশে সেই একই খাটিয়ায়। কিন্তু গুলশান ত জানে যে এই ছাদেই শুয়ে আছে হোসেন। সে হোসেনের আগমন বার্তা আগেই মুরাদকে পৌঁছে দিতে চেষ্টা করেছিল, কিন্তু সুযোগ পায়নি। এখন যে মহা বিপদ। হোসেন বোধ হয় এখনও ঘুমায়নি। মুরাদের আহ্বানে গুলশান যদি আজ সাড়া দেয় তবে তারও নিস্তার থাকবে না। তাই সে বিপদ থেকে নিজে উদ্ধার পাবার আশায় জোরে চিৎকার করে উঠল, 'চোর! চোর!'

আর যায় কোথায়? হোসেনও প্রস্তুত হয়েই ছিল। সে এক-লাফে উঠে এল তার খাটিয়া থেকে। তার হাতে ছোরা। ঐ অন্ধকার রাতেও বিরাট ছোরাটা চিক্‌চিক্‌ করে উঠল। হোসেন স্ত্রীর খাটিয়ার কাছে এসে দেখল মুরাদ তখনও খাটে শুয়ে গুলশানকে জড়িয়ে ধরে কাছে টানছে আর তাকে কি বলার চেষ্টা করছে।

এহেন অবস্থায় সহসা যমদূতের মত ঐ বিরাট ছোরা হাতে হোসেনকে সামনে দেখতে পেয়ে মুরাদ যেন প্রথমে তার নিজের চোখকেই বিশ্বাস করতে পারল না। মুহূর্তের মধ্যে তার সব কামনা বাসনা কর্পূরের মত উবে গেল। একলাফে সে খাট ছেড়ে উঠে আসতে চেষ্টা করল।

'বেইমান! এতদিন পর আজ তোকে হাতে নাতে ধরেছি।

বিশ্বাসঘাতকতার উচিত শাস্তি দেব আজ তোকে।' গর্জে উঠল হোসেন মুরাদের পথ আগলে দাঁড়িয়ে। সঙ্গে সঙ্গে হোসেন ক্ষিপ্ত নেকড়ের মত ছোরা নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল মুরাদের উপরে। আঘাতে আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত করে ফেলল মুরাদের সমস্ত শরীর।

মুরাদের চিৎকার ও শোরগোল শুনে আশেপাশের বহু লোক দৌড়ে এল ছাদে। সব শুনে ও দেখে তারাও সবাই মিলে মুরাদকে সমানে পেটাতে লাগল তাকে সমুচিত সাজা দেবার জন্যে। আক্রমণের চোট সহ্য করতে না পেরে মুরাদ সেখানেই প্রাণ ত্যাগ করল। তার সারাশরীর আঘাতে আঘাতে ক্ষত বিক্ষত।

যথা সময়ে পুলিশে খবর দেয়া হল। হোসেনকে পুলিশ গ্রেপ্তার করল খুনের অপরাধে।

লাহোরের সহকারী সেশন জজের আদালতে খুনের অপরাধে হোসেনের বিচার শুরু হল সে বৎসরেরই আগস্ট মাসে। বিচারের সময় আসামী হোসেন তার প্রায় সব দোষই স্বীকার করল। তবে সে বলল যে সে তার স্ত্রীর 'চোর' 'চোর' চিৎকার শুনেই ঘুম থেকে জেগে ওঠে। সে অবস্থায় সে প্রথমে মুরাদকে চিনতেই পারেনি। তাকে সে একজন অজ্ঞাতনামা চোর বদমাইশ মনে করেই আক্রমণ করেছিল। সেই সঙ্গে পাড়া পড়শীরা চিৎকার শুনে সেখানে এসে মুরাদকে চোর ভেবে তারাও তাকে বেদম মার দেয়, ফলে তার মৃত্যু হয়।

বিচার শেষে মাননীয় সেশন জজ তাঁর ৯ই আগস্টের (১৯৩৮ সাল) প্রদত্ত রায়ে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছান যে হোসেন জেনে-শুনে মুরাদকে নিষ্ঠুর ভাবে খুন করেছে। তবে ঐ খুনের পেছনে তার মানসিক এক মহা উত্তেজনার কারণ ছিল। কারণ সেই সময়

Mamun Academy

বদমায়েশ মুরাদ তার স্ত্রীর সঙ্গে ব্যভিচারে লিপ্ত হতে এসেছিল, এমনকি তার স্ত্রীর খাটিয়ার ওপরেও সে উঠেছিল। সে অবস্থায় রাগের মাথায় মুরাদকে খুন করার যথেষ্ট উত্তেজনার কারণ অবশ্যই ঘটেছিল।

এই পরিস্থিতি বিবেচনা করে জজ সাহেব হোসেনকে মাত্র তিন বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেন।

হোসেন কিন্তু কারাগার থেকে নিজেই এক দরখাস্ত পাঠাল লাহোর হাইকোর্টে তার মামলার পুনর্বিচারের জন্যে।

হাইকোর্ট হোসেনের আবেদন পেয়ে সত্বর এই মামলার নথি তলব করে পাঠাল। হাইকোর্টে তার আপীলের শুনানীর সময়ে গরীব হোসেন নিজের পক্ষ সমর্থনের জন্যে কোন অ্যাডভোকেট নিযুক্ত করতে পারেনি। কিন্তু বিচারপতিগণ নিজেরাই সব সাক্ষ্য-প্রমাণ বিচার বিবেচনা করেন।

তৎকালীন লাহোর হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি জাস্টিস ইয়াং (Young C.S.) সেই বৎসরই ২৮শে অক্টোবর এই মামলার শুনানী করেন। তিনি বিশদভাবে মামলার সমস্ত নথিপত্র ঘেঁটে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে মৃত মুরাদ এর আগেও আসামী হোসেনের জেলে থাকার সুযোগ নিয়ে, তার যুবতী স্ত্রীকে প্ররোচিত করে তার সঙ্গে অবৈধ সংসর্গে লিপ্ত হয়, এমনকি তাকে গর্ভবতীও করে ফেলে। জেল থেকে ফিরে এসে এসব শুনেও হোসেন দীর্ঘ দুই বৎসর যাবত ধৈর্য ধরে চুপ করে ছিল। কিন্তু তবুও মুরাদ তার সেই হীন আচরণ ত্যাগ করেনি। ঘটনার রাত্রে এই দুঃসাহসী চরিত্রহীন যুবক আসামীর স্ত্রীর সঙ্গে একই খাটিয়ায় শুয়ে থাকার সময়ে সে স্বামী হোসেনের নিকট হাতে নাতে ধরা পড়ে যায়। এর চেয়ে মহা

Mamun Academy

উত্তেজনার কারণ একজন পুরুষের পক্ষে আর কি হতে পারে ? এই অবস্থায় আসামী যদি রাগের মাথায় তার স্বাভাবিক বিচার বুদ্ধি হারিয়ে ফেলে ও তার কাজের পরিণতির কথা তখনকার মত ভুলে যায়, তবে কি সত্যিই তাকে দোষ দেয়া যায় ? ভোগ যেখানে লক্ষ্য, হিংসাও সেখানে এক ভয়ঙ্কর মূর্তি ধরেই আসে। নারী যেখানে পণ্য—পুরুষও সেখানে হিংস্র।

আর সে অবস্থায় মুরাদকে ছেড়ে দিলে হোসেনও পরদিন থেকে তার সমাজে মুখ দেখাতে পারত না।

এই সমস্ত অবস্থা বিবেচনা করে মাননীয় প্রধান বিচারপতি মনে করেন যে, এহেন পরিস্থিতিতে খুনের দায়ে হোসেনকে তিন বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ড দেয়া যুক্তিযুক্ত হয়নি। তাই তিনি তার কারাদণ্ডের মেয়াদ লাঘব করে আসামী হোসেনকে মাত্র তিন মাসের সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ প্রদান করেন।

এই মামলায় আর একটি লক্ষ্যণীয় বিষয় ছিল এই যে, ঘটনাটি ঘটে ১৯৩৮ সালের ৩রা মে। আর এর ছয় মাসের মধ্যেই মামলার তদন্ত ও বিচারের সবগুলো পর্যায় দ্রুত শেষ হয়; হাইকোর্টের আপীলের চূড়ান্ত রায়ও অক্টোবর মাসের মধ্যেই ঘোষণা করা হয়।

এখনকার তুলনায়, তখন বিচার কার্য কত দ্রুত সম্পন্ন হত সেটাও ভেবে দেখার বিষয়।

দুই

সীমান্ত প্রদেশের হাজারা জেলার অধিবাসী আজিজুর রহমান ছিল রাজপুত বংশোদ্ভূত। বেশ কয়েক বৎসর সে সৈন্য বিভাগে কাজ করে। বিগত মহাযুদ্ধের অবসানে ১৯৪৬ সালের ৯ই আগস্ট সেনাবাহিনী

Mamun Academy

থেকেসে অবসর গ্রহণ করে। তখন তার বয়স ৩২ বৎসর। আবার সে ফিরে এল তার নিজ গাঁয়ে। এবার বিয়ে-সাদী করে সংসারী হতে মন চাইল তার। কিন্তু তার পৈত্রিক জমা জমি বিশেষ কিছুই ছিল না। লেখাপড়াও সে জানত না। চেহারাও ছিল কদাকার। আর সামান্য সৈনিকের চাকরি করে সে কি-ই বা অর্থ জমাতে পেরেছে বিদেশেই সে তার মাইনার সব টাকা উড়িয়ে এসেছে। এহেন অবস্থায় কেই বা তাকে মেয়ে দেবে?

অবশেষে আজিজের জন্যে পাওয়া গেল এক বিধবা মহিলার খোঁজ—নাম খানামাজি। তার পূর্ব স্বামীর নাম ছিল আবদুল্লাহ। আবদুল্লার ঔরসে খানামাজির তিনটি কন্যা ছিল। বড় মেয়েটির নাম খাতুন, তার বয়স ছিল প্রায় নয় বৎসর।

খানামাজিকে দেখে আজিজের পছন্দ হল। রূপ যৌবন দুই আছে তার। একদিন তাকেই বিয়ে করল সে। সবাই বলল, ভালই হল। দুজনেরই একটা সদ্গতি হল। আবদুল্লার মৃত্যুর পর খানামাজি তার তিনটি নাবালিকা মেয়ে নিয়ে মৃত স্বামীর বাড়িতেই বসবাস করত। আজিজের সঙ্গে তার নিকাহ হবার পরও খানামাজি আবদুল্লার বাড়িতেই থাকতে লাগল। আজিজও তার পৈত্রিক বাড়ি ছেড়ে খানামাজির সঙ্গে সেই বাড়িতে এসে বাস করতে শুরু করল।

বৈবাহিক জীবন কিন্তু আজিজের মোটেই সুখের হয়নি। তার স্ত্রী নাকি একজন দুশ্চরিত্রা মহিলা ছিল বলে শোনা গেল। বিধবা হবার পর নাকি সন্দেহজনক লোকজন তার বাড়িতে আনাগোনা করত, এরকম কথা তার কানে প্রায়ই আসত। আর এসব শুনে আজিজ নিজেও খুব বিব্রত বোধ করত।

ক্রমে সে এ-ও শুনতে পেল যে দ্বিতীয়বার বিয়ের পরও নাকি

তার অনুপস্থিতিতে তার স্ত্রীর কাছে লোকজন এসে থাকে খারাপ উদ্দেশ্য নিয়ে। আজিজ তার স্ত্রীকে এ সম্বন্ধে কয়েকবার সাবধানও করে দিল।

হঠাৎ একদিন আজিজের চোখে পড়ল যে তার স্ত্রী পার্শ্ববর্তী গ্রামের নহরুল্লাহ নামক এক যুবকের সঙ্গে গোপনে কথাবার্তা বলছে। কিন্তু সেদিন আজিজকে দূর থেকে দেখতে পেয়েই নহরুল্লাহ দ্রুত গা ঢাকা দিল। এই ব্যাপার নিয়ে আজিজ তার স্ত্রীকে খুব তিরস্কার করল ও তাকে ভাল করে শাসিয়ে দিল যে ভবিষ্যতে সে যেন কোন পর-পুরুষের সঙ্গে ওরকম চলাচলিতে লিপ্ত না হয়।

১৯৪৯ সালের ৯ই অক্টোবর আজিজুর রহমান খুব সকালে তার বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল। যাবার আগে সে স্ত্রীকে বলে গেল যে কিছু-দিনের জন্যে সে বাইরে যাচ্ছে টাকা উপার্জনের উদ্দেশ্যে। ফিরতে দেরি হবে। স্ত্রী ও বড় মেয়ে খাতুনকে বুঝিয়ে বলে গেল যে তারা যেন সাবধানে সতর্ক থাকে।

সেদিন সকালে বাড়ি থেকে বেরিয়ে আজিজ প্রথমে মাঠে গিয়ে একবোঝা গরুর ঘাস কাটল। তা বিক্রি করে সে কিছু পয়সাও পেল। দুপুরের দিকে সে তার পৈত্রিক বাড়ি 'বেলা গ্রামে' গিয়ে হাজির হল। সেখানে দুপুরের খাবার খেয়ে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিল। সন্ধ্যার পর জ্যোৎস্না রাতে সে আবার মাঠে ঘাস কাটতে নামল। ঘাস কাটতে কাটতে বেশ রাত হয়ে গেল। সেই ঘাস বিক্রি করে অনেক রাতে সে হঠাৎ কি মনে করে বাড়িমুখো রওনা হল।

আজিজ যখন বাড়ির দরজায় পৌঁছল তখন প্রায় রাত দুপুর। চারদিক নিস্তব্ধ। কেমন যেন সন্দেহ হল তার মনে। পা টিপে টিপে সে তার উঠানে প্রবেশ করল, দেখল তার ঘরের দরজা ভেতর থেকে

Mamun Academy

বন্ধ। বন্ধ দরজার কাছে এগিয়ে এল আজিজ সন্তর্পণে। ভেতর থেকে যেন কি রকম ফিসফিসানি শব্দ কানে এল। সন্দিগ্ধ হয়ে সে এবার বন্ধ দরজায় কান পেতে রইল। হ্যাঁ, এবার সে ঘরের ভেতরে মানুষের সাড়া পেল, ঘন ঘন নিঃশ্বাস শুনতে পেল। মনে হল ভেতরে কোন পুরুষ ও রমণী ফিস ফিস করে গাঢ় আলাপে মত্ত।

আজিজের মনে সন্দেহ হল তার স্ত্রীর ঘরে এ সময় আর কে পুরুষ থাকতে পারে? তাহলে তার স্ত্রীর চরিত্র সম্বন্ধে সে এতদিন যা শুনে এসেছে তা কি সত্য?

ঘরের বাইরে ছিল একটি কুড়াল। আজিজ শক্ত মুঠিতে সেটা হাতে তুলে নিয়ে দরজার কাছে এসে দাঁড়াল। তার দরজার ভিতরের খিল ঘরের বেড়ার একটি ভাঙা অংশ দিয়ে হাত ঢুকিয়ে বাইরে থেকেই খোলা যেত। আজিজের তা জানা ছিল। এবার প্রস্তুত হয়ে আজিজ হঠাৎ করে বেড়ার ফাঁক দিয়ে হাত গলিয়ে তার দরজার খিল খুলে সঙ্গে সঙ্গে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ল। হাতে তার উদ্যত কুড়াল।

ঘরের ভেতরে একটি হারিকেন মিট্ মিট্ করে জ্বলছিল। সেই আলোতে তার স্ত্রীর খাটিয়ার দিকে তাকিয়ে আজিজের চক্ষু বিস্ফারিত হয়ে গেল। সে যা সন্দেহ করেছিল ঠিক তাই। দেখল তার স্ত্রীর সঙ্গে একই খটিয়ায় শুয়ে আছে নছরুল্লাহ!

আজিজকে এরকম অবস্থায় ঢুকতে দেখে দুজনেই চমকে উঠল। যেন বিনা মেঘে বজ্রপাত! এই অসময়ে তারা কেউই আজিজকে সেখানে আশা করে নি।

'বদমায়েশ, এইবার তোদের দেখে নেব!' বলে গর্জে উঠল আজিজ। আর সেই সঙ্গে শক্ত করে চেপে ধরল তার হাতের কুড়াল।

এদিকে নছরুল্লাহ প্রাণ ভয়ে এক লাফে খাটিয়া থেকে নিচে নেমে

এল। সে সম্পূর্ণ উলঙ্গ। তাড়াতাড়ি সে তার কাপড় টেনে নিয়ে পরতে শুরু করল। আজিজের মাথায়ও খুন চেপে গেল। কুড়াল উঁচিয়ে সে পথ আগলে দাঁড়াল নছরুল্লার। নছরুল্লাহ পাশ কাটিয়ে বাইরে বেরিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করল, কিন্তু পারল না। আজিজ যমদূতের মত দরজা আগলে খাড়া। আর একবার পালাবার চেষ্টা করতেই আজিজ তার হাতের কুড়াল দিয়ে পরপর কয়েক কোপ বসিয়ে দিল নছরুল্লার মাথায় ও ঘাড়ে। সঙ্গে সঙ্গে নছরুল্লাহ রক্তাক্ত অবস্থায় গড়িয়ে পড়ল মাটিতে। আর সেখানেই তার শেষ।

আজিজের স্ত্রী খানামাজিরও দেহের নিচের দিকটা সম্পূর্ণ উলঙ্গ। নছরুল্লার পরিণতি দেখে সে সেই অর্ধ-উলঙ্গ অবস্থায়ই দরজার ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে বাইরের দিকে দিল দৌড়। আজিজও সঙ্গে সঙ্গে তার রক্তাক্ত কুড়াল উঁচিয়ে ধাওয়া করল তার পিছু পিছু। আর চিৎকার করে বলতে লাগল 'হারামজাদী মাগী, তোর নাগরের সাথে আজ তোকেও শেষ করব! দেখি কে তোকে বাঁচায়।' উঠানের মধ্যেই ধরে ফেলল আজিজ তার স্ত্রীকে। খানামাজি মিনতি জানাল তাকে প্রাণে না মারতে। কিন্তু কে শোনে তার মিনতি? খুন চেপে গেছে আজিজের। সে তার স্ত্রীর উপরও চালাতে লাগল কুড়াল। দু'হাতে আঘাতের পর আঘাত করতে লাগল প্রচণ্ড জোরে। ফলে রক্তাক্ত শরীরে খানামাজিও লুটিয়ে পড়ল মাটিতে, তারও মৃত্যু হল নিমেষের মধ্যে।

এদিকে এসব দেখে খানামাজির মেয়েরা চিৎকার শুরু করল। ঘরের মধ্যে বড় মেয়ে খাতুন সর্বক্ষণই জাগা ছিল।

সেদিকে ভ্রুক্ষেপ না করে আজিজ সেই রাত্রেই তার রক্তমাখা কুড়াল হাতে নিয়ে সোজা দৌড়াতে দৌড়াতে গিয়ে উপস্থিত হল

Mamun Academy

বালাকোট থানায়। থানা ছিল তার বাড়ি থেকে ১৪/১৫ মাইল দূরে।

সে যখন থানাতে এসে পৌঁছল তখন প্রায় ভোর হয়ে গেছে। সে নিজেই ডেকে উঠাল ঘুমন্ত দারোগা সাহেবকে। তারপর অকপটে তার কাছে সমস্ত ঘটনা বলে গেল। তার জামা ও শরীরের বহু স্থানে তখনও রক্তের ছাপ লেগে ছিল। রক্তাক্ত কুড়ালও সে দাখিল করল থানায়। বিনা দ্বিধায় সে নিজেই এজাহার দিয়ে স্বীকার করে গেল যে সে নিজ হাতে জোড়া খুন করে এখন স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পণ করছে। যে কোন শাস্তিই সে মাথা পেতে নিতে রাজি আছে এখন।

এজাহার নিয়েই পুলিশ দ্রুত ঘটনা স্থলে পৌঁছল। সেখানে এসে দেখল এক বীভৎস দৃশ্য। প্রাণহীন উভয় লাশই তখনও যথা-স্থানে পড়ে আছে। নছরুল্লাহ ঘরের ভেতরে রক্তের মধ্যে ডুবে আছে। গায়ের শার্টের একটি হাতা মাত্র পরতে পেরেছিল সে। অন্য হাতাটি তখনও বাইরে ঝুলছে। তার দেহের নিচের দিকটা সম্পূর্ণ উলঙ্গ। বাইরে উঠানে পড়ে আছে খানামাজির মৃতদেহ রক্তাক্ত অব-স্থায়। তারও পরিধানে কোন পাজামা নেই। উভয়েরই শরীরে মারাত্মক ক্ষতচিহ্ন।

পুলিশ সঙ্গে সঙ্গেই আজিজকে গ্রেপ্তার করল। লাশ দুটিও ময়না তদন্তের জন্যে পাঠানো হল শহরে। কুড়াল, রক্তমাখা জামা ও শার্ট ইত্যাদিও পুলিশ আলামত হিসাবে গ্রহণ করল। ১১ই অক্টোবর আজিজকে ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে উপস্থিত করা হল। সেখানেও আসামী স্বেচ্ছায় তার সমস্ত দোষ স্বীকার করে এক স্বীকারোক্তি করল। ম্যাজিস্ট্রেট যথাযথভাবে তা রেকর্ড করে নিলেন।

তদন্তের পর পুলিশ আসামী আজিজের বিরুদ্ধে খুনের অপরাধে চার্জশীট দাখিল করল।

Mamun Academy

যথাসময়ে সেশন জজের কোর্টে এই মামলার বিচার শুরু হল। এখানে এসেও আসামীর সেই একই কথা। নির্ভয়ে আজিজ আসামীর কাঠগড়া থেকে জজ ও জুরীদের কাছে অকপটে বলল, 'হুজুর, আমি নিজ হাতে ব্যভিচারে রত অবস্থায় আমার স্ত্রী ও নছরুল্লাহকে খুন করেছি। ওদের দু'জনকে অধিক রাত্রে আমাদের ঘরে একই বিছানায় শুয়ে থাকতে দেখে আমি ধৈর্য ধরতে পারিনি, রাগের মাথায় তখনই তাদের খুন করে ফেলেছি।'

বিচার শেষে তিনজন জুরীই একমত হয়ে এই অভিমত প্রকাশ করেন যে আসামী আজিজ মহা উত্তেজনার মাথায় এই জোড়া খুন করেছে। তাই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তার দণ্ড লঘু হওয়া উচিত।

কিন্তু মাননীয় সেশন জজ জুরীদের সেই মত অগ্রাহ্য করে আসামীকে খুনের দায়ে দোষী সাব্যস্ত করে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২ ধারা অনুযায়ী তাকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের সুপারিশ করেন হাইকোর্টের নিকট।

এই দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে আসামীও জেল থেকে আপীল করল হাইকোর্টে।

তৎকালীন পেশোয়ার হাইকোর্টের বিচারপতি মাননীয় মোহাম্মদ শফী এই আপীল পর্যালোচনা করে তাঁর রায়ে বলেন :

'মৃত নছরুল্লার পক্ষে সেই রাত্রে আসামীর স্ত্রীর কাছে তার বাড়িতে যাবার কোন প্রয়োজনই ছিল না। আর স্বামীর অবর্তমানে আসামীর বাড়িতে তার স্ত্রীর সঙ্গে একই খাটে রাত্রিযাপন করা এক মহা অপরাধ। আরও দুঃখের বিষয় এই যে 'খানামাজির' মেয়েদের সামনে একই ঘরে এই নির্লজ্জ ঘটনা ঘটেছিল। উভয় মৃতেরই পরিধানে কাপড় ছিল না। এ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে তারা উভয়ে অবৈধ

Mamun Academy

পাপ কাজে লিপ্ত ছিল। আর আসামী সেই অবস্থায়ই তাদের উভয়কে ধরে ফেলে।

এহেন অবস্থায় যে কোন স্বামীরই রক্ত গরম হয়ে উঠার কথা, তা স্বভাবতঃ সে যত শান্ত প্রকৃতির লোকই হোক না কেন, অথবা সে শিক্ষিত বা অশিক্ষিত যাই হোক না কেন। আসামী তার উক্তিতে বলেছে যে সে তার নির্লজ্জ চরিত্রহীনা বিশ্বাসঘাতক স্ত্রীকে তার নাগরের সঙ্গে একই সাথে খুন করেছে, কারণ তা না হলে আসামীর পক্ষে তার সমাজে মুখ দেখাবার কোন উপায় ছিল না। তার নিজ গোত্র ও পরিবারের সম্মান রক্ষার জন্যেও এই খুনের প্রয়োজন ছিল। বিশেষ করে পাকিস্তানের সীমান্ত অঞ্চলের লোকদের জন্যে ব্যক্তিগত ও পারিবারিক সম্মানও এই ঘটনা ও তার পরিণতির সঙ্গে সত্যিই জড়িত ছিল।

মাননীয় বিচারপতির মতে আসামী আজিজ এক মহা উত্তেজনার মুহূর্তেই এই জোড়া খুন করেছে। তাই স্বভাবতই সে লঘু দণ্ড পাবার অধিকারী।

এর মধ্যেই সে কিছুকাল কারাদণ্ড ভোগ করেছে। তাই বিচারপতি তার জাবজ্জীবন কারাদণ্ড হ্রাস করে, আসামী গ্রেপ্তার হবার পর থেকে এই রায় পর্যন্ত যতকাল কারাগারে আবদ্ধ আছে, সেই পরিমাণ কারাদণ্ডেই তিনি তাকে দণ্ডিত করলেন।

অতঃপর হাইকোর্টের এই রায়ের সঙ্গে সঙ্গেই আসামী আজিজ জেল থেকে মুক্তি পেল।

Manun Academy

বিচার বিভ্রাট

এক

ইংলণ্ডে তথা বিশ্বের বহুদেশে বিচারে আসামীর মৃত্যুদণ্ড দানের বিরুদ্ধে জনমতের যে প্রবল ঝড় কিছুদিন আগে উঠেছিল তার মূলে ছিল কতগুলো মারাত্মক বিচার বিভ্রাটের কাহিনী। সেগুলোতে শেষ পর্যন্ত দেখা গেছে যে বিচার বিভ্রাটের কারণে প্রকৃত অপরাধীকে না ধরে এক বা একাধিক নিরপরাধ ব্যক্তির দণ্ড, এমন কি ফাঁসি পর্যন্ত হয়ে গেছে।

ইংলণ্ডের বিখ্যাত ইভানস্‌ এর কেস এরই একটি জলন্ত দৃষ্টান্ত। কিছুকাল আগে সংবাদপত্রে যখন এই বিস্ময়কর কাহিনীটি প্রকাশিত হয়, তখন বিশ্বের সর্বত্র এই নিয়ে প্রচণ্ড হৈ চৈ পড়ে গিয়েছিল।

২৫ বৎসর বয়স্ক ইভানস্‌ ছিল ইংলণ্ডের ওয়েলস-এর একজন অশিক্ষিত লরী চালক। ১৯৪৮ সালে তার ছোট্ট এক বৎসরের মেয়ে জেরালডিন ও একই সঙ্গে তার ১৯ বৎসর বয়স্কা যুবতী স্ত্রী বেরিলকে গলা টিপে হত্যা করার অভিযোগের বিচারে তাকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়।

লণ্ডনের নেটিংহিল এলাকায় ১০ নং রিলিংটন বাড়ির তেতলার একটি ঘরে তখন বাস করত ইভানস ও তার স্ত্রী। সেই বাড়িরই

Mainul Academy

নিচের তলায় সে সময়ে থাকত আরেকজন ভাড়াটিয়া, নাম রোজি লাণ্ড হ্যালিডে ক্রিপ্টি। ক্রিপ্টি ছিল একজন অবসরপ্রাপ্ত সামরিক পুলিশ কর্মচারী, তখন তার বয়স ছিল ৫১ বৎসর।

সে সময় লণ্ডনে পরপর কয়েকটি যুবতী মহিলা রহস্যজনক ভাবে নিখোঁজ হয়ে গেলে সংবাদপত্রগুলোতেহৈচৈ পড়ে গেল। শহর বাসী-দের মধ্যেও এক মহা আতঙ্কের সৃষ্টি হল। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে লণ্ডনের বিখ্যাত পুলিশ, এমনকি স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের কর্ম-চারীরা পর্যন্ত বহু চেষ্টা করেও সেসব রহস্যজনক অন্তর্ধানের কোনও সুরাহা করতে পারল না।

ঠিক এ সময়ই দেখা গেল ইভান্সের ছোট্ট মেয়ে জেরালডিনকে কে বা কারা নিষ্ঠুরভাবে গলা টিপে হত্যা করে মৃতদেহ তারই বাড়ির বাথরুমে ফেলে রেখে গেছে। আর সেই সঙ্গে ইভান্সের স্ত্রীর ও খবর পাওয়া গেল না। ভয় হল যে তাকেও খুন করা হয়েছে। কিন্তু অনেক খোঁজ করেও ইভান্সের স্ত্রীর মৃতদেহ উদ্ধার করা সম্ভব হল না।

পুলিশ এই বীভৎস হত্যাকাণ্ডের জন্যে ইভান্সকে সন্দেহ করে তাকে গ্রেপ্তার করল। ইভান্সের নিচ তলার ভাড়াটিয়া ক্রিপ্টিই ছিল এ ব্যাপারে ইভান্সের বিরুদ্ধে প্রধান সাক্ষী। ক্রিপ্টি প্রথমে পুলিশের নিকট ও পরে কোর্টে এসে সাক্ষ্য দিল যে সে নিজে দেখেছে যে, ইভান্স নিজেই তার কন্যা ও স্ত্রীকে গলা টিপে হত্যা করেছে। হত্যার কারণ হিসাবে ক্রিপ্টি কোর্টে জানাল যে সন্দেহপ্রবণ ইভান্সের ধারণা হয়েছিল যে তার স্ত্রী দুশ্চরিত্রা। আর ওই মেয়ে তার ঔরস-জাত নয়—সে ছিল জারজ সন্তান। হত্যার পর ইভান্স তার স্ত্রীর লাশ এমন ভাবে গুম করে ফেলল যে তা আর উদ্ধার করা সম্ভব

Mamun Academy

হয়নি। তবে মেয়ের লাশ পাওয়া গেল।

ইভান্স চাপে পড়ে প্রথমে পুলিশের কাছে তার তথাকথিত অপরাধ স্বীকার করলেও, পরে বিচারের সময় সে সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করে নিজেকে নিরপরাধ বলে ঘোষণা করল। সে সময়ে সে দৃঢ়কণ্ঠে এ-ও বলেছিল যে তার যুবতী স্ত্রী ও কন্যার প্রকৃত হত্যাকারী হল রোজালাণ্ড ক্রিস্টি। কিন্তু ক্রিস্টিই ছিল সেই মামলার সরকার পক্ষের প্রধান সাক্ষী, তাই তখন ইভান্সের কথায় কেউ গুরুত্ব আরোপ করেনি। জুরীরা স্বভাবতই মনে করেছিল যে প্রধান সরকারী সাক্ষীর বিরুদ্ধে আসামী ইভান্সের এক অহেতুক অভিযোগ।

ইভান্সের মামলার বিচারের সময়ে প্রধান সরকারী সাক্ষী ক্রিস্টি নিজেকে একজন সরল, সৎ ও সত্যবাদী সাক্ষী হিসাবে জাহির করে। সে নিজেকে অসুস্থ বলেও কোর্টকে জানায়। এভাবে সে বিচারক ও জুরীদের বিশ্বাস ও সহানুভূতি আকর্ষণের চেষ্টা করে। সাক্ষী দিয়ে কাঠগড়া থেকে নিচে নেমে প্রতিবারেই সে পাহারারত পুলিশকে গর্বিত ভাবে জিজ্ঞেস করত, 'কেমন, ঠিক ঠিক সাক্ষ্য দিয়েছি ত?'

অন্যদিকে আসামী ইভান্স একজন মিথ্যাবাদী বলে পরিচিত ছিল। এমনকি তার মা-বোনও তাকে মহা মিথ্যাবাদী বলে জানত। তাই সে পর্যন্ত কেউ তার পাল্টা অভিযোগে কান দেয়নি। বিচারে জুরিরা তাকে হত্যার দায়ে দোষী সাব্যস্ত করলেন ও শেষ পর্যন্ত তার মৃত্যু দণ্ডের আদেশ হল।

দণ্ডপ্রাপ্ত হবার পরে জেলখানার সেলে বসে ইভান্স যখন ফাঁসির দিন গুণছিল তখন ইভান্স কয়েকবারই জেলের কর্মচারী ও অন্যান্যদেরকে বলেছিল, 'আমি একটি বিষয়ে নিশ্চিত যে আমি যে-অপরাধ কোনদিন সত্যিই করিনি, সেই অপরাধেই দোষী সাব্যস্ত হয়ে আজ আমি

মৃত্যুর জন্যে দিন গুণছি।' কিন্তু মিথ্যুক বলে কথিত ইভান্সের সেই কথা তখন সবাই পাগলের প্রলাপ বলে উড়িয়ে দিয়েছিল। তাছাড়া দেশের বিচার ব্যবস্থার প্রতি তখনও লোকের এত আস্থা ছিল যে ইংলণ্ডের বিচারে কোন নিরপরাধ ব্যক্তির মৃত্যুদণ্ড হতে পারে সেকথা কেউ কল্পনাও করতে পারত না।

যথা সময়ে ইভান্সের ফাঁসি হয়ে গেল। ফাঁসির দড়ি গলায় ঝোলাবার আগেও সে ফরিয়াদ করে ঘোষণা করেছিল যে সে নিরপরাধ কিন্তু তবুও তাকে ফাঁসি দেয়া হচ্ছে।

এর চার বৎসর পরে ক্রিফি পরিবার রিলিংটন বাড়ির সেই বাসা বদল করে অন্যত্র চলে যায়। আর সে জায়গায় আসে আর একজন নতুন ভাড়াটিয়া।

১৯৪৩ সালের মার্চ মাসে নতুন ভাড়াটিয়া সেই বাড়িতে ক্রিফ্টির বাস করা অংশে উঠে এল। নতুন বাসায় এসে তারা দেখল যে রান্না ঘরে কোন ব্রাকেট নেই। অথচ সেখানে একটি ব্রাকেট একান্ত দরকার। সারাদিন কাজের চাপে এদিকে তারা নজর দিতে পারেনি। তাই নতুন ভাড়াটিয়া রাত্রে রান্নাঘরের দেয়ালে ব্রাকেট টানাবার কাজে লেগে গেল। কিন্তু দেয়ালে পেরেক ঠুকতে গিয়ে সে একটি অস্বাভাবিক জিনিস লক্ষ্য করল। দেয়ালের যেখানেই সে পেরেক ঠুকতে চেষ্টা করে সেখানেই দেখে যে উপরের ক্ষীণ প্লাস্টারের নিচেই দেয়ালটি একদম ফাঁপা। তার হাতুড়ির আঘাতে দেয়ালের ওপরের প্লাস্টারের একটি অংশ ভেঙে নিচে পড়ল। দেখা গেল যে ভেতরে গর্ত ও অন্ধকার। অতঃপর সে সেই ভাঙা অংশে টর্চ জ্বেলে ভেতরে যা দেখতে পেল তাতে তার মূর্চ্ছা যাবার উপক্রম হল। টর্চের আলোতে ছায়ার মত দেখা গেল একটি উলঙ্গ যুবতী মেয়ে ভেতরে বসে আছে।

Mamun Academy

একটা ভ্যাপসা গন্ধও বেরিয়ে এল ভেতর থেকে। যুবতীটি মৃত, তবে তাকে বসা অবস্থায় রাখা হয়েছে।

হঠাৎ এই দৃশ্য দেখে সে ভয়ে সোজা দৌড়ে এসে হাঁপাতে হাঁপাতে তার স্ত্রীকে এই রহস্যজনক ভয়াবহ আবিষ্কারের কথা বলল।

সৌভাগ্যক্রমে ভদ্রলোকের স্ত্রী ছিল খুব সাহসী মহিলা। সে কৌতূহলী হয়ে স্বামীকে নিয়ে গেল পাকের ঘরে। উভয়ে মিলে দেয়ালের প্লাস্টারের বাকি ফাঁপা অংশটুকু শাবল দিয়ে ভেঙে ফেলল। এবার তারা ভাঙ্গা দেয়ালের ভেতরের ফাঁকা অংশে পরিষ্কার দেখতে পেল বসা অবস্থায় রাখা একজন স্ত্রীলোকের নগ্ন মৃতদেহ।

তখনই পুলিশকে খবর দেয়া হল।

শোনামাত্র পুলিশ দ্রুত এসে পৌঁছল সে বাড়িতে। সব দেখার পরে তারা দেয়ালের ভেতর থেকে টেনে বের করল স্ত্রীলোকের সেই নগ্ন মৃতদেহ। কিন্তু আরও বিস্মিত হয়ে দেখতে পেল যে সেই স্ত্রীলোকটির পেছনে লুকানো রয়েছে আরও নগ্ন একটি স্ত্রীলোকের মৃতদেহ। সে লাশটিও পুলিশ টেনে বের করল বাইরে। কিন্তু কি আশ্চর্য! এই দ্বিতীয় লাশটির পেছনে দেখা গেল আরও একটি যুবতীর মৃতদেহ, তার মাথার সঙ্গে একটি বালিশ জড়ানো। তার শরীর একটি কম্বল দিয়ে ঢাকা। আর সেই কম্বলের সঙ্গে দ্বিতীয় যুবতীটির ব্রেসিয়ারের এক কোণা শক্ত করে গিঠ দিয়ে বাঁধা যার ফলে মৃতদেহগুলো বসা অবস্থায় রাখা সম্ভব হয়েছিল।

প্রাথমিক তদন্তে দেখা গেল যে এদের সবাইকেই গলাটিপে শ্বাসরুদ্ধ করে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হয়েছে। কিন্তু কে করেছে এই নৃশংস হত্যাকাণ্ড আর কেনই বা করেছে? আর এমন সুনিপুণভাবে মৃতদেহগুলো দেয়ালের ভেতর লুকিয়ে রাখারই বা কারণ কি? সবার মনে

Mamun Academy

জাগল এই প্রশ্ন।

এরপর পুলিশ আরও খুঁজতে খুঁজতে সেই ঘরের সামনের কামরার মেঝের নিচে থেকে আবিষ্কার করল মিসেস ক্রিস্টির মৃতদেহ। সেটাও নগ্ন অবস্থায় ছিল। তারপর আরও খুঁজে সেই বাড়ির বাগানের এক অংশের মাটি খুঁড়ে তার নীচ থেকে পুলিশ টেনে তুলল আরও দুজন যুবতীর মুণ্ডহীন মৃতদেহ। এ দুটোর মধ্যে একটি মিসেস বেরলী ইভান্সের মৃতদেহ যে ১৯৪৮ সাল থেকে নিখোঁজ হয়েছিল।

পরে অনুসন্ধানে পুলিশ জানতে পারল যে মিসেস ইভান্সের ছিন্নমুণ্ড কাছেই রাস্তার ডাস্টবিনের নিচে লুকানো ছিল। কিন্তু তা তখন আর কারও চোখে পড়েনি। পুলিশ আরও দেখতে পেল যে বাড়ির বাগানের একটি হেলানো বেড়া সোজা করে বাঁধা আছে যা দিয়ে তা হচ্ছে একটি মৃত মহিলার উরুর হাড়। এর আগে একজন মহিলা রহস্যজনক ভাবে সদ্য গুম হওয়ার পর পরই পুলিশ একবার সন্দেহ বশত এই বাগানে হানা দিয়েছিল। সে সময়ে অতিশয় ভদ্রবেশী হ্যালিডে ক্রিস্টি পুলিশের পরম বন্ধু সেজে তাদের সঙ্গে সহযোগিতার ভাব দেখিয়ে বিনীতভাবে সমস্ত বাগান ঘুরিয়ে দেখায়। তখন তার হাবভাব দেখে পুলিশ তাকে সন্দেহ করার কোন কারণই খুঁজে পায়নি।

এবার পুলিশ এই ঘরের পূর্ববর্তী বাসিন্দা রোজিলাণ্ড ক্রিস্টির খোঁজ করতে লাগল। কিন্তু ক্রমাগত ছয়দিন যাবত সমস্ত ইংলণ্ড তন্ন তন্ন করে খুঁজেও তার হদিস পাওয়া গেল না। সাতদিনের মাথায় পুলিশ দেখতে পেল একজন পরিশ্রান্ত ও ক্ষুধার্ত বেঁটে ধরনের মানুষ টেমস নদীর বুটনী ব্রিজের নিকটে বাঁধের কাছে সন্দেহজনক-ভাবে ঘোরাফেরা করছে। পুলিশের প্রশ্নের উত্তরে লোকটি জানাল

Mamun Academy

যে তার নাম ডায়ডিংটন, সে একজন বেকার, তাই চাকরির খোঁজে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কিন্তু পুলিশের জেরার উত্তরে সে তার প্রকৃত পরিচয় ও ঠিকানা প্রকাশ করতে ব্যর্থ হওয়ায় পুলিশের সন্দেহ বেড়ে গেল। এবার পুলিশ তার মাথার হ্যাটটি সরাতেই ছদ্মবেশ খসে পড়ল। দেখা গেল যে এই সেই জন রোজিলাণ্ড ক্রিপ্টি যার খোঁজে গত সাতদিন যাবত তারা সারা ইংলণ্ড চষে বেড়িয়েছে। চার বৎসর আগে যে ওল্ড বেইলীর ১নং কোর্টে ইভান্সের বিচার ও মৃত্যুদণ্ড হয়েছিল, সেই কোর্টেই এবার শুরু হল বহু খুনের আসামী ক্রিপ্টির চাঞ্চল্যকর বিচার। চার বৎসর আগে এই কোর্টে এই আসামী ক্রিপ্টিই ছিল ইভান্সের বিরুদ্ধে প্রধান সরকারী সাক্ষী। এখানে দাঁড়িয়েই ক্রিপ্টি বিচার শেষে শুনেছিল ইভান্সের মৃত্যু দণ্ডাদেশ, আর সেদিন সে রহস্যের হাসি হেসেছিল আস্তিনের আড়ালে মুখ লুকিয়ে। আজ আবার সেই একই অপরাধে ক্রিপ্টি নিজেই এসে দাঁড়িয়েছে খুনীর আসামীর কাঠগড়ায়।

এবার কিন্তু বিচারে ক্রিপ্টি আত্মপক্ষ সমর্থনের কোন চেষ্টাই করল না। বরং যে কোর্টে দাঁড়িয়ে অকপটে নিজের সমস্ত দোষ স্বীকার করে নিল। বিনা দ্বিধায় একথাও স্বীকার করল যে সে পুলিশের অভিযোগ অনুযায়ী ছয়টি নয়, বরং মোট সাতটি যুবতীকে গলা টিপে হত্যা করেছে। আর তার সপ্তম শিকার ছিল তার উপরের তলার অধিবাসী মিসেস ইভান্স, যাকে হত্যার অপরাধে চার বৎসর আগে তার স্বামী ইভান্সের ফাঁসী হয়ে গেছে।

আসামীর স্বীকারোক্তি থেকে জানা গেল যে এই সব হত্যাকাণ্ডের পিছনে ছিল এক করুণ কাহিনী।

ক্রিপ্টির চরিত্রে ঘটেছিল এক যৌন বিকৃতি। যৌবনকালে সে

হয়ে পড়ে পুরুষত্বহীন ও স্বাভাবিক স্ত্রী-সহবাসে অক্ষম। স্ত্রীলোকদের কাছে প্রথমে প্রেম নিবেদন করে পরে তাদের তীব্র উন্মাদনার মুহূর্তে সে বুঝতে পারে যে নারীর জৈবিক ক্ষুধা মেটাবার ক্ষমতা তার নেই। স্ত্রীলোকের দেহ নিয়ে মাতামাতি করে শেষ মুহূর্তে চুপসে যেত ক্রিস্টি তার অক্ষমতার জন্যে। ফলে সেই চরম মুহূর্তে নিজের ব্যর্থতার জন্যে অপর পক্ষের বিরক্তি ও টিটকারী তার বুকে শেলের মত বিঁধত। আর সে নিদারুণ ভয় করত তাদের সে সব গঞ্জনা। অথচ তার স্বভাব আবার এমন হয়ে গিয়েছিল যে নারী সংসর্গও তার মাঝে মাঝে চাইই।

ফলে তার এক বিচিত্র যৌন বিকৃতি ঘটে। পরবর্তীকালে চিকিৎসার পরে যৌন ক্ষমতা সে ফিরে পেলেও, জীবিতের চাইতে মৃত অথবা অর্ধমৃত যুবতীদের ওপরেই নিজের যৌনক্ষুধা চরিতার্থ করা সে অধিক নিরাপদ মনে করত। আর সেই অভ্যাসই তার স্থায়ীভাবে গড়ে ওঠে, কারণ সেই সব মৃত বা অর্ধমৃত স্ত্রীলোকেরা যৌন মিলনে অতৃপ্ত হলেও তার প্রতি বিরক্তি বা টিটকারী কিছুই প্রকাশ করতে পারত না। এ ভাবেই স্ত্রীলোকের সঙ্গে স্বাভাবিক সহবাসের প্রতি হয়ে যায় তার ভয়ানক ভয় ও বিতৃষ্ণা।

তার বাসার পাশের ঘরের দেয়ালের গর্তে ও মাটির নিচে যে সাত জন যুবতীর মৃতদেহ পাওয়া গেছে তাদের সবাইকেই সে বিভিন্ন সময়ে নানা অজুহাতে নিজের ঘরে নিয়ে এসেছিল সেখানে তাদের বশ করে বা প্রলোভন দেখিয়ে, তাদের অজান্তে একটি নলের সাহায্যে তাদের শরীরে একপ্রকার বিষাক্ত গ্যাস প্রবেশ করিয়ে দিত। ফলে অচিরেই তারা অজ্ঞান হয়ে পড়ত। তারপর অজ্ঞান সাতজন যুবতীর প্রত্যেককেই সে প্রথমে গলাটিপে হত্যা করে। তারপর

মৃতদেহগুলোকে উলঙ্গ করে তাদের উপর পাশবিক অত্যাচার চালিয়ে নিজের কামক্ষুধা চরিতার্থ করে নাকি সে এক পরম আনন্দ অনুভবকরত। এই দুষ্কর্মের চিহ্ন স্বরূপ সে এক বিচিত্র খেয়ালবশত তার শিকারের প্রতিটি যুবতীর কয়েকগাছি করে মাথার চুল ছিঁড়ে নিয়ে তা তামাকের কৌটার মধ্যে ভরে এতদিন সযত্নে রক্ষা করে এসেছে। (কোর্টে সে চুল ভর্তি কৌটাটিও হাজির করে।) এরপরেই সে অতি ক্ষিপ্রতার সঙ্গে প্রত্যেকটি মৃতদেহ হয় রান্নাঘরের পুরু দেয়ালের ভেতরে অথবা মাটির নিচে সুনিপুণভাবে গুম করে ফেলত। এত পূর্ততার সংগে সে কাজগুলো করত যে অনেক চেষ্টা করেও পুলিশ তখন ওই সব যুবতীর রহস্যজনক অন্তর্ধানের কোন হদিসই করতে পারে নি, বা তখন এর একটি মৃতদেহও খুঁজে বের করতে পারেনি। এসব ব্যাপারে ক্রিস্টিকে সন্দেহ করার কোন কারণ পর্যন্ত ইতিপূর্বে পুলিশ পায়নি। আর তারই ফলে ভদ্রবেশী এই খুনী ও লম্পট নির্ভয়ে সমাজে এতদিন ঘুরে বেড়িয়েছে। আর সবচেয়ে দুঃখের কথা হল যে এরই সাক্ষ্যের ফলে একজন নিরপরাধ ব্যক্তি ইভান্সকে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলতে হয়েছে।

এই বিচিত্র ঘটনার একটিও যদি চার বৎসর আগে ঘুণাক্ষরেও জানা যেত, তবে নিশ্চয়ই ইভান্সের প্রাণদণ্ডাদেশ হত না। কিন্তু যখন এই নাটকীয় বীভৎস হত্যাকাণ্ডগুলোর কথা প্রকাশ পেল, তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে। কারণ এর চার বৎসর আগেই নির্দোষ ইভান্সকে জোর করে আইনের যুপকাষ্ঠে বলি দেয়া হয়ে গেছে। আর সেদিন তার আবেদনে কেউ কর্ণপাতও করেনি।

বৃথাই আফসোস করতে লাগল সবাই যে তখন যদি তার ফাঁসি না হয়ে অন্তত যাবজ্জীবন কারাদণ্ডও হত, তাহলে আজ জেল থেকে

Mamun Academy

সমস্ত শহর তন্ন তন্ন করে খুঁজে গতরাত্রে আমি লোকটির সাক্ষাত পাই। দেখি যে শহরের উপকণ্ঠে সে দিব্যি ঘর সংসার করছে এখনও।

ওকে দেখে আমার রক্ত টগবগ করে ফুটে উঠল। আজ সুযোগ পেয়ে তাকে আমি নিজ হাতে গলা টিপে হত্যা করেছি। আর এই আপনার সামনে সেই লাশ এখন আমি হাজির করলাম। গত ১০ বৎসর যাবত মিথ্যা অপরাধের অভিযোগে আমি জেলে পচেছি। আর প্রতিক্ষণ আমি এই মুহূর্তেরই অপেক্ষায় ছিলাম। আজ আপনাকেসহ দেশের প্রতিটি লোককে আমি চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে চাই যে কত ভ্রান্ত এই বিচারের প্রহসন। এখন অবশ্য আমি খুনের অপরাধে অপরাধী। তাই যে দণ্ড এখন আমাকে দেবেন আমি তা মাথা পেতে নেব।'

পুলিশ কাসেমকে আবার গ্রেপ্তার করল।

কয়েকদিন পরের ঘটনা :

জজ সাহেবের বাংলো। সারা রাত জেগে জজ সাহেব ঘাঁটছেন আসামী কাসেমের পুরানো সেই কেসের রেকর্ড। সেই সঙ্গে সেদিনের কোর্টের মধ্যে কাসেমের নাটকীয় ঘটনার তদন্ত রিপোর্টও।

আশ্চর্য হয়ে জজ সাহেব দেখলেন যে কাসেমের বিবরণ একেবারে সত্যি। ওই একই ব্যক্তিকে খুন করার অপরাধে তিনি জুরীদের সঙ্গে একমত হয়ে আসামী কাসেমকে দশ বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেছিলেন।

কিন্তু ইংরেজদের দেয়া ফৌজদারী আইনে এরকম মারাত্মক ভুল হওয়া কি করে সম্ভব? মনে মনে প্রশ্ন করেন জজ সাহেব।

কিন্তু সত্যিই ত বিচারে ভুল হয়ে গেছে। কাসেম এবার তা চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে। বিবেকের দংশনে জজ সাহেব

ঠোঁট কামড়াতে লাগলেন। তাঁর যেন বিশ্বাস হচ্ছে না। আবার তন্ন তন্ন করে রেকর্ড ঘাঁটতে লাগলেন তিনি।

হ্যাঁ, ঠিকই দেখা যাচ্ছে একের পর এক ছয়জন চোখে দেখা সাক্ষী বলে গেছে আসামী কাসেম কর্তৃক ওই খুনের লোমহর্ষক কাহিনী। পুলিশের সুরতহাল, ডাক্তারী রিপোর্ট, ম্যাজিস্ট্রেটের প্রাথমিক তদন্ত রিপোর্ট সবই ঠিক আছে এবং হুবহু মিলে যাচ্ছে ঘটনার সঙ্গে। জুরীদের সর্বসম্মত রায়ও ছিল আসামীর বিরুদ্ধে। এই সব সাক্ষ্য-প্রমাণের পরে আসামী কাসেমকে সাজা দেয়া ছাড়া জজ সাহেবের আর কি উপায়ই বা ছিল?

তবে হ্যাঁ, আর একটি কথা সেই দশ বৎসর আগেও জজ সাহেবের বিবেককে নাড়া দিয়েছিল তখনই। সেটা হল, আসামী ছিল একজন গরীব কৃষক। তবে কৃষকদের নেতাও ছিল সে। আর ফরিয়াদী পক্ষ ছিল ধনী ও প্রতাপশালী জমিদার। খুনী ব্যক্তিটি ছিল জমিদারেরই অধঃস্তন এক কর্মচারী। একথা বিবেচনা করেই তিনি কম শাস্তি দিয়েছিলেন আসামী কাসেমকে।

অবশ্য এবারও খুনের অপরাধে কাসেমের আবার বিচার হল এবং পুনরায় তার ১০ বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হল। কিন্তু যেহেতু সে মিথ্যা অভিযোগে আগেই সেই কারাদণ্ড ভোগ করেছে তাই এবার রায়ের সঙ্গে সঙ্গেই সে ছাড়া পেয়ে গেল।

আর বিবেকের দংশনে জজ সাহেব ইস্তফা দিলেন তাঁর চাকরি থেকে সেদিনই।

সত্যিই কি জজ সাহেবের সম্পূর্ণ দোষ ছিল সেই বিচার বিভ্রাটে? 'শেষ বিচারের মালিক' অন্তর্যামী আল্লাহ্‌ই একমাত্র মানুষের বিচিত্র মনের সকল খবর রাখেন। কিন্তু মানুষের বিচারজ্ঞান যে

এব্যপারে সীমাবদ্ধ। তাই বিচারককে নির্ভর করতে হয় সাক্ষ্য প্রমাণ ও আইনের কুটতর্কের ওপর। সাক্ষীরা যদি কোর্টে সত্য সাক্ষী না দেয় তবে বিচারকের ঐকান্তিক চেষ্টা থাকা সত্ত্বেও প্রকৃত সত্য উদ-ঘাটিত হওয়া সম্ভব হয় না। আর সে কারণেই মাঝে মাঝে দেখা দেয় এহেন বিচার বিভ্রাট। আর তখনই 'বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে।

Mamun Academy

পিকনিকের জের

সে ১৯৫৪ সালের কথা। লাহোর গার্লস কলেজের ছাত্রীরা ঠিক করল তারা ৫ই জুন তারিখে শেখুপুরার নিকট বিখ্যাত 'হিরন মিনারে' যাবে এবার পিক্‌নিক করতে। কলেজের ৩০ জন ছাত্রীর একদল এর জন্যে তৈরি হল। যথাসময়ে কলেজের প্রিন্সিপালের অনুমতিও পাওয়া গেল। হৈ হৈ রব পড়ে গেল ছাত্রীদের মধ্যে।

সকালে লাহোর থেকে রওনা হয়ে ছাত্রীরা শেখুপুরা রেল স্টেশনে এসে নামল দুপুরের বেশ আগেই। সেখানে তারা দুই ভাগে ভাগ হয়ে গেল। এক দল ছাত্রী টোঙ্গাতে করে খাবার সামগ্রী কেনার উদ্দেশ্যে শহরের দিকে রওনা হল, আর অন্য দল হেঁটে 'হিরন মিনারে' রওনা হল পিকনিকের অন্যান্য জিনিসপত্র নিয়ে।

শেখুপুরার মত ছোট শহরের বাজারে হঠাৎ এতগুলো আধুনিকা তরুণীকে 'হলিডে মুডে' ঘোরাফেরা করতে দেখে স্বভাবতই অনেকের কৌতূহল হল, এই সব তরুণী কারা? কোথা থেকে এসেছে জানবার আশায় কয়েকজন যুবক উঠে পড়ে লেগে গেল। টোঙ্গাওয়ালার কাছে খোঁজ নিয়ে তারা জানল যে এরা সবাই লাহোর মহিলা কলেজের ছাত্রী, যাচ্ছে হিরন মিনারে পিক্‌নিক করতে।

তাড়াতাড়ি বাজার সেরে তরুণীরা টোঙ্গায় চড়ে যখন হিরন মিনারে পৌঁছল তখন দুপুর সাড়ে বারটা। প্রায় সেই সময়েই

Mamun Academy

পায়ে হাঁটা ছাত্রীদলও সেখানে এসে পৌছল। আর সেই সঙ্গে তাদের পিছু ধাওয়া করল একদল ভদ্রবেশী লজ্জাহীন যুবক। তারাও ছাত্রীদের পর পরই হিরন মিনারে এসে ঢোকে ছুটি ট্যাক্সি, একটি মটর সাইকেল ও কয়েকটি বাইসাইকেলে।

কলেজের ছাত্রীরা হিরন মিনারের 'বড় দারী' নামক ঐতিহাসিক ঘরে তাদের প্রধান আড্ডা জমাল। সেখানে জটলা করে ছাত্রীরা গ্রামোফোন বাজাতে শুরু করল। যুবক দলের একটি অংশও তাদের পিছু নিয়ে বড় দারীতে এসে ঢুকল। তারা ছাত্রীদের আশেপাশে ঘোরা ফেরা করতে লাগল আর মাঝে মাঝে ছাত্রীদের উদ্দেশ্যে আপত্তিকর সম্ভাষণ ও কুরুচিপূর্ণ অঙ্গ ভংগি করতে লাগল।

মোহাম্মদ রফিক নামক একজন যুবক সে ইলেকট্রিসিটি ডিপার্টমেন্টের লাইন সুপারিনটেণ্ডেন্ট ছিল, এক টুকরা কাগজে কি লিখে মুড়ে যে মেয়েরা গ্রামোফোন বাজাচ্ছিল তাদের মাঝে ছুঁড়ে দিল। তাতে লেখা ছিল, 'অনুগ্রহ করে অমুক গানটি আবার বাজালে বাধিত হব।' একটি মেয়ে রেগে সেই কাগজটি ছুঁড়ে ফেলে দিল। আর সংগে সংগে মোঃ রফিক ছুটে এসে ছোঁ মেরে সেটি তুলে নিয়ে মুখে চেপে ধরে চুমু খেল। তারপর সে একটি মেয়েকে উদ্দেশ্য করে বলল, 'যদি গানটি না-ই বাজান—তবে নিজেই গান না সেই গানটি। শুনে আমরা ধন্য হই।'

মেয়েটি রেগে উত্তর দিল, 'অসভ্যের দল! আপনার লজ্জা হওয়া উচিত। চলে যান এখান থেকে। আপনাদের সাহস দেখছি খুব বেশি।'

সংগে সংগে মোঃ রফিক হেসে উত্তর দিল, 'সাহস করে না এগুলে কি ভাগ্য কখনও সুপ্রসন্ন হয়?'

Mamun Academy

মেয়েদের মধ্যে আর একজন রেগে বলল, 'দেখুন, আপনারা মুসলমান না? পুরুষদের জন্যে এখানে আসা অন্যায়। আপনারা দয়া করে চলে যান আর আমাদের একলা থাকতে দিন।'

রফিক আবার হেসে হাত নেড়ে কবিতার সুরে উত্তর দিল, 'প্রেয়সীর মুখে কি সাজে জিজ্ঞেস করা আমরা মুসলমান কিনা?'

এদের নির্লজ্জতায় উত্যক্ত হয়ে মেয়েরা অগত্যা বড় দারি ত্যাগ করে হিরন মিনারে এসে মিনারের চূড়ায়ে উঠতে লাগল। কিন্তু যুবকের দল এবারও পিছু ধাওয়া করল। তারাও মেয়েদের পাশাপাশি এক সংগেই মিনারে উঠতে লাগল। যুবকেরা সেই সময়ে ক্যামেরা দিয়ে মেয়েদের ফটো তুলতে চেষ্টা করল। একজন যুবক আবার একসময় হঠাৎ একটি মেয়ের রুমাল টেনে নিল।

যুবক দলের অনবরত এই মাত্রাহীন দুর্ব্যবহারে উত্যক্ত হয়ে একটি মেয়ে তাদের উদ্দেশ্যে বলল, 'আমরা আপনাদের বোনের মত, আমাদের প্রতি আপনাদের এহেন দুর্ব্যবহার শোভা পায় না।'

রফিক সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিল, 'আহা আহা বলেন কি? নিজেদের বোন না বলে শালী বললেই ত সম্পর্কটা আরও মধুর হয়।' এই বলেই বখাটে রফিক একটি খিরাই ছুঁড়ে দিল একটি মেয়ের দিকে।

দুপুর সাড়ে বারটা থেকে বিকাল চারটা পর্যন্ত ক্রমাগত যুবকেরা মেয়েদের উত্যক্ত করে চলল সেই পিকনিক পার্টিতে। তারা অনেক চেষ্টা করেও এদের এড়াতে পারল না।

অবশেষে মেয়েরা বিকাল চারটায় আবার তাদের টোংগাতে উঠল ফিরে যাবার জন্যে। কিন্তু এবারও যুবকদের একটি অংশ দুইটি মোটরে ও একটি মোটর সাইকেলে চড়ে তাদের পিছু ধাওয়া করল, রফিক ও আহসানই ছিল তাদের নেতা।

Mamun Academy

রাস্তা ছেড়ে মেয়েদের টোংগা যখন একটি মাঠের ভিতরে প্রবেশ করল তখন রফিক গাড়ি থেকে নেমে মোটর সাইকেলের পিছনে উঠে বসল। আর বারে বারে মোটর সাইকেল টোঙ্গার পাশাপাশি এনে মেয়েদের দিকে অশ্লীল অংগভংগি ও আপত্তিজনক মন্তব্য করতে লাগল।

মেয়েরা এর প্রতিবাদ করল। একটি মেয়ে ওদের লক্ষ্য করে বলল, 'তোমাদের লজ্জা হয় না? মরতেও পার না?' তখন হেসে যুবক রফিক উর্দু কবিতায় যে উত্তর দিল তা বাংলায় অনেকটা এরকম, 'মরিব মরিব সখি নিশ্চয়ই মরিব, তব রথচক্রতলে প্রাণ দিব।' আর একজন বলল, 'তোমাদের টোঙ্গার রাস্তায় বুক পেতে দিতে রাজি আছি। ওর নিচে পিষ্ট হয়ে মরতে পারলেও যে আমার মহা আনন্দ!'

অগত্যা একজন ছাত্রী পা থেকে একপাটি জুতা খুলে যুবকদের দেখিয়ে বলল, 'তোমাদের মত বখাটেদের জুতাপেটা করা উচিত।'

'সুন্দরীদের হাত থেকে মহা আনন্দে আমরা ঐ সম্মান গ্রহণ করতে রাজি আছি,' সঙ্গে সঙ্গেই উত্তর দেয় একজন যুবক। পাশাপাশি চলতে চলতে একবার তাদের মোটর সাইকেল একেবারে টোঙ্গার গা ঘেঁষে চলে গেল। আর সেই সময় মোটর সাইকেলের একজন আরোহী টোঙ্গার পাশের হাতলে রাখা একটি মেয়ের হাতের উপর জোরে চাপ দিল।

এই সব অশোভনীয় আচরণে মেয়েদের ধৈর্যের বাধ ভেঙে গেল। তারা এবার আইনের আশ্রয় নেয়াই সাব্যস্ত করল।

শেখুপুরা পৌঁছে একজন ছাত্রী সোজা চলে গেল থানায়। সেখানে সে সমস্ত ঘটনা জানিয়ে এক এজাহার দিল। এবার কিন্তু

Mamun Academy

যুবকেরা প্রমাদ গণল।

পুলিশ তদন্ত শেষে চারজন আসামীর বিরুদ্ধে চার্জশীট দাখিল করল ফৌজদারী দণ্ডবিধির ৩৫৪, ২৯৪, ও ৫০৯ ধারা অনুসারে। বিচারে মাননীয় সহকারী জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এদের মধ্যে তিনজন আসামীকে ৫০৯ ধারা অনুসারে দোষী সাব্যস্ত করে প্রত্যেককে এক বৎসর করে সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করলেন। তারা হল মোঃ শরিফ, মোঃ রফিক, ও আহসান উল হক। এ ছাড়া ম্যাজিস্ট্রেট আসামী রফিককে ৩৫৪ ধারায়ও দোষী সাব্যস্ত করে তাকে আরও দুই বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করলেন। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে এই সব আসামীরাই প্রত্যেকে তখন সরকারী ও বেসরকারী বিভাগের দায়িত্বপূর্ণ কর্মচারী ছিল।

হঠাৎ এরকম পরিস্থিতির জন্যে এরা বোধহয় প্রস্তুত ছিল না। দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে আসামীরা জর্জকোর্টে আপীল করল। আপীলে মাননীয় সহকারী সেশন জজ সকল আসামীকেই খালাস দেন। রায়ে তিনি বলেন যে, ঘটনাটি ঘটেছে একটি সাধারণ (পাবলিক) স্থানে, যেখানে মেয়েদের ন্যায় যুবকদেরও প্রবেশের ন্যায্য অধিকার ছিল। আর আসামীরা মেয়েদের কোন শ্লীলতা হানি করেনি। সেদিন বড়-দারীতে মেয়েরা গিয়েছিল বলে যে পুরুষেরা সেখানে যেতে পারবে না এমন কথা বলা আইন সঙ্গত হবে না। তাঁর মতে শেখুপুরা অঞ্চল লাহোরের মত অতখানি অগ্রসর নয়, তাই ছাত্রীরা যদি বেপর্দা ভাবে এই রকম একটি সাধারণ স্থানে দল বেঁধে যাওয়া স্থির করে, তবে স্বভাবতই তা পার্শ্ববর্তী যুবকদের মনে কৌতূহলের উদ্রেক করবে। আর তখন সেখানে পুরুষদের আসতে বাধা দেবার কোন অধিকার সেই বেপর্দা মেয়েদের থাকতে পারে না।' মাননীয় জজ আরও

বলেন যে, প্রকৃতপক্ষে কলেজ কর্তৃপক্ষের ভুল হয়েছিল গোড়াতে। তাঁদের উচিত হয়নি অভিভাবক ছাড়া কলেজের এতগুলো ছাত্রীকে এ ভাবে অতদূরে যেতে দেয়া। বিশেষ করে তাদের সঙ্গে যখন কোন শিক্ষক বা প্রফেসর দেয়া হয়নি। স্বাভাবিকভাবেই এরকম ক্ষেত্রে সম্ভবতঃ মেয়েদের ব্যবহারও আপত্তিকর হয়েছিল, তাই তিনি আসামীদের নির্দোষ ঘোষণা করে তাদের খালাস দেন।

এই আদেশের বিরুদ্ধে গভর্ণমেন্ট পুনরায় হাইকোর্টে আপীল দায়ের করে।

পশ্চিম পাকিস্তান হাইকোর্টের দুইজন মাননীয় জজ উক্ত আপিল শুনেন। তাঁরা কিন্তু সহকারী জজের সঙ্গে একমত হতে পারলেন না। তাঁরা আসামীদের দোষী সাব্যস্ত করেন, তবে তাদের দণ্ডাদেশ লঘু করে দেন।

এর বিরুদ্ধে আসামীরা সুপ্রীম কোর্টে আপীল করে।

মাননীয় চীফ জাস্টিস মুনির সহ সুপ্রীম কোর্টের পাঁচজন বিচারপতি সেই আপীল শুনেন। অ্যাডভোকেট জনাব মঞ্জুর কাদের এই বিচারে আসামীদের পক্ষ সমর্থন করেন, মাননীয় প্রধান বিচারপতি তাঁর রায়ে সমস্ত বিষয় আলোচনা করে বলেন যে আসামীদের অশোভনী আচরণ সম্বন্ধে প্রচুর প্রমাণ পাওয়া গেছে, অথচ মেয়েরা সীমা লংঘন করেছে বলে কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি। সহকারী সেশন জজের মতের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করে তিনি তাঁর রায়ে বলেন যে, কলেজ কর্তৃপক্ষ বোধহয় মনে করেছিল যে কলেজের এই মেয়েদের কয়েক ঘণ্টার জন্যে বাইরে পিকনিকে যাবার ন্যায্য অধিকার আছে। পুরুষদের মত তাদেরও বাইরের আলো বাতাস ভোগ করবার সম্পূর্ণ অধিকার রয়েছে। সব সময়েই যে তাদের পর্দার আড়ালে

Mamun Academy

থাকতে হবে বা গার্জিয়ান সঙ্গে নিয়ে চলতে হবে তার কোন যৌক্তিকতা নেই-বিশেষ করে তারা যখন দলবদ্ধভাবে বাইরে যাচ্ছিল। আর সেই সুযোগ নিয়ে কতগুলো কাণ্ডজ্ঞানহীন, উচ্ছৃঙ্খল যুবক তাদের অপমান ও উত্যক্ত করবে এটা কোন সভ্য সমাজ বরদাস্ত করতে পারে না। একটি উদাহরণ দিয়ে তিনি বোঝান যে, 'মা' তার ছোট একটি মেয়েকে মূল্যবান গহনা পরিয়ে পড়শীর বাড়িতে যেতে দিলেন, সেই কারণেই যে বদ লোকেরা তার সব গহনা কেড়ে নেবে, এ কথার কোন যৌক্তিকতা নেই।

এই যুবকের দল বিশেষ করে মোঃ রফিক কলেজের মেয়েদের পিছু নেয়, অশোভন কথা বলে ও খারাপ অঙ্গ ভংগি করে। এমনকি এই সব অপরিচিত পিকনিকের মেয়েদের একজনকে প্রেমের গান গাইতে বলে, একজনকে 'প্রিয়া' বলে সম্ভাষণ করে নিশ্চয়ই তারা গুরুতর বেআইনি ও অসামাজিক কাজ করেছে। দেশের আইনে এরা যদি দোষী না হয় তবে আর কাকে দোষী বলা যায়? দেশের রাস্তা ঘাট, পার্ক, মাঠ মেয়ে-পুরুষ সবার জন্যে নিরাপদ করার উদ্দেশ্যে এইসব সমাজ বিরোধী লোকদের উপযুক্ত শাস্তি দেয়া একান্ত প্রয়োজন। হাইকোর্ট এদের সাজা দিয়ে আইনসংগত কাজই করেছে।

তাই দেশের সর্বোচ্চ আদালতও আসামীদের দোষী সাব্যস্ত করেন। সেই সংগে আসামীরা তাদের চাকরিও হারায়।

অতঃপর আমাদের দেশের রোমিওদের এই রায় থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত।

Manik Academy

সেবা প্রকাশনী

কিছুদিনের মধ্যেই বের হবে

কাঠগড়ার মানুষ-২

এতে পাবেন চাঞ্চল্যকর পনেরটি মামলার চমকপ্রদ বিবরণ

Mamun Academy

- ❋ হতভাগিনী নাসিমা
- ❋ স্বৈরিণী আয়েশা
- ❋ ট্রাঙ্ক রোডে খুন
- ❋ রেল লাইনের হত্যাকাণ্ড
- ❋ নাচোলের নৃশংস পুলিশ হত্যা
- ❋ লীনা
- ❋ মরণ ফাঁদ
- ❋ রক্ষকই ভক্ষক
- ❋ কুসুমে কীট
- ❋ নাবালিকা স্ত্রীর হেফাজত
- ❋ হিন্দু বিবাহ বিচ্ছেদ
- ❋ খ্রীস্টান ডাইভোর্স
- ❋ রক্তাক্ত জলপ্রপাত
- ❋ আইনের শাসন
- ❋ ডাকাত

বিশ্বের বিস্ময়-১

বিশ্বের যত আজব সত্য

রকিব হাসান

এগার টাকা

সাধারণ জ্ঞান বৃদ্ধির জন্যেই হোক
নিছক মজা পাওয়ার জন্যেই হোক
অবাক কিছু বলে আসর জমাবার জন্যেই হোক
কিংবা বন্ধু-বান্ধবদের চমকে দেয়ার জন্যেই হোক
—আপনি যে-জন্যে বইটি কিনবেন
সে চাহিদা মিটবে, তাতে কোন সন্দেহ নেই!
ট্রেনে-বাসে-লঞ্চে
পথের ক্লান্তি ভুলিয়ে দেবে এই বই।
অবসর মুহূর্ত ভরিয়ে দেবে
বিস্ময় আর আনন্দে।
কাউকে দিতে হলে এর বাড়া উপহার নেই।
নিকটস্থ বুকস্টলে আজই খোঁজ করুন।

সেবা প্রকাশনী

Mamun Academy

সেবা
প্রকাশনী

কাজী আনোয়ার হোসেনের
এক খণ্ডে সমাপ্ত রোমাঞ্চোপন্যাস

বিষ

ষোল টাকা

তিনজন জেল খাটা দাগী আসামীকে
একটা বিশেষ কাজের জন্যে নিয়োগ করল
লণ্ডনের ইসাক নিউবেল।
টাকা দেবে মেলা, কিন্তু যেতে হবে
আফ্রিকার এক গহীন দুর্গম অঞ্চলে।
পাইলট নিয়াজ ইকবাল,
তালার এক্সপার্ট জেফ প্যাটারসন
আর অভিজ্ঞ শিকারী হ্যারি হফম্যানের
সাথে যাবে ইসাকের বিশেষ প্রতিনিধি—
অপরূপ সুন্দরী এক যুবতী, শ্যারন গেট।
কিন্তু কাজটা কি? কিসের জন্যে যাচ্ছে ওরা
দক্ষিণ আফ্রিকার ওই জঙ্গলে?
কি আছে সেখানে?
সেখানে রয়েছে এক বিষাক্ত বজিস্রা আংটি।
নিকটস্থ বুকস্টলে আজই খোঁজ করুন।

Mamun Academy